অচিন পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

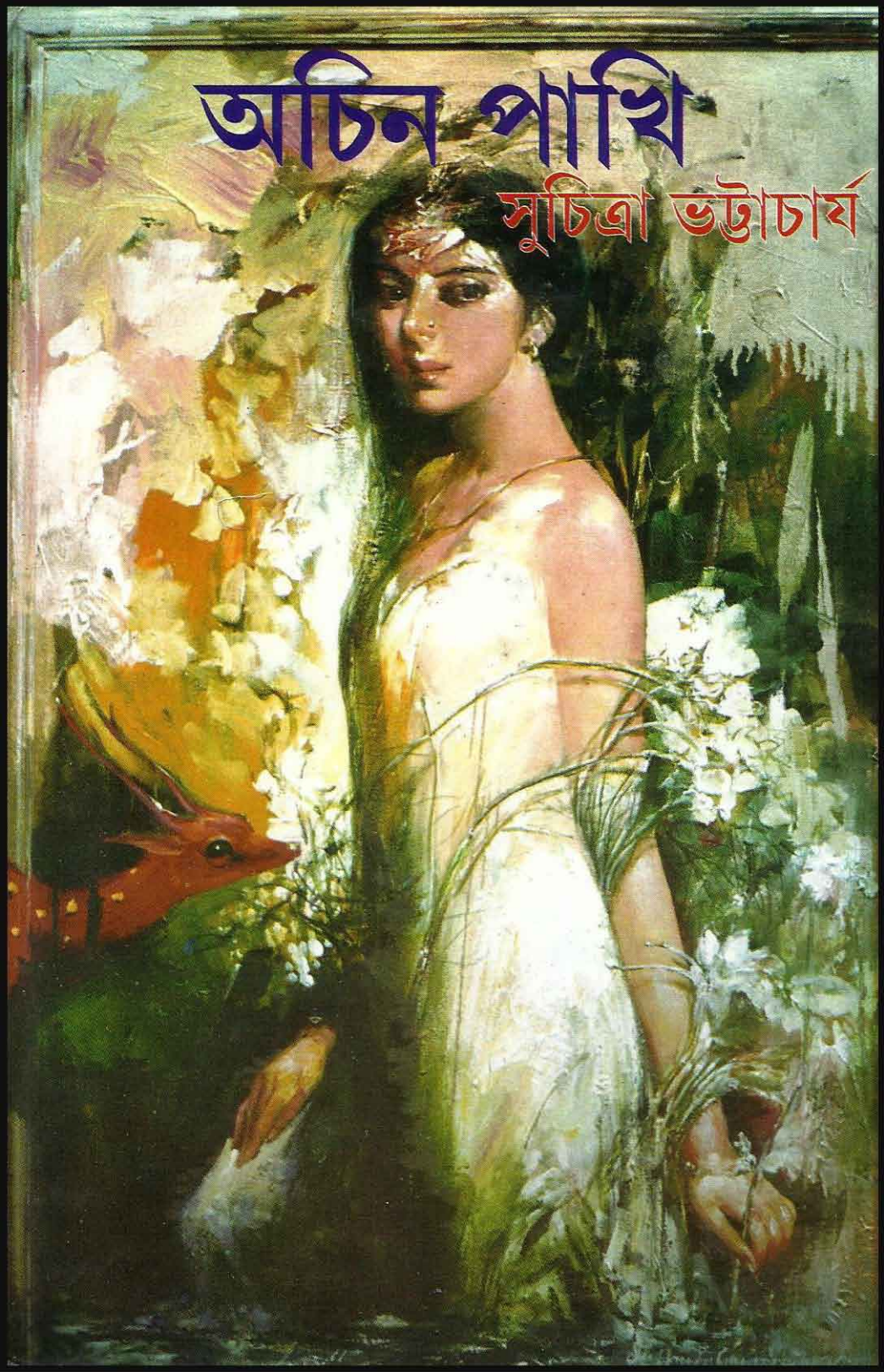

অচিন পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্যে একালের স্মরণীয় কথাকার হিসেবে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বরণীয় এক লেখিকা। বিষয়-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি, আধুনিক ঋজু গদ্যভাষাতেও তিনি এক আশ্চর্য কথাশিল্পী। এই সময়ের সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধহীন প্রতিদিনের যে জীবন, তার মধ্যে যে যন্ত্রণা এবং হতাশা—পাশাপাশি জীবনযুদ্ধে জিতে যাওয়ার যে চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা, সবকিছুরই প্রতিচ্ছবি ঝলসে ওঠে তাঁর রচনায়। বাঙালি পাঠকের প্রিয় লেখিকা তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির যেমন কোনো জুড়ি নেই, তেমনি তাঁর ছোটো গল্প। সেখানেও তিনি একাই একটি কাল। একটি সময়। অন্যতম প্রধান।

এই গল্পগ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে তাঁর আশ্চর্য স্বাদের নির্বাচিত কুড়িটি গল্প। 'অচিন পাখি'র গল্পগুলি আসলে অন্য ধারার অনন্য রচনা। ছোটো গল্পের ইতিহাসেও ঐতিহাসিক সংযোজন। রুচিশীল পাঠকের হাতে এই বই আমাদের বিনম্র উপহার।

প্রকাশক

সূচিপত্র

মনোভূমি	৯
লালুবাবু	২৬
প্রতিমাদর্শন	৪৪
অব্যক্ত	৫৭
বাড়ি	৫৯
নকল রাজা	৬৮
অতি তুচ্ছ	৭৬
বড়িওয়ালা	৮৫
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স	৮৮
সাদা গুঁড়ো লাল রং	১০২
চেনা অচেনা	১২০
টীকা নিষ্প্রয়োজন	১২৯
রোদচশমা	১৩১
আজ সুবর্ণজয়ন্তী	১৩৮
কে ঠকে! কে ঠকায়!	১৫৪
দোলাচল	১৫৬
আমি মাধবী	১৬৫
গোপন মায়া	১৭৭
সমালোচক	১৮৯
অচিন পাখি	১৯৮

মনোভূমি

যশোর রোড ধরে ছুটছিল গাড়ি। তেমন একটা জোরেও না, আবার টিকটিক করেও নয়, মাঝারি গতিতে। রবিনের মধ্যবয়সী অবাঙালি ড্রাইভারটি রবিনেরই ছাঁচে গড়া, কখনই ও স্পিড তোলে না বড় একটা। এই মধ্যনিশীথে রাস্তায় যান চলাচল অনেক কম, তবু সে রীতিমাফিক সাবধানী।

আমরাও অবশ্য চাইছিলাম না গাড়ি জোরে চলুক। রবিনের কথা বাদ, সে তো এমনিতেই ধীরে চলো, সামলে সুমলে চলো পন্থী। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই। আমি আর সৌরভ তাও ক্বচিৎ কখনও গতির প্রলোভনে পড়ি। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অন্যরকম। আজই সন্ধেবেলা এক মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে গেছে। সম্ভবত ওই গতির কারণেই। হাইওয়ের ওপর একটি ট্রাকের সঙ্গে নাকি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তথাগতর মারুতির। কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি। গাড়িতে ভাস্বতীও ছিল, দুজনেই স্পট ডেড। এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে যারা কলকাতা থেকে দৌড়ে যাচ্ছে, তারা গাড়ি জোরে ছোটাবেই বা কোন সাহসে।

নভেম্বরের রাত। বাতাসের চোরা সিরসিরে ভাব ঝাপটা মারছে চোখেমুখে, তবু কাচ তুলতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল ওই হাওয়াটুকু না পেলে বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ আলগা মেলা আছে বাইরে, অথচ কিছুই প্রায় দেখছি না। ডান দিকে বিমানবন্দরের রানওয়ে, এত রাতেও বিকট শব্দ করে একটা প্লেন উড়ল, কেউ যেন লক্ষ করলাম না সেভাবে। যেন উড়োজাহাজের ওরকম ওঠানামা আমাদের চোখসওয়া। একখানা ফাঁকা লরি ভীমবেগে আমাদের অতিক্রম করে গেল, আমাদের ঘাড় একটুও ঘুরল না। দু দুটো টাটকা প্রাণের চকিত মৃত্যু আমাদের স্নায়ুকে যেন অবশ করে রেখেছে। অন্তত আমাকে তো বটেই। ভাবতেই পারছি না, যে তথাগতর সঙ্গে পরশুও অত আড্ডা হল, সে আর বেঁচে নেই! ভাস্বতীর সঙ্গে ইদানীং কমই দেখা হত, তবু সেও তো না হোক আমাদের বিশ বছরের বন্ধু! একটা মাত্র মুহূর্তের টোকায় দুজনেরই চিরবিদায়, জীবন কি এতই অনিত্য? মৃত্যু কি এমনই নিষ্ঠুর?

সৌরভ বসেছে ড্রাইভারের পাশে। পিছনে আমি আর রবিন। টের পাচ্ছি আমরা তিনজনই কথা বলতে চাইছি কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছি না। নীরবতা একটা চাপা গুমোট তৈরি করছে গাড়ির ভেতর। আমাদের ভেতরেও। অস্বস্তি কাটাতেই মোবাইল বার করলাম পকেট থেকে, নাড়াচড়া করছি অকারণে।

আচমকা রবিন বিড়বিড় করে উঠল, কোনও মানে হয় না।

এই সূচনাটুকুরই বুঝি প্রয়োজন ছিল। সৌরভ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসেছে,—কীসের রে?

—কোনও কিছুরই কিছু মানে হয় না। হঠাৎই উইকের মধ্যিখানে উদ্ভট শখ...প্রমোদভ্রমণে চলল দুজনে...দুম করে জোড়া মৃত্যু...

—কোথায় যাচ্ছিল বল্ তো?

—হবে বেথুয়াডহরি ফহরি। মাঝেমাঝেই তো ভাস্বতীকে নিয়ে দুমদাম এদিক ওদিক চলে যেত। থোড়াই জানিয়ে যেত কোথায় যাচ্ছে!

—কিন্তু পুলিশ তোর নম্বরটা পেল কোথ্থেকে?

—তথাগতর ডায়েরি। প্রথমে নাকি তথাগতর ফ্ল্যাটেই ফোন

লাগিয়েছিল। সেখানে রিসিভার ওঠাবে কে, ফ্ল্যাট তো ফাঁকা, অবিরাম রিং হয়ে গেছে। তারপর পাতা উল্টোতেই নাকি প্রথমে আমার নাম্বারটাই....। রবিন সিটে হেলান দিল—কপাল দ্যাখ্, সবে তখন বুল্টুকে হোমটাস্ক করিয়ে খেতে বসার জন্য উঠছি, তখনই....। তোদেরও তো খাওয়া আজ চৌপাট?

—হুম্। আমি তখন জাস্ট সেকেন্ড গরাসটা মুখে তুলেছি।

—কোনও মানে হয়? কোনও মানে হয়? এই যে আমরা খবরটা পেয়েই হাঁইহাঁই করে ছুটছি, এরও তো কোনও মানে হয় না। গিয়ে কখন বডি পাব তার ঠিক আছে? স্রেফ তীর্থের কাকের মতো বসে থাকা....

—তা তো বটেই। সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা বাড়িয়ে দিলাম সৌরভকে। অনেকক্ষণ পর কথায় ফিরতে পেরে যেন নিজেকে হাল্কা লাগল একটু। ঠোঁটে সিগারেট চেপে বললাম, পোস্টমর্টেম হতে হতে অন্তত কাল দুপুর। তারপর তো বডি হ্যান্ডওভার করার প্রশ্ন। অবশ্য আদৌ যদি বন্ধুদের হাতে বডি ছাড়ে!

সৌরভ হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়া ছেড়ে বলল—সে পটিয়ে-পাটিয়ে ম্যানেজ করা যাবে। বলব, তথাগতর তিন কুলে কেউ নেই। ....ইনফ্যাক্ট, নেইও তো। ডিভোর্সি মানুষ, বাচ্চার দায়িত্বও নিতে হয়নি, বাপ-মা দুজনেই পরপারে, দিদি আমেরিকায়, কস্মিনকালে কোনও আত্মীয়স্বজন ওর খোঁজ নেয় বলে শুনিনি....তাহলে আমরা ছাড়া ওর আছেটা কে!

—দ্যাখ, পুলিশ যদি তোর যুক্তি মানে।

—মানবে, মানবে। লাশ আটকে রাখা মানে তো পুলিশেরই হ্যাপা। আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে আছে, চাইলে দু-চার লাইন লিখেও দেব....

—অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ভাস্বতী?

—সে তো আমাদের ভাবার কথা নয়। শি ইজ আ ম্যারেড উওম্যান, তার বর ভাববে। সৌরভ আর একটু ঘুরে রবিনকে জিজ্ঞেস করল,—আশিসবাবুকেও তো তুই জানিয়ে দিয়েছিস, তাই না?

—অবশ্যই। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম।

—শুনে কী রিঅ্যাকশন?

—প্রথমে তো বিশ্বাসই করে না। বলে ভাস্বতী তো বোনের বাড়ি

গেছে! বজবজ! কী করে কৃষ্ণনগরে....! তথাগতর নামটা শোনার পর কানে জল ঢুকল। দু-চার সেকেন্ড চুপ। অ্যান্ড দেন হাঁউমাউ কান্না।

—এহে, ব্যাপারটা খারাপ্ হল। আমি মাথা নাড়ালাম—তথাগতর কথাটা কেন বলতে গেলি?

—স্ট্রেঞ্জ। এ ছাড়া আর কী বলতে পারতাম? আপনার বউ একা একা গাড়ি চড়ে কৃষ্ণনগরে হাওয়া খেতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মরেছে? সেটা কি খুব বিশ্বাস্য হত?

—তা হয়তো নয়। তবু....

—হয়তো তবুর এখানে কোনও জায়গা নেই জয়। ভাস্বতী যখন তথাগতর সঙ্গে ছিল, তখন নিউজটাকে কোনও ভাবেই সাপ্রেস করা যাবে না। শুধু তাই নয়, জানার পরে আশিসবাবু কী ভাবলেন, না ভাবলেন, কতটা শকড্ হলেন, এইসব প্রসঙ্গও এখন অবান্তর।

সৌরভও একমত। নীরস গলায় বলল—সত্যিটা তো ভদ্রলোককে বলতেই হবে। এবং ভদ্রলোককেও সত্যিটা শুনতেই হবে। এর কোনও মাঝামাঝি নেই। মৃত্যুর পরে ঢাকঢাক গুড়গুড়ের মিডলক্লাস হিপোক্রেসি আর চলে না।

যুক্তির দিক দিয়ে ভাবলে সৌরভ ভুল বলছে না। কিন্তু আমার কেন যেন ভালো লাগছিল না। ভাস্বতীর অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারটা আশিসবাবু জানতেন কি? আঁচ নিশ্চয়ই করতেন। একই ছাদের নীচে যখন বসবাস, বউয়ের চালচলন হাবভাব দেখে কিছুই কি আন্দাজ করা যায় না? তাছাড়া ঘটনা তো এক দিনেরও নয়, আকস্মিকও নয়, বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে। নেহাত নিরেট কিংবা অন্ধ না হলে খানিকটা তো বুঝতেই হয়। হয়তো পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না, অন্তত তথাগতর কথা শুনে তো তাই মনে হল। সংসারে অনেক অপ্রিয় সত্যকেই তো আমরা টের পাই, তবে যতক্ষণ তা আড়ালে আবডালে থাকে আমরা হজমও করে নিই। পরদা হঠাৎ সরে গেলে সত্যের অনাবৃত চেহারাটা কি অসহনীয় ঠেকে না? এই যে আমার আর শর্মিষ্ঠার এগারো বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও বাচ্চাকাচ্চা হল না, অক্ষমতাটা কার তা জানার জন্য ডাক্তারের কাছে আমরা গেছি কোনওদিন?

কেন যাচ্ছি না? সত্যিটা ধরা পড়ার ভয়েই তো। বরং সংশয়টা থাকুক, সংশয়েই স্বস্তি, সংশয় নিয়েই বাঁচি। হয়তো এটা উটপাখির স্বভাব, কিন্তু আমরা কেউই তো এর ব্যতিক্রম নই! আশিসবাবুও নয়। কাল কাগজে নাম টাম বেরিয়ে গেলে কী করে পরিচিত মহলে মুখ দেখাবেন ভদ্রলোক? মধ্যবয়সে পৌঁছে এই অসম্মানটা কি আশিসবাবুর প্রাপ্য ছিল? একটাই বাঁচোয়া, ভাস্বতীরাও নিঃসন্তান। পেটেই তিন-তিনবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে ভাস্বতীর। ছেলেমেয়ে থাকলে তারাও তো আজ চরম লজ্জায় পড়ত।

গাড়ি মধ্যমগ্রাম পেরোল। যশোর রোড ছেড়ে ঘুরেছে বাঁয়ে। দু-ধারের জমজমাট জনপদ আশ্চর্য রকমের নিঝুম এখন। শুনশান রাস্তায় পথবাতিরা দুর্বল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। খানিক এগোতেই লেবেল ক্রসিং। গেট খোলা। দুলে দুলে রেললাইন টপকাল অ্যাম্বাসাডার, হোঁচট খেতে খেতে। আচমকা একপাল নেড়ি কুকুর সমস্বরে ডেকে উঠেছে। রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান।

রবিন বিরক্ত চোখে ঝলক দেখল কুকুরগুলোকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে গোমড়া গলায় বলল,—আমার তো মনে হয় এখন আমাদের অন্য সমস্যাটার কথা ভাবা উচিত।

—কী?

—আশিসবাবু যদি আদৌ বডি নিতে না আসেন?

—যাহ্, তা কেন হবে? তুইই তো বললি ভদ্রলোক খুব কাঁদছিলেন?

—সে তো ছিল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। একটু থিতু হওয়ার পর নিশ্চয়ই অতটা শোক আর থাকবে না। তখন যদি অন্যভাবে রিঅ্যাক্ট করেন? আফটার অল স্ক্যান্ডালটা নিশ্চয়ই ওঁর মর্যাদা বাড়াবে না? তাছাড়া রাগ অভিমান বলেও তো ডিক্সনারিতে দুটো শব্দ আছে, না কী?

—তাহলে তো সাড়ে সর্বনাশ রে। ভাস্বতীর বডির কী গতি হবে?

—আহা, আগেই নেগেটিভটা ধরে নিচ্ছিস কেন? চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলাম—আশিসবাবু জেনুইন জেন্টলম্যান। মনে যে বিক্রিয়াই হোক, স্ত্রীর দেহ সৎকার করতে উনি আসবেনই।

—ধর এলেন না....তখন?

—তাহলে ভাস্বতীর বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসবে। দাদা বা

ভাই....। আর না এলেই বা কী, আমরা তো আছি। একটু দম নিয়ে বললাম, ভাস্বতী তো আমাদেরও বন্ধু। হয়তো তথাগতর মতো অত ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু কলেজ লাইফ থেকে ওকে আমরা চিনি....ভাস্বতীর বিয়েতে সকলে গেছি, অবরে সবরে এখনও আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়....ভাস্বতীর সৎকারের দায়িত্বটুকু আমরা নিতে পারব না?

—জ্ঞান মারিস না। তেমন অড সিচুয়েশান হলে আমাদেরই সে সব করতে হবে, এ বোধ আমারও আছে। কিন্তু....

—কী কিন্তু? কীসের কিন্তু?

—আমি শুধু তথাগতর আক্কেলটার কথা ভাবছি। রবিনের স্বর সহসা চড়ে গেল, হি ওয়াজ সো ইরেসপন্সিবল, সো ইরেসপন্সিবল...!

রবিনের হাতে মৃদু চাপ দিলাম, থাক না রবিন। এখন আর ওসব কথা তুলে কোনও লাভ আছে!

লাভ-লোকসান বুঝি না। চিরটাকাল ও শালা নিজের ইচ্ছেমতো লাইফ লিড করে গেল....মরল যে, তারও কোনও ছিরিছাঁদ নেই....আজও চুপ করে থাকব?

—আমরা কি সর্বদাই চুপ থেকেছি রবিন? ওকে বোঝাইনি? বারবার বলিনি, এবার লাইফ প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ কর?

—সেই জন্যই তো আরও বেশি করে লাগছে। তথাগতর সামান্যতম বদল আমরা ঘটাতে পারিনি। হারামজাদাটা কোনও নিয়মের মধ্যে এলই না। রবিন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল—সেই কলেজ লাইফ থেকেই তো দেখছি। তখনও যা, এখনও তাই। রিপুর দাস। রিপুর ওপর এতটুকু কনট্রোল নেই। তোদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ভাস্বতীর সঙ্গে কী প্রমত্ত লটঘটটাই না চালিয়েছিল কলেজে? সারাক্ষণ ভাস্বতীর গায়ে সেঁটে আছে, যেন স্টিকিং প্লাস্টার। করিডোর, লাইব্রেরী, সিনেমা হল, কফি হাউস, গঙ্গার পাড়, ভিক্টোরিয়া....। তোদের চেয়েও তথাগতর সঙ্গে তখন আমার ইন্টিমেসি বেশি। আমাকে তো ডেলি ডিটেল শোনাত। কবে চুমু খেল, কিংবা আর কী কী করল....। সেই মক্কেল গ্র্যাজুয়েশানের পর ভাস্বতীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল্লি হাওয়া। এম-এ করে ফিরল বটে কলকাতায়, কিন্তু তখন আর

ভাস্বতীকে যেন চিনতেই পারে না। পরে শুনলাম জে-এন-ইউতে কোন পুনমের সঙ্গে এমন আশনাই চালিয়ে এসেছে, তার তুলনায় ভাস্বতীকে এখন পানসে লাগে! তারপর তো চাকরি পেয়ে জয়িতার সঙ্গে ভাব হতেই পুনমও মন থেকে ভ্যানিস। তা জয়িতার সঙ্গেও কি টিঁকতে পারল? বিয়ে করল, এক বছরের মাথায় তোতোন, ব্যস প্রেম ফুড়ুত। আমরা প্রত্যেকেই জানি জয়িতা মোটেই খারাপ গৃহিণী ছিল না। গোছানো, সংসারী, রুচিবোধ আছে। অ্যাজ বউ, যথেষ্ট ভাল। শুধু বাপের বাড়ির দিকে একটু টান বেশি ছিল, এই যা। তো সেটা কি খুব দোষের? বাপ-মা-র একমাত্র সন্তানকে তো অনেক সময়ে মেয়ে হয়েও ছেলের কর্তব্য পালন করতে হয়। ঠিক কি না তোরাই বল? তা সেই জয়িতার ওপর কী অত্যাচার না চালিয়েছিল তথাগত। অ্যাবসোলিউটলি রেকলেস লাইফ লিড করছে, রোজ রাতে মদে চুর হয়ে ফেরে, বাড়ি ঢুকে হল্লাগুল্লা....। তোরা হয়তো জানিস না, রেগুলার একটা জুয়ার ঠেকেও যেত সেই সময়ে। নিজের পকেট দশ দিনেই ফক্কা, জয়িতার মাইনে নিয়ে টানাটানি করছে! জয়িতার মতো মেয়ে কদ্দিন এরকম হাজব্যান্ডকে বরদাস্ত করবে! তিনটে বছর যেতে না যেতেই সম্পর্ক ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, ছেলে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল জয়িতা। তাতেও কি শালার চৈতন্য হল? জয়িতার সম্পর্কে তোর যদি কোনও অভিযোগ থাকেও, তা নিয়ে আর গাওনা গেয়ে তো লাভ নেই! রিলেশান ভেঙে গেছে, দেখেশুনে আবার একটা বিয়ে কর। নিজেকে শুধরে নিয়ে এবার অন্তত থিতু হ। কোথায় কী! আবার পুরনো পিরিত চাগিয়ে উঠল, ব্যাটা গিয়ে হানা দিল ভাস্বতীর সংসারে। বর নিয়ে ভাস্বতী দিব্যি সুখে ঘরকন্না করছিল, সেন্টু মেরে পুরো ঘেঁটে দিল মেয়েটাকে! লাইফের ব্যালান্সটাই নষ্ট হয়ে গেল ভাস্বতীর। এতই যদি তোদের ভালবাসা, ভাস্বতীকে ডিভোর্স করিয়ে ইউ ম্যারি হার। এককালে মেয়েটা তোকে ভালবাসত বলে তুই খালি অফচান্স নিয়ে যাবি? রবিন থেমেছে ক্ষণকাল। আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—আলটিমেটলি ভাস্বতীকে মেরে ফেলে তথাগতর হাড় জুড়োল।

বিনা প্রতিবাদেই শুনছিলাম কথাগুলো। সবটাই যে মানতে পারছিলাম, তা নয়। মনে হচ্ছিল রবিনের দৃষ্টিটা যেন একটু একপেশে। তথাগতকে প্রায়

খলনায়ক বানিয়ে ফেলেছে রবিন। মেপেজুপে হয়তো চলত না তথাগত, তবে অতটা কি বাজে ছিল? জয়িতার সঙ্গে কেন তথাগতর মিলমিশ হয়নি, তা কি অত সহজে দুয়ে দুয়ে চার করে বলে দেওয়া যায়? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে কেন ভাঙে, তৃতীয় ব্যক্তি কখনও কি তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে? ইয়ারদোস্তদের কাছে এসে যে যতই প্রাণের কথা বলুক, কোথাও একটা কিছু কি গোপন থেকে যায় না? যা শুধু চারটে দেওয়ালই জানতে পারে, আর কেউ না। কিংবা দেওয়ালেরও অজ্ঞাত থাকে। হৃদয়ের তলদেশের ছবি দেওয়ালও কি দেখতে পায়? ভাস্বতীর কাছে কেন ফের গেল তথাগত, কীভাবেই বা তাদের টালমাটাল সম্পর্ক গত পাঁচ-ছ বছর ধরে গড়াল, তাও কি রবিনের পক্ষে নিখুঁতভাবে বোঝা সম্ভব? বর থাকা সত্ত্বেও ভাস্বতীই বা কেন প্রশ্রয় দিত তথাগতকে?

সৌরভ সিধে হয়ে বসেছে। উইন্ডস্ক্রিনে চোখ রেখে হঠাৎই বলে উঠল,—একা তথাগতকেই তুই দোষী ঠাউরে ফেললি রবিন?

—বিচার করার আমি কে! যা ফ্যাক্ট, তাই বললাম।

—আমার তো মনে হচ্ছে তুই ঝাল মেটাচ্ছিস।

—কিসের ঝাল?

—তোদের মতে মিলত না বলে। তুই ওকে লক্কা পায়রা বললেও, ও তোকে গৃহপালিত জন্তু বলত, তাই।

—যাহ্ বাবা, শেষে এই মানে করলি! তথাগতর ওপর কি আমি এখনও রেগে থাকতে পারি? তথাগত কি আমার বন্ধু নয়? রাতদুপুরে ছুটছি তবে কীসের টানে? গাড়ি সামান্য গতি বাড়িয়েছে। হেডলাইটের দ্যুতির ওপারে পথের কিছুই দৃশ্যমান নয়। দু পাশে ছমছম করছে অন্ধকার। মাঠেঘাটে। গাছগাছালিতে। হঠাৎ হঠাৎ ধেয়ে আসা ছোট-বড় লোকালয়েও। আকাশে চাঁদ উঠেছে এক ফালি। তবে হেমন্তের কুয়াশা পেরিয়ে তার কিরণ ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে না ধরণীতে। আধো আলো আধো আঁধার জড়ানো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রবিন আপনমনে বলল—তথাগত তথাগতর মতো। আমি আমার মতো। আমি মন দিয়ে ঘরসংসার করি, বউছেলেকে ভালবাসি, উল্টোপাল্টা পয়সা ওড়াই না, কোনও রকম নেশায় আসক্ত নই....আমার

একটা ডিসিপ্লিন আছে। এবং আমি এই লাইফটাই পছন্দ করি। তথাগত ঠাট্টা করে কী বলল, তা আমি গায়ে মাখব কেন! তা বলে তথাগতর জীবনযাপনের ধারাটা যে আমার না-পসন্দ, এ আমি উচ্চারণ করতে পারব না? এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই, তথাগতর পাল্লায় পড়েই ভাস্বতীকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হল!

—আই ডিফার। সৌরভ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, আই স্ট্রংলি ডিফার।

—ভাস্বতীর প্রাণ বেঘোরে গেল না? এতে তথাগতর কোনও দায় নেই?

—উঁহু। উল্টোটাই সত্যি। ভাস্বতীর পাল্লায় পড়েই বেচারা তথাগত....। সৌরভ ফের ঘুরে বসেছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল আমার কাছ থেকে। ধরিয়ে বলল, তথাগতর জীবনকাহিনি তুই বলে গেলি বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতন করে সাজিয়ে। আমার ধারণা, ভাস্বতী চিরকালই তথাগতকে ইউটিলাইজ করেছে। স্টুডেন্ট হিসেবে তথাগত দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছিল, দেখতেও হ্যান্ডসাম, তাই ভাস্বতীই গায়ে পড়ে এসে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। এবং কলেজ লাইফের প্রেমটা ছিল ভাস্বতীর নাথিং বাট অভিনয়। ভাস্বতী ডিচ করেছিল বলেই হাফসোল খেয়ে তথাগতর দিল্লি প্রস্থান। সেখানে পুনমের সঙ্গে মিশে ভাস্বতীকে ভুলতে চাইল। পারল না। ভাস্বতীর ম্যাগনেটিক চার্মে আবার ফিরল কলকাতায় কিন্তু ভাস্বতী ওকে আর ধারেকাছে ঘেঁষতেই দিল না। সে তখন আশিস সিনহার প্রেমে মাতোয়ারা। নামি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, সেটলড ফিউচার, তথাগতকে আবার আমল দিতে তার বয়েই গেছে। বেচারা তথাগত জয়িতাকে আঁকড়ে ধরে লাইফটাকে স্টেডি করার চেষ্টা করল। এদিকে হৃদয়ে তার রয়ে গেল ভাস্বতী। পরিণাম যা হয়! জয়িতাকে অসহ্য লাগতে শুরু করল, উদভ্রান্তের মতো মদ ধরল, জড়িয়ে গেল আরও নানান নেশায়। জয়িতা কখনওই তথাগতকে ফিল করার চেষ্টা করেনি। তথাগত কেন যে অমন আচরণ করছে, সেটা তলিয়ে ভাবারও প্রয়োজন মনে করেনি কোনও দিন। বরং আরও বেশি আঘাত দিয়ে, তথাগতর পায়ে ডান্ডা মেরে, ড্যাং ড্যাং করে বাচ্চা নিয়ে কেটে পড়ল। অ্যাট দ্যাট হাফ-দিওয়ানা স্টেট অফ তথাগত,

ভাস্বতীর সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ। ভাস্বতীর তদ্দিনে আশিসবাবুর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ঘর করা হয়ে গেছে, আশিস তখন তার কাছে ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর। আশিসবাবুকে তোরা দেখেছিস, নিপাট ভালোমানুষ। ওই ধরনের পুরুষে মহারানির আর মন ভরছে না। সম্ভবত যৌনক্ষুধার অতৃপ্তি থেকেই....। সৌরভ গলা নামিয়ে ড্রাইভারকে একবার দেখে নিল, হ্যাঁ, আউট অফ শিয়ার সেক্সুয়াল আর্জ ফের পাকড়াও করল তথাগতকে। দায়হীন সম্পর্ক। শুধুই মৌজমস্তি। প্লাস লুকিয়ে চুরিয়ে আশনাই চালানোর এক নিষিদ্ধ পুলক....আজ দিঘা যাচ্ছে, কাল ডায়মন্ডহারবার তো পরশু কাঁকড়াঝোড়। দু হাতে দুইয়েও নিচ্ছে তথাগতকে। পুরো ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল বেচারা। নেশাগ্রস্তের মতো আটকে পড়েছিল ভাস্বতীর জালে। সত্যি সত্যি যদি তথাগতর ওপর কণামাত্র টান থাকত, তবে কবেই তো সে আশিসবাবুকে লাথি মেরে তথাগতর কাছেই চলে আসত। আমার ধারণা, তথাগত ইদানীং ভাস্বতীর খেলাটা বুঝতে পারছিল। এমনও তো হতে পারে, এসব নিয়েই আজ তথাগতর সঙ্গে গাড়িতে বচসা চলছিল। হয়তো মেন্টালি খুব ডিসটার্বড হয়ে পড়েছিল তথাগত। এবং মনঃসংযোগের অভাব থেকেই দুর্ঘটনা। ভাস্বতী যে শুধু নিজের সুখের জন্য তাকে ব্যবহার করছে, এই বোধটুকু আগে এলে তথাগতকে হয়তো মরতে হত না।

রবিন অস্ফুটে বলল—কী কাণ্ড, তুই ভাস্বতীকে একেবারে ডাইনি বানিয়ে দিলি?

—আমি কিছুই বানাইনি। আমি মেয়েদের ভালভাবেই চিনি। মেয়েরা বেসিক্যালি শুধু নিজেরটুকুই বোঝে।

—তোর দেখছি মেয়েদের ব্যাপারে হেভি ফান্ডা? কটা মেয়ে দেখেছিস জীবনে?

—বেশি দেখার দরকার হয় না। যার চোখ আছে, তার বিন্দুতেই সিন্ধুদর্শন হয়। সৌরভ ক্রমশ উত্তেজিত। জ্বলন্ত সিগারেটখানা ছুঁড়ে মারল বাইরের অন্ধকারে। সোজা হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলল, মেয়ে জাতটাই অসম্ভব ডিমান্ডিং। কোনোভাবে কোনও দিক দিয়েই তাদের খুশি করা যায় না।

রবিন আড়চোখে আমায় দেখল। আমি রবিনকে। কোন ক্ষোভে সৌরভ পুড়ছে, তার কিছুটা জানি বইকি। আমাদের মধ্যে সৌরভই খুব একটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অবশ্য আমরাও যে খুব রাজাউজির বনেছি তা নয়। তবু মোটের ওপর চাকরিটা ভালোই করি, সচ্ছলতার একটু ওপরের ধাপেই আছি আমি আর রবিন। সৌরভ সরকারি অফিসের কেরানি। কিন্তু তার গিন্নিটি মেজাজে মহারানি। অনিতার এই চাই, ওই চাই-এর ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল দেখে সৌরভ। উপরি রোজগারের নানান ফন্দিফিকির খুঁজতে হয়ে বেচারাকে। বাঁ হাতে উপার্জনের জন্য সৌরভ খানিকটা মরমে মরে থাকে, আমি জানি। কিন্তু অনিতার ওপর রাগটা ভাস্বতীর ওপর আছড়ে পড়বে কেন? ভাস্বতীকেই বা এক লোভী, আত্মসুখপরায়ণ বলে চিহ্নিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

গাড়ি একটা শহর অতিক্রম করছে। সম্ভবত রানাঘাট। কেমন যেন ঘুমন্ত পুরী, ঘুমন্ত পুরী লাগছে জায়গাটাকে। এত রাতে মানুষও দেখা যায় এক-আধটা। লরিটরির খালাসি ড্রাইভার গোছের লোকজন। একটা ছোট্ট হোটেলও খোলা আছে। হোটেল নয়, দোকান। ধাবা গোছের।

রবিন জিজ্ঞেস করল, দাঁড় করাব গাড়ি? চা খাবি?

—পেলে মন্দ হয় না।

ভাবামাত্র কাজ। তুরন্ত গাড়ি সাইড করে নামল রবিন। আমিও। সিগারেট ধরাচ্ছি, রবিন ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে এল। বলল, তড়কা রুটিও হবে। খাবি নাকি?

সৌরভও নেমেছে। ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, একটা চল্লিশ। পৌঁছতে পৌঁছতে ডেফিনিটলি আরও ঘণ্টাখানেক।

—তা তো লাগবেই। কৃষ্ণনগরে ঢুকে হাসপাতাল খুঁজে বার করা.... ওসব জায়গার কিছুই চিনি না। কতক্ষণ লাগে, না লাগে....পেটটা একটু লোড করে রাখি চল্।

—হুম। অত রাতে পৌঁছে ওখানেও তো কিছু জোটার চান্স কম।

—তবু পৌঁছে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

—পৌঁছে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি? তখন হয়তো চা'ও গলা

দিয়ে নামবে না।

আলোচনা চালাতে চালাতে বসেই পড়েছি তিনজনে। দোকানের বাইরে পাতা বেঞ্চিতে। রবিনের ড্রাইভার সুরিন্দর শুধু চা নিল এক গ্লাস। আমাদের সামনে গরম করা তড়কার প্লেট, হাতে গড়া রুটি। ছোকরা দোকানদার পেঁয়াজ লংকাও দিয়ে গেছে। সঙ্গে স্যালাড।

তড়কা জিভে ঠেকিয়ে রবিন বলল, প্রচুর ঝাল দিয়েছে তো!

—খানা কিছু পড়ছে পেটে, এই না ঢের। সৌরভ সমে ফিরেছে। তড়কা মাখিয়ে রুটি মুখে পুরে বলল, টেস্টটা মন্দ নয়।

—খিদের মুখে সবই অমৃত। পেঁয়াজে কামড় বসালাম। খেতে খেতে বললাম, রুটিটাও বেশ নরম।

—তড়কায় বোধহয় চানার ডাল মিশিয়েছে।

—মনে হচ্ছে। কিমা দেওয়া থাকলে আরও জমে যেত। সেবার দিল্লি থেকে জয়পুর যাওয়ার পথে যা বিউটিফুল তড়কা খেয়েছিলাম না....। কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন হোঁচট খেলাম। আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর মৃতদেহ পড়ে আছে হাসপাতালে, এতক্ষণ তাকে নিয়ে আমরা কত উতলা ছিলাম, অথচ এই মুহূর্তে তুচ্ছ তড়কা নিয়ে গল্পে মাতছি! শোক এতই ক্ষণস্থায়ী? রুটির টুকরোটুকু কোনওক্রমে গিলে জল খেলাম এক ঢোক। নিচু গলায় বললাম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে।

রবিন চোখ তুলল—কী?

—জয়িতাকে বোধহয় খবর দেওয়া উচিত ছিল।

সৌরভ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—জয়িতা জেনে কী করবে?

—ভুলে যাচ্ছিস কেন, তথাগতর একটা ছেলেও আছে। বাপ ছেলের সম্পর্কটা তো মুছে যায়নি। এখন নয় তোতোন ছোট, বড় হয়ে সেও তো বলতে পারে বাবাকে শেষবারের মতো একবার দেখানোটা তোমাদের কর্তব্য ছিল।

—হুম। রবিন মাথা দোলাল, কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই, সকালটা হোক।

—জয়িতার বাপের বাড়ির নম্বর জানিস?

—আমার পুরনো ডায়ারিতে থাকতে পারে। আমি তো কোনও ডায়ারি

ফেলি না।.... সকালে সীমাকে ফোন করে জেনে নেওয়া যাবে। রবিনকে ঈষৎ বিমনা দেখাল। ভারী গলায় বলল, ছেলেকে বাপের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া....কী অপ্রিয় কাজ যে করতে হবে! তথাগতটা মাইরি সত্যি-সত্যি ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল।

সৌরভ গোমড়া স্বরে বলল, কিংবা ভাস্বতী। ইউ ক্যান নেভার বি সিওর, কে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফাঁসাল।

রবিন অপ্রসন্ন মুখে বলল—ফের ওই কথা! চুপ কর তো।

—কেন! আমি কি ইল-লজিকাল কিছু বলেছি?

সৌরভের চোয়াল শক্ত। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—কী তোরা তখন থেকে এর দোষ ওর দোষ করে এঁড়ে তর্ক জুড়েছিস! দোষ হয়তো কারোরই নয়। ওরা জাস্ট পরিস্থিতির শিকার।

রবিন কাঁধ ঝাঁকাল—হতেও পারে। গাড়ি হয়তো ঠিকঠাকই চলছিল, লরি ওদের বেমক্কা ঝেড়ে দিয়েছে। লাইক গড। অর ডেভিল।

—হুম্। তবে আমি শুধু অ্যাক্সিডেন্টটার কথাই বলছি না। তথাগত আর ভাস্বতীর গোটা জীবনটাই তো....। বলতে বলতে দূরমনস্ক হয়েছি সহসা। স্মৃতি হাতড়াচ্ছি। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার বয়স এখনও হয়নি, কাজেকর্মে ডুবে থাকি, তাই হয়তো নিকট অতীতও এখন আবছা আবছা ছবি। সেই ফটো অ্যালবাম উল্টোচ্ছি মনে মনে। শান্তভাবে বললাম, তোদের মেমারি কতটা শার্প আমি জানি না। আমার কথা বলতে পারি, কলেজ লাইফের ডে টু ডে ডিটেল আমার স্মরণে নেই। তাই ভাস্বতী আগে তথাগতর প্রেমে পড়েছিল, না তথাগত ভাস্বতীর, তা আমার পক্ষে বলা বেশ কঠিন। কিন্তু হ্যাঁ, তথাগত ছেলে হিসেবে অবশ্যই জুয়েল ছিল। ভাস্বতীও মোটেই ফ্যালনা ছিল না। আমরাই তো বলতাম, মেড ফর ইচ আদার। জে-এন-ইউতে এম-এ পড়ার ইচ্ছে তথাগতর ছিলই। সুতরাং ভাস্বতী তাকে ল্যাং মেরেছিল বলেই সে চলে গিয়েছিল, অথবা ভাস্বতীকে ডিচ করার উদ্দেশ্যেই তার দিল্লি পলায়ন—কোনওটাই আমি জোর গলায় বলতে পারব না। দু-আড়াই বছর ধরে ভাস্বতী তথাগতর প্রতীক্ষায় কেন বসে থাকেনি, কেন আশিসবাবুর প্রেমে পড়ল, তাও বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হতে পারে, পুনমের নিউজটা ভাস্বতীকে দূরে ঠেলেছিল। এরকম অবস্থায় আশিসবাবুর

মতো মিষ্টভাষী দায়িত্ববান মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়া এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। ....যাই হোক, তথাগত ভাস্বতী দুজনেই কিন্তু পরে বিয়ে করে যে যার মতো সুখী হতে চেয়েছিল। তথাগতর দুর্ভাগ্য, জয়িতা ওয়াজ টোটালি মিসম্যাচ ফর হিম। আমরা তো দেখেইছি, ওরা দুজনে দু মেরুর মানুষ। জয়িতা কঠোর নিয়মতান্ত্রিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ। মানে আমাদের রবিনের টাইপ। আর তথাগত তো তথাগতই। বরকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছিল জয়িতা। তাতেই উল্টো বিপত্তি, আরও উদ্দাম হয়ে গেল তথাগত। কে জানে হয়তো নিজেকে ভেঙেচুরে জয়িতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে জয়িতা ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, ওর লাইফটা কিন্তু পুরো ভ্যাকুয়ম হয়ে গেল। তোতোনকেও পেল না, পৃথিবীতে ও সম্পূর্ণ একা....ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। আপাতচোখে ওকে যেমনই লাগুক, ভেতরে ভেতরে ও বড় বেশি ইমোশনাল ছিল যে। আমাকে একবার বলেও ফেলেছিল, এখন আমার বেঁচে থাকা আর না থাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই রে জয়! আমার অস্তিত্বটাই যেন কেমন অর্থহীন!

রবিন চোখ সরু করল—এসব বলত নাাক?

—অবাক হওয়ার কী আছে! সৌরভ বলে উঠল, আমরা তো জানি ও খুব দুঃখী ছিল। ওর ওই যন্ত্রণাটাকেই তো ভাস্বতী এনক্যাশ করেছে।

—আবার সেই একবগ্গা চিন্তা! সৌরভের পিঠে হাত রাখলাম, ভাস্বতীকে বা খারাপ বলে ধরে নিচ্ছিস কেন? ভাস্বতীরও অনেক কষ্ট ছিল। পরপর মিসক্যারেজ....আশিসবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা স্টেল হয়ে আসছে....এমন একটা সময়ে তথাগতর সঙ্গে তার আবার দেখা। তথাগত তখন একটা ভগ্নস্তূপ। মনের দিক দিয়ে ভাস্বতীরও প্রায় এই দশা। এরা পরস্পরের কাছে মানসিক আশ্রয় তো চাইতেই পারে।

রবিনের খাওয়া শেষ। ছোট একটা ঢেকুর তুলে বলল—চাক না আশ্রয়, কে বাধা দিচ্ছে! কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে কেন বাপ? তথাগত কেন বিয়ে করে নিল না ভাস্বতীকে? কেন তাকে ফোর্স করল না ডিভোর্স নেওয়ার জন্যে?

—নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে ছিল। মেন্টাল অবস্ট্রাকশানটা ওরা হয়তো ওভারকাম করতে পারেনি।

—আর তাই পরকীয়া? এবং সেটাকে তুই সাপোর্টও করছিস!

—নিন্দেও করছি না। কোনও শূন্যতাবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওরা যদি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে....

—বা রে বা! শূন্যস্থান পূরণের তাহলে এটাই একমাত্র দাওয়াই? সোসাইটি, ভ্যালুজ, সামাজিক নিয়মকানুন, এসব আর তাহলে রাখার দরকার কী!

—ভুল করছিস রবিন। সমাজের নিয়ম সমাজের গরজেই থাকবে। আবার তথাগত ভাস্বতীরাও বাঁচতে চাইবে নিজেদের মতো করে। এটাই বাস্তব।

—অল বকোয়াস। সৌরভ গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছে। ভিজে আঙুল ঠোঁটে বুলিয়ে বলল, পরকীয়া ইজ নাথিং বাট সেক্স। এবং আশিসবাবু ভাস্বতীর সম্পর্কের গ্যাপটাও বেসড অন সেক্স।

—অত সরলীকৃত করে দিস না সৌরভ। মানুষের চাহিদা যদি শুধুই যৌনতা হয়, তাহলে তো কুকুর বেড়ালের সঙ্গে তার কোনও তফাত থাকে না। খিদে জাগল, কী অতৃপ্তি এল, অমনি মানুষ যাকে পেল তার সঙ্গে ইয়ে শুরু করল, এমনটা কি হয়? মানুষের বেলায় মনেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। আগে হৃদয়, তারপরে শরীর। যার কাছে ফিজিকাল আর্জই সব, সে তো জন্তুর শামিল। আশা করি, তথাগত আর ভাস্বতীকে তুই ওই ক্যাটিগোরিতে ফেলছিস না! তেমনটা হলে ওদের সম্পর্ক ছ-সাত বছর ধরে টিকে থাকত কি?

সৌরভের বুঝি খুব একটা মনঃপূত হল না কথাগুলো। তবে প্রতিবাদও করল না আর। চা দিয়ে গেছে দোকানদার, চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

বিল টিল মিটিয়ে গাড়িতে ফিরতে প্রায় আড়াইটে। হিম পড়ছে বেশ, শীত শীত করছিল। কাচ তুলে দিয়ে সিটে হেলান দিলাম তিনজনেই। ভরা পেটে ঘুম ঘুম পাচ্ছে, জড়িয়ে এল চোখ।

রবিনের ডাকে তন্দ্রা ছিঁড়ল—এই জয় ওঠ, এসে গেছি।

চোখ রগড়ে দেখলাম একেবারে হাসপাতাল-কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তথাগত ভাস্বতীর

কাছে পৌঁছে গেলাম তাহলে! গোটা পথ দু'জনকে নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে অনেক, এবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পালা!

নামলাম গাড়ি থেকে। পা টলছে। হাঁটুর জোর কমে গেল কেন হঠাৎ? অনেকক্ষণ টানা বসে আছি বলে? কাঁপছিও যেন অল্প অল্প। শেষরাতের বাতাস কি এত শীতল? না কি দূর থেকে মৃত্যু নিয়ে ভাবা আর মৃত্যুর একদম কাছে এসে পড়ার মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য, সেটাই জানান দিচ্ছে মস্তিষ্ক।

দোতলা হাসপাতাল। চত্বর পুরোপুরি নিঃসাড় নয়। টুকরো টুকরো আওয়াজ উড়ে আসছে। ধাতব ধ্বনি। মানুষের স্বর। বুঝি বা বাতাসেরও শব্দ। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক ঝাঁকড়া আমগাছ, নীচের বাঁধানো বেদিতে ঘুমোচ্ছে জনা কয়েক লোক। একমাত্র এক বৃদ্ধই শুধু জেগে। হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে উদাসীন। এই পৃথিবীতে নিদ্রার মেয়াদ বুঝি পূর্ণ হয়ে গেছে বৃদ্ধর।

সৌরভ এগিয়ে এনকোয়্যারির দিকে গেল। আমি আর রবিন হাঁটছি শ্লথ পায়ে। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। নবজাতক কী? সবে এল দুনিয়ায়? লম্বা টানা করিডোর পেরিয়ে হনহন চলেছে এক সেবিকা। তার পোশাকের শুভ্রতা চোখে লাগছিল বড়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরেছে সৌরভ। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল— দুটো লাশই চালান করে দিয়েছে মর্গে। ডাক্তার আসবে বেলা দশটায়, তার পর পোস্টমর্টেম।

রবিন শুকনো গলায় বলল—ও। তাহলে এখন কী করণীয়?

—অপেক্ষা।

—আর কেউ পৌঁছেছে কিনা খবর নিলি?

—আমরাই প্রথম। ....ওরা বলছিল চাইলে এখন গিয়ে একবার দেখে আসতে পারি।

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। একবার রবিনকে দেখছি, একবার সৌরভকে। সিগারেট বার করে চাপলাম ঠোঁটে। দেশলাই হাতড়াচ্ছি। এ পকেট, ও পকেট। অন্ধের মতো।

রবিন দুর্বল স্বরে বলল—কী রে, যাবি এখন?

তিনটে কাঠি মিস করে চতুর্থ কাঠিটা জ্বালিয়েছি। খানিকটা ধোঁয়া গিলে

বললাম—যেতে তো হবেই। সে এখনই হোক, কী পরে।

সৌরভ বলল—হ্যাঁ, শনাক্ত করার জন্যও তো...ধর আদৌ যদি ওরা না হয়! হয়তো অন্য কোনও তথাগত! অন্য এক ভাস্বতী!

জানি এ একান্তই অসম্ভব। তবু এই মুহূর্তে কথাটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছিল। ফুসফুসে তামাকপোড়া বাতাস ভরে নিয়ে বললাম—না হলেও তো একবার দেখতেই হবে। চল্, এখনই নয় ঘুরে আসি।

বারবার যাওয়ার কথা বলছি বটে, কিন্তু কারুরই যেন পা সরছে না। যে তথাগত আর ভাস্বতীকে নিয়ে আমরা অত চর্চা করছিলাম, না দেখার জোরে তাদের বুঝি আমরা জ্যান্ত রাখতে চাইছি। যেন সামনে গিয়ে পড়লে ওরা সত্যি সত্যি মরে যাবে।

খোলা মাঠ থেকে লাশঘর কী আর এমন দূর, তবু ওটুকু পেরোতে যেন কত বছর লেগে গেল। হিমেল ঘরটায় চাপা বোঁটকা গন্ধ। বাতি জ্বলছে টিমটিম। হলদেটে। আবছায়া মাখা মলিন টেবিলে পাশাপাশি শুয়ে দুটো দেহ। নিথর। গলা অবধি সাদা চাদরে ঢাকা।

হ্যাঁ, ওরাই। তথাগত আর ভাস্বতী।

রবিন বিড়বিড় করে বলল—আশ্চর্য, মাথায় মুখে কোনও চোট নেই।

সৌরভ অনুচ্চস্বরে বলল—বোধহয় মিড্‌ল রিজিয়নে ধাক্কা খেয়েছে। বুকে...পেটে...। তথাগতর মুখখানা দ্যাখ....যেন সমস্ত সমস্যার অবসান, আরামসে ঘুমোচ্ছে।

রবিন আত্মগতভাবেই বলল—ভাস্বতীর মুখটা কেমন জ্বলজ্বল করছে। উদ্বেগ, অতৃপ্তি, অশান্তি, কিচ্ছুটি নেই। বরং তথাগতকেই যেন....!

আমি অবশ্য দুটো মুখেই প্রশান্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। দু'জনেই যেন স্বস্তি পেয়েছে, বহুকাল পর।

নাহ্, আমরা কেউই সত্যিকারের তথাগত বা ভাস্বতীকে দেখছি না এখনও। চোখে যা পড়ছে, তা তো আমাদেরই মনের প্রতিচ্ছায়া। আমাদেরই ভাবনার আদলে গড়া দুটো মানুষ।

ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম হিমঘর থেকে। বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। ভাঙা চাঁদ উবে গেছে আকাশ থেকে। পাখিরা জাগছিল। ♣

লালুবাবু

দরজা খুলে সোমা গোমড়া মুখে বলল, তোমার দাদা এসেছে।

শুনেই চটকে গেল মেজাজটা। অফিসে এখন ইয়ার এন্ডিংয়ের চাপ, সারাদিন মাথা তোলার অবকাশ পাইনি, ছুটির পর মিনিবাসের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে পাক্কা চল্লিশ মিনিট, ফেরার পথে জ্যামে জ্যামে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে, হা-ক্লান্ত দশায় বাড়িতে পা রেখেই কিনা এই সুসমাচার!

ছোট্ট প্যাসেজটায় জুতো ছাড়তে ছাড়তে নজরে পড়ল, ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছেন আমার অগ্রজটি। রাজাবাদশার ভঙ্গিতে। সোফার কাঁধে দু'হাত ছড়ানো, মৌজ করে টিভি দেখছে।

বিরস গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুই কতক্ষণ?

রঙিন পরদা থেকে চোখ সরল। পঞ্চাশ ছোঁয়া লম্বাটে মুখে একগাল হাসি, আরে, তুই এসে গেছিস! সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে তোর জন্য ওয়েট করছি।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম, কেন?

—এমনিই। ভাইয়ের কাছে আসতে ইচ্ছে করে না?....এদিকে একটা কাজও ছিল, ভাবলাম ঘুরেই যাই। জেঠুসোনাটাকেও কতদিন দেখিনি।

—অ। তা দেখা হল রাজার সঙ্গে?

—হল তো। কত গপ্পো-টপ্পো করলাম। তারপর তো রাজাবাবু কোচিং ক্লাসে বেরিয়ে গেল।

—চা-টা খেয়েছিস?

—সোমা থাকতে ফাঁকি পড়ার জো আছে? আহাহা, কী চমৎকার হালুয়া বানিয়েছিল তোর বউ। ঠিক মার মতো। একটু ঘি দিয়ে, কাজু কিশমিশ দিয়ে....। এক চামচ করে তুলছি, আর গন্ধেই মার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আদিখ্যেতা! শুনলেই মনে হবে ছেলে যেন মা অন্ত প্রাণ! কিন্তু আদত ঘটনা তো এই, জীবনের শেষ কটা বছর মাকে প্রায় দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে ওই বড় পুত্তুর। লালু লালু করে মা হেদিয়ে মরছে, এদিকে মাসের পর মাস লালু বাবাজির দর্শন নেই। যদি বা তিনি এলেন, তো স্রেফ ধান্দায়। টাইমটা খারাপ যাচ্ছে, মাল্লু ছাড়ো, মাল্লু ছাড়ো....! দিতে গাঁইগুঁই করলেই মার ওপর হল্লা, চেঁচামিচি। বাবার ফ্যামিলি পেনশনের টাকায় আমার কোনও শেয়ার নেই? নিজে তো নীলুর সংসারে বসে পোলাও-বিরিয়ানি সাঁটাচ্ছ, ওদিকে আর এক ছেলে, ছেলের বউ যে অনাহারে শুকিয়ে মরছে, সে খবর রাখো? পর করে দিয়েছ বলে আমি কি এখন এতই পর? ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে অভিযোগ হেনে আর আবেগের কোঁতকা মেরে মাকে নিংড়ে নেওয়াই যার কাজ ছিল, তার জিভে এখন মাতৃনামের সুধা! হাহ্।

শ্লেষ ফুটেই গেল গলায়। বললাম, মার কী অপার সৌভাগ্য!

হুল দাদাকে ফুটলই না। নির্বিকারভাবে দাদা বলল, না রে, সত্যি খুব মন কেমন করে। মাকে আমি বড্ড কষ্ট দিয়েছি রে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝিনি।

ফের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, জ্ঞানপাপী।

—সে তুই যা বলিস। উপযুক্ত সন্তান তুই, মা-বাবাকে মাথায় করে রেখেছিলি, আমি তো কোনও কর্তব্যই পালন করতে পারিনি।

একটু বেশি সুমিষ্ট বচন শুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই অকারণে নয়, পিছনে উদ্দেশ্য আছে নির্ঘাৎ। সতর্ক গলায় বললাম, যাক, এতকাল পর বোধোদয় হল তাহলে!

ব্যঙ্গটা যেন গায়েই মাখল না দাদা। মুখে একটা স্নেহমাখা হাসি ফুটিয়ে বলল, অফিস থেকে তেতেপুড়ে এসেছিস, যা ঘেমো জামাকাপড়টা বদলে আয়। তারপর দু'ভাইয়ে খানিক সুখদুঃখের গপ্পো করব।

আরও একটু গুটিয়ে গেলাম। শোওয়ার ঘরে চলে এলাম বটে, কিন্তু বুকে একটা মশা পিনপিন করেই চলেছে। মা মারা যাওয়ার পর এখন আমার কাঁধে ভর করেছে দাদা। দু'চার মাস পর পরই হানা দেবে, আর যা পারবে হাতিয়ে নিয়ে যাবে। সব সময়ে যে উপুড়হস্ত হই তা নয়, তবে কখনও কখনও দিতেও তো হয়। হাজার হোক, মায়ের পেটের ভাই তো! নিজে বউ-ছেলে নিয়ে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই জীবন কাটাচ্ছি, অথচ দাদার প্রায় নিরন্ন হাল, ভাবতেও তো খারাপ লাগে। একেবারে দীনহীন ভিখিরির মতো হাত পাতে না দাদা, বরং বোলচালের বেশ আড়ম্বরই আছে, তবু ভেতরের অবস্থাটা তো আঁচ করা যায়। প্রতিবারই ঘটা করে বলবে, এই শেষ রে, এবার নতুনভাবে জীবন শুরু করছি...। শুনে বোধহয় আমার আশাও জাগে, নইলে টাকা দিইবা কেন?

অথচ আশাটা যে একশো ভাগই নিরর্থক, এটাও তো আমি জানি। জন্ম থেকেই দেখছি তো আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটিকে। কোনওদিন সেভাবে চাকরি-বাকরি কিছু করল না, শুধুই ফন্দিফিকির খুঁজছে কীভাবে ফাঁকতালে কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। দায়ে ঠেকলে উঞ্ছবৃত্তিতেও আপত্তি নেই, তবু খাটবে না সে কিছুতেই। শ্যামবাজারের যে বাড়িটায় আমরা প্রায় পঁচিশ বছর ভাড়া ছিলাম, সেখানে বেশ বড়সড় একটা বাইরের বারান্দা ছিল, একখানা ঢাকা উঠোনও। দারুণ জমজমাট জায়গা, পাশেই বাজার। মওকা বুঝে আমাদের ওই বারান্দা আর উঠোনটিকে মোটামুটি গুদাম বানিয়ে ফেলেছিল দাদা। আশপাশের এককাঁড়ি দোকান মাল রেখে যাচ্ছে যেমন খুশি, বিনিময়ে ঝড়াঝ্ঝড় পকেটে নোট আসছে লালু মহারাজের। তারপর তো শুরু হল বাড়ির বাইরের দেওয়াল বেচা। জানলা খোলার উপায় নেই, পাটাতন

লাগিয়ে পসরা টাঙিয়ে বসে গেছে সার সার হকার। পান বিড়ি সিগারেট টিপ চুড়ি মালা...। বাবা খেপেমেপে কিছু বলতে গেলে উল্টো চোটপাট— তোমার কী? আপত্তি করলে বাড়িওয়ালা করবে, তার সঙ্গে আমি বুঝে নেব।

আশ্চর্য ব্যাপার, নিলও বুঝে। বাড়িওয়ালা যখন গোটা একতলাটা বেহাত হয়ে যাচ্ছে দেখে আমাদের তাড়ানোর জন্য আদাজল খেয়ে লাগল, তখন বাড়ি ছাড়ার মাশুল হিসেবে তার কাছ থেকে পুরো দু'লাখ বাগিয়ে নিল দাদা।

তা সে রোজগারও লালুবাবু রাখতে পারলেন কই! বাবা-মাকে নিয়ে তখনই সরে এসেছিলাম এই পাইকপাড়ায়, আর তিনি টাকাটি হাতিয়ে নিজের বউটিকে শুধু বগলদাবা করে, ভেগে গেলেন বাগুইআটি। বোধহয় ভেবেছিল, ওই টাকাতেই গোটা জীবনটা ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে কেটে যাবে। আজকের দুনিয়ার মাত্র দু'লাখ যে কত সামান্য তা এখন টের পাচ্ছে হাড়ে-হাড়ে।

চৈত্রমাস চলছে। চিটপিটে গরম। হাওয়া নেই। ছোট্টো একটা স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে এসে বসেছি সোফায়. সোমা চা দিয়ে গেল। সঙ্গে প্লেটে নোনতা বিস্কুট।

দাদা টিভি অফ করে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। আড়চোখে চা-বিস্কুট দেখে নিয়ে বলে উঠল, নীলুকে জলখাবার দিলে না, সোমা?

এখনও সোমার মুখ বেশ বেজার। কাঠ কাঠ গলায় বলল, আপনার ভাই এ সময়ে কিছু খায় না।

—সে কী? কেন? অফিস থেকে এসে পেটে কিছু না দিলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। দাও দাও, ওকে একটু হালুয়া এনে দাও।

—হালুয়া ও রাতে খাবে। রুটির সঙ্গে।....যদি ইচ্ছে থাকে তো বলুন, আপনাকে আর একটু এনে দিচ্ছি।

—দেবে? নীলুর জন্য থাকবে তো?

সোমা উত্তর দিল না। খর চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে চলে গেছে রান্নাঘরে। বাটি করে খানিকটা হালুয়া এনে ঠক করে রেখে গেল টেবিলে। লালুবাবুর কোনও হেলদোল নেই, চামচে তুলে খাচ্ছে চাকুম-চুকুম।

আহারের ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, এসব খাদ্য বড় একটা জোটে না লালুবাবুর। বাটি শেষ করে একখানা বিস্কুট পুরল মুখে। চিবোতে চিবোতে বলল, মিষ্টি নোনতার এই কম্বিনেশানটা দারুণ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, হুম্।

দাদাও পেয়ালা তুলেছে হাতে। সোফায় হেলান দিল ফের। দু'-চার সেকেন্ড চুপ। চোখ পিটপিট করছে আপনমনে। হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই নাকি ফ্ল্যাট কিনছিস?

চা চলকে গেল। ভুরু কুঁচকে বললাম, কে বলল?

—সোমাই গল্প করছিল। সাত লাখের মতো নাকি পড়ছে...

—না মানে...একটা ছোটোখাটো মাথা গোঁজার ঠাঁই। দুটো ছোট ছোট ঘর, ফালি বারান্দা, বাথরুম, আর একটুখানি বসার জায়গা...। গলায় অজান্তেই কেমন আত্মরক্ষার সুর এসে গেল।—বুঝিসই তো, ভাড়াবাড়ি মানেই অনিশ্চয়তা। বাড়িওয়ালার কখন কী মর্জি হবে...।

—সে আর বলতে। দ্যাখ না, গত এগারো বছরে আমাকেই না হোক খান আটেক বাড়ি বদলাতে হল।

মনে মনে বললাম, সে তো তোমার নিজস্ব কৌশলের গুণে চাঁদু। সামান্য অ্যাডভান্স দিয়ে ঢুকছ, তারপর মাসের পর মাস ভাড়া না দিয়ে, তুচ্ছ কারণে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে, তার ওপরেই চোটপাট করে লটবহর নিয়ে কেটে পড়ছ অন্যত্র। তোমার ছ্যাঁচড়ামোর সঙ্গে আমার তুলনা চলে কী?

মুখে একটা দেঁতো হাসি টেনে বললাম, হ্যাঁ, ওই সবই ভেবে...লোন-টোন নিয়ে...সোমার গয়নাগুলোও বেচতে হচ্ছে...

—তো হোক। নিজের ঘরবাড়ির জন্য এটুকু করাই দায়। দাদা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল হঠাৎ, বাবার ওপর এক এক সময়ে আমার খুব রাগ হয়, জানিস।

—কেন?

—বাবা একটা বাড়ি রেখে যেতে পারত না? তাহলে তোকেও আজ ধারকর্জে যেতে হয় না, আমিও ভেসে বেড়াই না যাযাবরের মতো।

—বাবা করবেটা কী করে? কী এমন বড় চাকরি করত বাবা? পিসিদের বিয়ে দিয়েছে, ঠাকুমার ক্যানসারে জলের মতো টাকা বেরিয়ে গেল...তার সঙ্গে দুটো ছেলেকে বড় করার খরচ...

—সে তুই যাই বল, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। নিদেনপক্ষে রিটায়ারমেন্টের সময়ে পাওয়া টাকাগুলো দিয়েও যদি কিছু একটা খাড়া করত...।

—ফালতু বকিস না তো। দুম্ করে রাগ হয়ে গেল, বাবার যে কটা টাকা জমানো ছিল, তুই তো তার পাইপয়সা বুঝে নিয়ে গেছিস। কী করেছিস তাই দিয়ে? বাড়ি ছাড়ার সময়েও যে দু'লাখ টাকা হাতালি, সেগুলোই বা গেল কোথায়? ওসব দিয়ে নিজের একটা কিছু করে নিসনি কেন?

—প্ল্যান তো ছিল। কিছু টাকা চিটফান্ডে রাখলাম...ভাবলাম মাস মাস থোক একটা অ্যামাউন্ট আসবে ঘরে, বাকিটা দিয়ে জমি কিনব। তা সেই চিটফান্ডই আমার চিট্ করলে আমি কী করব?

—ফের বাজে কথা! রেসের মাঠে তুই টাকা ওড়াসনি?

—সে আর কত! দাদা মিনমিন করছে, ওই বড় জোর পাঁচশো-হাজার।

মিথ্যে বলতে পারেও বটে। ঘোড়া আর জুয়ার টেবিলেই যে বেশির ভাগ টাকা ফৌত হয়েছে, সে যেন আমার অজানা! কোত্থেকে যে দাদাকে ওইসব রোগে ধরল! অবশ্য কুপথে যাওয়ার জন্য আলাদা সঙ্গী খুঁজে নেওয়াই বা কী এমন কঠিন।

যাক গে যাক, ওসব নিয়ে কচকচি আর ভাল্লাগে না। জিজ্ঞেস করলাম, বউদির খবর কী? আছে কেমন?

—আছে। অম্লশূল, পিত্তশূল, গাঁটে ব্যথা, হাঁপানি, সব নিয়েই আছে।

—ডাক্তার-ফাক্তার দেখাস?

—সে তো চাইলেই দেখানো যায়। আমার ক্লাসমেট দ্বিজোত্তম, সে তো এখন পিজিতে। হেভি নাম। স্ট্রেট ওর বাড়ি চলে গেলেই যত্ন করে দেখে দেয়। কিন্তু তোর বউদির ওই এক গোঁ, শরীরে অ্যালোপ্যাথির বিষ ঢোকাবে না।...কীসব পাতার রসটস খাচ্ছে।

—বুঝলাম। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছিস।

পলকের জন্য থতমত খেল দাদা, পরক্ষণে মুখে অমলিন হাসি, এবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিক।

—মানে?

—একটা বিজনেস স্টার্ট করছি।

—এর টুপি ওর মাথায় চাপানোর?

—মাইরি না। আপঅন গড। এবার সলিড ব্যবসা।

—কীসের?

—নুন। গুজরাটের এক কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিচ্ছি। প্রপার কলকাতায় এদের মার্কেট নেই, কিন্তু মফস্‌সলে চলবে ভাল। আমার কাজ শুধু অর্ডার ধরা। কোম্পানি নিজেই স্পটে মাল ডেলিভারি করে দেবে। মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট, ম্যাক্সিমাম প্রফিট। পার কেজি চল্লিশ পয়সা। বিশ-পঁচিশ টন মাসে বেচা তো কোনও ব্যাপারই না। ফেলে ছড়িয়ে দশ হাজার টাকা থাকবে।

উৎসাহ দেখালাম না, আবার নিরাশও করলাম না। আলগোছে বললাম, ভালোই তো, কর।

—কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে রে। দাদা নাক চুলকাচ্ছে, কিছু সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখা দরকার।

পলকে স্নায়ু টানটান। ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছি।

দাদা আবার বলল, কম নয়, পঁচিশ হাজার। হুট বলতে অতগুলো টাকা পাই কোত্থেকে?

রা কাড়লাম না।

দাদা ফের বলল, তোর বউদির চুড় দুটো বেচে হাজার দশেক টাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। ভাবছিলাম, বাকিটা তোর কাছ থেকে নিয়ে কাজ চালিয়ে দেব।...এক দেড় মাসের তো ব্যাপার। তারপর থেকে তো টাকা আসবেই, তোকেও তখন অল্প-অল্প করে শোধ করে যাব।

একদমই ফাঁপা বুলি। প্রত্যেকবারই তো ধার হিসেবে চেয়ে নেয়, এক পয়সা শুধেছে কখনও?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, আমি কোত্থেকে পাব? শুনলি না, নিজেই এখন দেনায় ডুবছি।

—মাত্র তো পনেরো হাজার। দ্যাখ না চেষ্টা করে।

—বললাম তো, সম্ভব নয়। এখন একটা পয়সাও দিতে পারব না।

—ফিরিয়ে দিচ্ছিস নীলু? হঠাৎই দাদার মুখটা করুণ, জীবনের অনেকগুলো বছর নষ্ট করে ফেলেছি রে। শেষ সুযোগ এসেছে, নতুন করে শুরু করতে চাই। ভাই হয়ে পাশে একটু দাঁড়াবি না?...তোর বউদি বলছিল, দরকারের সময়ে বিশ্বসংসারে কেউ তোমায় না দেখুক, তোমার ভাই আছে। দাদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কী কপাল! সেই ভাই কিনা নিজে ফ্ল্যাট কিনবে বলে আমায় হাঁকিয়ে দিচ্ছে। অথচ সে চাইলেই হতভাগ্য দাদাটা এই বয়সে একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

ওফ্, প্রতিবারের মতোই সেই মানসিক চাপ। একটা সুযোগ দে নীলু, নতুনভাবে শুরু করি!

দু'আঙুলে কপাল টিপে ধরলাম, ঠিক আছে। সামনের সপ্তাহে আয়।

গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এল। বর্ষা ফুরিয়ে শরৎ। দ্রুতগতিতে উঠছে আমাদের ফ্ল্যাট। তিনতলা পর্যন্ত ঢালাই শেষ, আর একটা তলা হলেই শুরু হবে অন্দরের কাজকর্ম। আশায় আশায় দিন গুনছি কবে নিজের বাড়িতে যেতে পারব পাকাপাকি।

ভাদ্রের মাঝামাঝি একবার যেতে হল প্রোমোটারের অফিসে। লেক টাউনে। দফায় দফায় টাকা দিতে হচ্ছে, তৃতীয় কিস্তির চেক দিলাম ভদ্রলোককে। কিছু কথাও হল। বাথরুম নিয়ে, রান্নাঘর নিয়ে। কী ধরনের টাইলস আমাদের পছন্দ, কোন কোম্পানির সিঙ্ক, বেসিন, কমোড বসাব, এই সব।

সেখান থেকে বেরিয়ে হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ল। সেই যে পনেরো হাজার নিয়ে প্রস্থান করলেন লালুবাবু, আর তো তার দর্শন নেই। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, এরকমটাই তো সে করে প্রতিবার। হাতে টাকা দিলেই কর্পূরের মতো উবে যায়। ফোনে যে খবর নেব সে উপায়ও নেই, কোনো কনট্যাক্ট নম্বরও দিয়ে যায়নি। খুদে চিরকুটে লিখে দিয়ে যাওয়া ঠিকানাটুকু

যা সূক্ষ্ম সুতোর সংযোগ, যদি না এর মধ্যে তিনি বাড়ি বদল করে থাকেন। এবার তো সে কেষ্টপুরের দিকটায় উঠে এসেছে, এখান থেকে খুব একটা দূরও নয়, টুপ করে ঘুরে আসব? টাকা তো এবার নির্ঘাৎ জলে গেছে, একবার সরেজমিন করতে দোষ কী?

খানিকটা দোনামোনা করে চলেই গেলাম। লালবাবুর ডেরা খুঁজে বের করা সোজা কাজ নয়। আগেও দেখেছি বড় রাস্তা থেকে মাইলখানেক গিয়ে, এ-গলি সে-গলি ঘুরে, বেশ কিছু আঁদড়-বাদড় পেরিয়ে তবে না সেখানে পৌঁছানো যায়।

এবারও বাড়ি সেই বারো ঘর এক উঠোন। আধা বস্তি টাইপ। ঘর অবধি যেতে হল না, আটফাটা উঠোনেই দেখা মিলল বউদির। স্নান সেরে উঁচু দড়িতে শাড়ি মেলছে। আমাকে দেখেই চিমসে মুখখানায় অকৃত্রিম উল্লাস, ওমা! এসো এসো।

পিছন পিছন গেছি ঘরে। উহুঁ। ঘর নয়, কুঠুরি। আট বাই দশ হবে কিনা সন্দেহ। তার মধ্যেই খাট, আলমারি, টেবিল-ফেবিল ঢুকিয়ে পুরো জবরজং করে রেখেছে। এক দিকে আবার ট্রাঙ্কের পাহাড়। ঠাকুরের আসনও আছে ঝুলন্ত তাকে। একটা চোদ্দো ইঞ্চির টিভিও। জানলা-দরজায় ঝুলছে শাড়ি কাটা পরদা।

বিছানার চাদর টানটান করে বউদি বলল, বোসো। পা তুলে বোসো।

কিঞ্চিৎ জড়োসড়োভাবেই উঠেছি খাটে। বউদি চলে গেছে ভেতরের ফালি জায়গাটুকুতে। সেখান থেকেই বলল, চা করব? খাবে?

—দরকার নেই।....দাদা কোথায়?

—সক্কালবেলাতেই বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় গেল?

—যেখানে যায় রোজ। অফিসে।

—রবিবারে অফিস?

—ওর আবার শনি-রোববার কিছু আছে কি না? নিজের অফিস তো।

শিহরিত হলাম। দাদা কি সত্যিই বদলালো নিজেকে? মতি হল

কাজেকর্মে? জিজ্ঞেস করলাম, ডিস্ট্রিবিউটারশিপের অফিস খুলে ফেলেছে বুঝি?

বউদি বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অবাক মুখে বলল, ডিস্ট্রিবিউটারশিপ?

—হ্যাঁ। সেই নুনের কারবার....

—না তো। ও তো এখন পার্টনারশিপে কী একটা ব্যবসা করছে। খুব সেজেগুজে বেরোয়। টাই কিনেছে। বউদির চোখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ইনকামও খারাপ হচ্ছে না। পুজোতে আমায় দার্জিলিংয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। কতকাল যে পাহাড় দেখিনি। সেই কবে ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে....

বউদির চোখে স্বপ্ন স্বপ্ন ঘোর। ক্ষয়াটে চেহারায় একটু গত্তিও লেগেছে। বউদিকে শেষ দেখেছিলাম রাজারহাটের বাড়িতে। তখন যেন কথাই বলতে পারছিল না, ধুঁকছিল। আজ বেশ সতেজ। ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া জুটছে মনে হয়।

বাবু হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলাম, তা দাদা ব্যবসাটা করছে কীসের?

—বলতে পারব না গো। তবে ধর্মতলা স্ট্রিটে ঘর নিয়েছে।

—পার্টনারটি কে?

—রাজু সিং। বিহারি ছেলে। তোমার দাদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

—একে আবার জোটাল কোত্থেকে?

—জুটে গেছে।... ছেলেটা ভাল। তোমার দাদাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আমাকেও। জানো তো, আমাকে মাইজি মাইজি বলে ডাকে। বউদির মুখে নির্মল হাসি। মিনতির সুরে বলল, অ্যাই, গরিবের ঘরে একটু চা খাও না গো। ঘরে ক্রিম বিস্কুট আছে....। তুমি শুধু মুখে চলে গেছ শুনলে তোমার দাদা বকাবকি করবে।

—বসাও তাহলে।

ফের ফালি জায়গাটুকুতে গিয়ে স্টোভ জ্বালিয়েছে বউদি। কেরোসিনের পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে গেল ঘরময়। তবু আমার খারাপ লাগছিল না। মনে হচ্ছিল অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে এতদিনে বোধহয় নিশ্চিন্তে ঘরকন্না

করার সুখ পেয়েছে বউদি, ঘরজোড়া ওই সংসারী গন্ধে যেন ভাসছে সুখটুকু।

পুরনো কথা মনে পড়ছিল। দাদার বিয়ে, আমাদের বাড়িতে বউদির প্রথম পা রাখা, আরও অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা। দাদার বিয়ে তো এক পুরোদস্তুর নাটক। বলা নেই, কওয়া নেই, দুম্ করে একদিন এক রোগাসোগা মেয়ের হাত ধরে দাদা বাড়িতে হাজির। আমাদের রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে মা, নীলিমাকে তুমি বরণ করে ঘরে তোলো! মা তো প্রায় মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। বাবাও স্তম্ভিত। ছেলের চাকরি-বাকরি নেই, বলে বলেও তাকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসানো যাচ্ছে না, কোনও রকমে পাসে গ্র্যাজুয়েট হয়ে দিন-রাত রকবাজি করে বেড়ায়...সে কিনা একটা মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলল! সাহস তো কম নয়! তা মা তো কোনওকালেই দাদার দোষ দেখে না, একটু সামলে নিয়ে শুরু হয়ে গেল তার বউমা নিয়ে আহ্লাদিপনা। আহা, কী ঢলঢলে মুখখানা গো! তোমাদের কদ্দিনের আলাপ গো! কী দুষ্টু ছেলে, আমায় একবারও বলেনি গো! ওদিকে বাবা তখন দাঁত কিড়মিড় করছে। দুটোরই ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিত! শেষমেশ মার আহ্লাদেরই জয় হল। মার উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হল বাবাকে। শুধু তাই নয়, যেতে হল মেয়ের বাড়িতেও। যাতে দু'বাড়ি মিলিয়ে একটা যা হোক তা হোক অনুষ্ঠান করা যায়। বউদির বাবা নাকি রে-রে করে তেড়ে এসেছিল—সাফ বলে দিচ্ছি মশাই, আমার মেয়ে মরে গেছে। আপনার ওই লুচ্চা ছেলেটাকে যদি কখনও বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখি, ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব। পরে অবশ্য বউদির মা লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু শাড়ি-গয়না পাঠিয়েছিল মেয়েকে, কিন্তু বউদি আর কোনওদিন বাপের বাড়িতে ঢুকতে পারেনি।

এত কাণ্ডের পরেও বাবা কিন্তু আস্তে আস্তে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করেছিল। বোধহয় ভেবেছিল, বউয়ের জোয়াল কাঁধে চাপলে বখাটে ছেলেটা হয়তো একটু সজুত হবে। কোথায় কী! ছেলে তো শুধু প্রেমের জোয়ারে পানসি ভাসিয়ে হাওয়াই খাচ্ছে, হাওয়াই খাচ্ছে, চাকরি-বাকরির কোনও চাড়ই নেই। বড়মামা উপযাচক হয়ে একটা কারখানায় সুপারভাইজারের কাজে ঢুকিয়ে দিল, মাসখানেকও টিকল না। সাড়ে আটটা থেকে ডিউটি, সাড়ে দশটার

সময়ে লালুবাবু হেলেদুলে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, জানালায় দাঁড়িয়ে প্রেমে গদগদ বউদি প্রাণেশ্বরকে যতক্ষণ দেখা যায় হাত নেড়ে নেড়ে টা-টা করেই চলেছে....সে এক দৃশ্য। পিসেমশাই চেষ্টাচরিত্র করে সেলস লাইনে কাজ জোগাড় করে দিল, সেখানে তো রীতিমতো এক কীর্তি স্থাপন করলেন লালুবাবু। কোম্পানির স্যাম্পল মাল হাফ দামে বেচে, সেই টাকায় সিনেমায় যাচ্ছে বউকে নিয়ে! যেমন দেবা, তেমনি দেবী! কোম্পানির লোক আসছে দাদার খোঁজে, বউদি ছুট্টে দরজায় গিয়ে বেমালুম বলে দিচ্ছে, উনি তো এখন বাড়ি নেই!

হ্যাঁ, মা যেমন লাই দিয়ে বারোটা বাজিয়েছিল দাদার, বউদিও প্রায় তাই। দু'জনের কেউই তার জন্য কম শাস্তি পায়নি। বউদি তো বোধহয় অনেক বেশিই। বিয়ের বছর দেড়-দুই পরে যখন মধুচন্দ্রিমার ঘোর কাটল বউদির, তখনই সে টের পেল কোন চোরাবালিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশকে নীল দেখায় বটে, আসলে সে এক মহাশূন্য। কাজ জুটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে বিদ্যেও পেটে নেই, বাপের বাড়ির দরজাও বন্ধ, নিরুপায় বউদি তাই এক মারাত্মক প্রতিশোধ নিতে শুরু করল নিজের ওপরই। একের পর এক বাচ্চা আসে পেটে, হাসপাতালে গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে আসে। শরীরটাও ভেঙে গেল ক্রমশ। বারবার সোজা রাস্তায় আনার চেষ্টা করেছে দাদাকে। কিন্তু কার্নিক মারা যার স্বভাব, তাকে সে সিধে করবে কী করে? তবে হ্যাঁ, দাদার বিরুদ্ধে কারও কাছে অভিযোগ জানায়নি কখনও। যখন প্রায় নিরন্ন দশা, তখনও দাদার মান বাঁচিয়ে চলেছে সাধ্যমতো। বুদ্ধিটা তো কম, বোধহয় ধরেই নিয়েছে দাদা তার ভবিতব্য।

তা এবার যদি একটু খেয়ে-পরে থাকে তো থাক। গলা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দাদার যখন রোজগারপাতি হচ্ছে কিছুটা, এখানে এখনও পড়ে আছ কেন?

—ঘর বদলানোর কথা বলছ?

—হ্যাঁ। এবার একটু ভদ্র জায়গা দেখে উঠে যাও।

—দেখি। তোমার দাদা তো বলছিল পুজোর পর...। বউদি চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এল। বিছানায় কাপ-ডিশ রেখে বসেছে খাটের ওপরে। বলল,

সোমা, রাজা কেমন আছে?

—ভাল।

—রাজাকে তো কখনও কিছু দিতে পারিনি। এবার যদি একটা শার্টপ্যান্ট কিনে দিই, নেবে তো? ভাবছিলাম সোমার জন্যও একটা শাড়ি...

—ওসব খরচাপাতিতে এখনই যাচ্ছ কেন? পরে কোনও সময়ে দিয়োখন।

—না গো নীলু, আমাদের অত খারাপ অবস্থা আর নেই। এখন সপ্তাহে দু'দিন মাছ খাই। রাজু মাঝে মাঝে মুরগিও নিয়ে আসে। বলে, মাইজি, আচ্ছা করে তেলমশলা দিয়ে পাকাও তো। ছেলেটা সত্যিই খুব ভাল গো। আমাকে নিজের মায়ের মতো দেখে।

—গুড। ভেরি গুড। চা শেষ করে উঠে পড়লাম। ভাল থেকো। পারলে এবার যেও একদিন। দেখবে, রাজা কেমন তালগাছ হয়ে গেছে।

প্রফুল্লমনে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। যাক, সোমার মুখে ছাই দিয়ে পনেরো হাজার টাকা লাগানো আমার সার্থক হয়েছে। নুনের ব্যবসা করুক, কী চিনির, থিতু হয়ে লালুবাবু কিছু কামাচ্ছেন তো।

অচিরেই ভুল ভাঙল। লক্ষ্মীপূজার পরের দিন কাকভোরে হঠাৎ দাদার আবির্ভাব। উদভ্রান্ত মুখ, উসকোখুসকো চুল, চোখের নীচে গাঢ় কালি।

উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, এ কী রে, কী হয়েছে তোর?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে। লালন সিং গুণ্ডা লাগিয়ে আমায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

—কে লালন সিং?

দু'এক সেকেন্ড থমকে রইল দাদা। তারপর খপ করে আমার হাত চেপে ধরেছে, —রাজু আমায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে রে নীলু। তুই আমায় বাঁচা।

—হাত ছাড়। বোস। কী হয়েছে খুলে বল তো?

আস্তে আস্তে গোটা ঘটনাটাই জানা গেল। নুন, চিনি নয়, মানবসম্পদ নিয়ে কারবার ফেঁদেছিল দাদারা। স্রেফ চিটিংবাজির কেস। রেল, ব্যাঙ্ক কিংবা পোস্ট-অফিসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা টাকা হাপিশ

করছিল রাজু আর লালু। রাজু সিং মোরগা ধরে আনত, আর দাদা ব্যাঙ্ক কিংবা রেলের অফিসার সেজে তাদের জবাই করত। দিব্যি একটা-দুটো ছোটোখাটো কেস এভাবে পার করে দিয়েছে দু'জনে, লালন সিংয়ের বেলায় মোটা দাঁও মারতে গিয়েই যত গড়বড়। লালন সিং কোনও এক সরকারি অফিসের অবসরপ্রাপ্ত দারোয়ান, তার ছেলেকে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেবে বলে তিন দফায় প্রায় দেড় লাখ টাকা খিঁচেছিল, কিন্তু দাদাদের ফেরেববাজিটা সে এখন ধরে ফেলেছে। বিপদ বুঝে রাজু সিং হাওয়া। গাড্ডায় পড়েছে শ্রীমান লালু। কিভাবে যেন লালন সিং দাদার আস্তানার খোঁজ পেয়ে গেছে, কাল সন্ধেবেলা দুটো মস্তান সঙ্গে এনে, কপালে চেম্বার ঠেকিয়ে, দাদাকে নাকি কোনও অন্ধকার ঘুপচিতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মারধর তো করেইছে, সঙ্গে শাসিয়েছে সাতদিনের মধ্যে ওই দেড় লাখ ফেরত না দিলে কেষ্টপুর খালে দাদার লাশ ভাসবে।

আমি বাকরহিত। আক্ষরিক অর্থেই শব্দ ফুটছে না গলায়। ছিঁচকেমি যে দাদা আগেও করেনি, তা নয়। শ্যামবাজারেও বাড়ি বয়ে এসে লোকজন হল্লা করে গেছে। একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আর একজনের লোন শোধ করছে, এবং এই করতে করতেই এক সময়ে ফাঁসকলে আটকে যাচ্ছে—এ তো গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল আমাদের। কিন্তু এবারেরটা তো ধারটারের কেস নয়, পুরোদস্তুর রাহাজানি।

পাথরের মতো খানিকক্ষণ বসে থাকার পর খেঁকিয়ে উঠলাম, তা আমার কাছে এসেছিস কেন? সোজা গিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে আয়।

—দেবো কোত্থেকে? দাদার ঘাড় নেতিয়ে পড়ল, রাজু তো প্রায় সবটাই নিয়ে নিয়েছে। আমি পেয়েছি মাত্র দশ হাজার।

সত্যি বলছে, না মিথ্যে, বোঝা মুশকিল। তবু বললাম, তো সেটা লালন না কে তাকে জানিয়ে দে।

—বলিনি ভাবছিস? অনেকবার বলেছি। পায়ে ধরে বলেছি। মানছে না।

—তোর সেই রাজুর কাছে তবে নিয়ে যা ওদের।

—তাও গেছি। কাল রাতে। রাজু নেই।

—মানে?

—ভেগেছে। ও তো পালিয়ে পালিয়েই থাকে, ওকে আর ধরা যাবে না।

—কেন? পালিয়ে থাকে কেন?

—পুলিশ খুঁজছে। এক জায়গায় বেশিদিন তাই থাকতে পারে না।

—ও। তার মানে সে একটি ঝানু ক্রিমিনাল।...কী কেসে তাকে খুঁজছে পুলিশ? আগেও চিটিংবাজি করেছে বুঝি?

—না। অন্য কেস। দাদা নাক চুলকোচ্ছে। মাথা নামিয়ে বলল, আসানসোলে একটা রেপ করেছিল।

বউদির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভুরু কুঁচকে বললাম, বউদি এসব জানে?

—না। দাদা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, তোর বউদি ওকে নিজের ছেলের মতো দেখে।

—কী আহ্লাদের কথা।...তা এই মহাপুরুষটির সঙ্গে তোর পরিচয় হল কী করে? কোন স্বর্গে?

—তালতলায়। একটা ঠেকে হঠাৎই...

—মালের ঠেক?

আবার জোরে জোরে মাথা নড়ছে।

—বুঝেছি। জুয়ার আড্ডার। তুই এখনও জুয়া খেলছিস? বলেই কেমন একটা ধন্দ জেগেছে। বললাম, রাজুর সঙ্গে তোর কবে আলাপ? আমার কাছ থেকে পনেরো হাজার নিয়ে যাওয়ার পর?

চোখে একবার চোখ রেখেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল দাদা। ব্যাপারটা স্বচ্ছ হল। আমার টাকা জুয়ার বোর্ডেই ঢেলে দিয়েছেন লালবাবু এবং সম্ভবত সেখানেই রাজু নামের ছেলেটা দাদাকে এই দু'নম্বরি ধান্দাটির প্রস্তাব দেয়। দাদার তো চিরদিনই বাঁকা পথটাই বেশি পছন্দ, না খেটে সহজেই কীভাবে অনেক টাকা কামিয়ে ফেলা যায়, তার জন্য ছোঁকছোঁক করছে প্রতিনিয়ত। লালুবাবুর এই প্রবৃত্তিটার সুযোগ নিয়ে রাজু তাকে কবজা করেছিল। চমৎকার মেলবন্ধন!

আমি কিছু বলার আগে এবার সোমা ঝেঁঝে উঠেছে, তোমায়

সত্যি, আচ্ছা বুরবক বনেছি। রুক্ষ স্বরে বললাম, বউদির চূড় জোড়াও কি জুয়ায় গেছে? নাকি ওই পয়সায় অফিসার সাজার স্যুট-টাই কিনেছিস?

—চূড় তো ছিল না। সে তো বহুকাল আগেই...। দাদা মিনমিন করছে, প্যান্ট-শার্ট সব রাজুই কিনে দিয়েছিল।

—আর তুই রাজুর সাজানো ভাঁড় হয়ে...। রাগে আমার কথা আটকে গেল। আগুনের হলকা বইছে মাথায়। গা রি-রি করছে। দাঁতে দাঁত ঘসে বললাম, লালন সিংয়ের হাতে মরাটাই তোর উচিত শাস্তি।

দাদা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎই ডুকরে উঠেছে, কথাটা তুই বলতে পারলি নীলু? মায়ের পেটের ভাই হয়ে?

—চোপ। কোনও চোরচোট্টা-চিটিংবাজ আমার ভাই নয়।

—নীলু...প্লীজ....এবারটা তুই আমায় বাঁচিয়ে দে ভাই। মরা মায়ের দিব্যি করে বলছি, আর কোনও বাজে কাজে থাকব না। এক্কেবারে নতুন করে জীবনটা শুরু করব।

আমি আর থোড়াই গলছি! গর্জে উঠলাম, বেরো। বেরো আমার বাড়ি থেকে। আর কক্ষনও তোর মুখ আমি দেখতে চাই না।

মুখ কিন্তু আবার দেখতেই হল। কিংবা বলা যায়, দেখতে বাধ্য হলাম। কালীপুজোর আগেই।

না, লালন সিংয়ের গুণ্ডার গুলি খেয়ে মরা মুখ নয়, জ্যান্ত মুখ। আদালতের কাঠগোড়ায়।

দাদার কাছ থেকে কোনওভাবেই রাজু সিংয়ের হদিশ না পেয়ে লালন সিং নালিশ ঠুকেছিল থানায়। সেই রাতেই পুলিশ গিয়ে দাদাকে ক্যাঁক্। পরদিনই কোর্টে তোলা হয়, উকিল না দিতে পারায় জামিন পায়নি, ফের চালান হয়েছিল পুলিশের হেফাজতে। তারপরই দেবরের গৃহে বউদির আগমন। হাতে-পায়ে ধরা। কান্নাকাটি। পুলিশ মেরে মেরে সর্বাঙ্গে কালশিটে ফেলে দিয়েছে গো, তুমি যেভাবে পারো ওকে উদ্ধার করে দাও!

অগত্যা নির্বোধ, পতিব্রতার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে দেওরকে মাঠে নামতেই হয়। কিছু না করলে ওই সতীসাধ্বী তো আমার ঘাড়েই চাপবে।

তার চেয়ে বরং খাঁচা থেকে বার করে দিই আপাতত, তোরা থাক যেমন ছিলি। পরে যদি বিচারে জেলটেল হয়, তখন দেখা যাবে।

জামিন করাতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। কিছু গাঁটগচ্চা গেল, ওই যা।

হেমন্তের বিকেল। আলো মরে আসছে। বাতাসে সামান্য শিরশিরে ভাব। লালুবাবুকে নিয়ে হাঁটছিলাম বাস-স্টপের দিকে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলেছে লালুবাবু, পিছিয়ে পড়ছে বারবার।

অপাঙ্গে দাদাকে দেখতে দেখতে বললাম, এই হাজতবাসটা তোর বাকি ছিল, সেটাও হয়ে গেল।

দাদা চুপ।

—খোঁড়াচ্ছিস কেন? খুব ধোলাই খেয়েছিস?

—দুটো হাঁটুতে বড্ড রুলের বাড়ি মেরেছে রে।

বেশ করেছে। বলতে গিয়েও থমকালাম। পঞ্চাশ বছরের একটা দামড়া লোককে এসব আর কী বলব! গম্ভীর গলায় বললাম, চা খাবি?

—খুব খিদেও পেয়েছে রে।

ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে টোস্ট-ওমলেটের অর্ডার দিলাম। চায়েরও। গোগ্রাসে পাঁউরুটি গিলছে দাদা। তুচ্ছ ওমলেট যেন অমৃত।

একটু একটু মায়া লাগছিল দেখে। কী চেহারা হয়েছে ক'দিনে! গাল তুবড়ে লম্বাটে মুখখানা শুকনো আঁটি, কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, কপালে মোটা মোটা বলিরেখা। কুঁজো হয়ে বসে থাকা দেখে মনে হয় যেন সাত বুড়োর এক বুড়ো।

কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, চিতায় ওঠার তো সময় হয়ে এল, এবার অন্তত একটু সিধে রাস্তায় চল্।

দাদার খাওয়া শেষ। একটু যেন উজ্জীবিত দেখাচ্ছে। পেপার ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোকে আর বলতে হবে না রে নীলু। এবার আমি একেবারে নতুন জীবন শুরু করব। পঞ্চাশ বছরেও তো লাইফ স্টার্ট করা যায়, না কী, বল?

—কী করবি?

—যদি কিছু টাকা দিস...বেশি নয়, হাজার পাঁচেক...তাহলে আবার বাড়িটা বদল করে রাজারহাটের দিকেই চলে যাই।

—গিয়ে?

—ওখানে বেশ চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল। দুটো-চারটে টিউশনি করতাম তো, মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই বলে লোকে সম্মানও করত। ওখানে গিয়ে ফের যদি গোটা কয়েক টিউশনি শুরু করি...অনেক বাচ্চা আছে, বুঝলি। মাসে একশো-দেড়শো করেও যদি নিই, আড়াই-তিন হাজার রোজগার করা কোনও ব্যাপারই নয়। তারপর ধর, পৈতেটাও আছে...পুজো-আচ্চা, বিয়ে-অন্নপ্রাশনের কাজও শিখে নিয়ে স্টার্ট করে দেব। তবে ওখানে ফিরতে গেলে ফের অ্যাডভান্স...দিবি টাকাটা?

টের পাচ্ছি, আবার মিথ্যে বলছে লালুবাবু। এও জানি, টাকা ফের অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে যাবে। তবু যে কেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে? নতুন করে?

দাদা ঝুঁকেছে। মোটা মোটা শিরা ওঠা হাত রাখলো আমার হাতে। কাতর গলায় বলল, এই তোকে ছুঁয়ে দিব্যি করছি, এবার ঠিক জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করে ফেলব। শেষ একটা সুযোগ আমায় দে না রে নীলু।

আহাম্মকের মতো বলে ফেললাম, বেশ। দ্যাখ্ চেষ্টা কর। ♣

প্রতিমাদর্শন

ছোট্ট একটা ভাতঘুম দিচ্ছিলাম দুপুরবেলায়। কলিংবেলের তীক্ষ্ণ চিৎকারে তন্দ্রার দফারফা। এই অসময়ে কে এল রে বাবা? সুরভি তো রুটি টুটি করতে আসে পাঁচটা নাগাদ, এখন তো সবে সওয়া তিনটে!

ঝিমঝিম চোখে দরজা খুলেছি, কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটের ওপারে এক মহিলা। বয়স্কা। প্রায় বৃদ্ধাই বলা যায়, বছর ষাটেক তো হবেই। রোগাসোগা ছোটোখাটো চেহারা। পরনে তাঁতের শাড়ি, চোখে গোলাপি সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। সস্তার ভ্যানিটিব্যাগ ঝুলছে কাঁধে। বেচতে এসেছে কিছু? নাকি সাহায্যপ্রার্থী? স্বামীর অসুখ, কিম্বা মেয়ের বিয়ে....!

বেজার গলায় জিজ্ঞেস করলাম,—কী চাই?

হাতজোড় করে নমস্কার করল মহিলা,—আজ্ঞে আমরা নাম প্রতিমা চক্রবর্তী। আমাকে মিতালিদি পাঠিয়েছেন।

—কী ব্যাপারে বলুন তো?

—আপনি নাকি ম্যাসেজ করার লোক খুঁজছেন....

ও হ্যাঁ, মিতালিকে তো বলেছিলাম বটে। হিস্টেরেকটমির পর থেকে

শরীরটা কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে, উপসর্গও দেখা দিয়েছে নানান রকম। গা হাত পা ব্যথা, জয়েন্ট পেন, কোমরে যন্ত্রণা...। তাই একটা ম্যাশিওরের সন্ধানে ছিলাম, নিয়মিত ম্যাসাজ করালে যদি একটু আরাম হয়। মিতালি বেছে বেছে এই বুড়িটাকে পাঠাল?

ভুরু কুঁচকে বললাম,—কে করবে ম্যাসাজ? আপনি?

—হ্যাঁ দিদি। আমি তো এই কাজই করি।

—পারবেন?

—দেখুন না করিয়ে। আমার হাতের খুব সুনাম আছে। একবার যারা করেছে, তারা আর আমায় ছাড়তে চায় না।

তেমন একটা প্রতীতি জন্মাল না। তবে মিতালি পাঠিয়েছে, ফেরানোও তো যায় না, ভদ্রতা করে গেট খুলে দিলাম। বললাম,—আসুন।

বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই ভেতরে ঢুকল মহিলা। সোফায় নয়, বেঁটে টুলটায় বসেছে। পেশাদারি স্বরে জিজ্ঞেস করল,—কী দিয়ে করবেন? পাউডার? না তেল?

ম্যাসাজের আমি কীই বা বুঝি। বললাম,—কোনটা দিয়ে করলে ভাল হয়?

—সেটা আপনার ওপর। যদি শরীরটাকে খেলাতে চান, তাহলে পাউডারই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যথাবেদনা থাকলে তেলেই উপকার বেশি। তেলটা শরীরের ভেতর চলে যায় তো। চামড়াও মোলায়েম থাকে।

—তাহলে তেলই করুন। কোমরটা আমায় খুব ভোগাচ্ছে।

—শুধু কোমর করাবেন?

—না না, গোটা বডি।

—কোমর ছাড়া আর কোথায় কোথায় ব্যথা আছে?

—গাঁটে গাঁটে।....সর্বাঙ্গে।

—দেহে তো দেখছি চর্বিও জমিয়েছেন বেশ। চশমার ফাঁক দিয়ে একটুক্ষণ আমায় নিরীক্ষণ করল প্রতিমা। প্রশ্ন করল,—অস্টোআরথাইটিস আছে? পন্ডেলাইটিস?

মজা লাগল। ভুলভাল উচ্চারণ করলেও অসুখগুলোর নাম জানে তো!

পাল্টা প্রশ্ন হানলাম,—কদ্দিন ধরে করছেন এই সব ম্যাসাজ ট্যাসাজ?

—তা দিদি....হল গিয়ে প্রায় পনেরো ষোলো বছর। ব্যাগটাকে কাঁধ থেকে কোলে নিল প্রতিমা,—ডাক্তার অনিল শিকদারের নাম শুনেছেন? পন্ডিতিয়ায় যাঁর ফিজিওথেরাপির চেম্বার ছিল? উনিই আমায় স্বহস্তে শিখিয়েছিলেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ দিদি। ব্যাগের চেন খুলে ছোট্ট একটা ছবি বার করে দিল প্রতিমা,—এই দেখুন, ইনিই আমার গুরু। আমার ভগবান। এঁর দয়াতেই আপনাদের উপকারে লাগতে পারছি।

পাসপোর্ট সাইজের ফটোখানা হাতে নিয়ে দেখছিলাম। টাকমাথা, গোলগাল মুখ এক মধ্যবয়সির ছবি। গলায় টাই। পুরনো ফটোগ্রাফ তেল টেল মেখে আরও যেন হলদেটে মেরে গেছে।

ছবিটা ফেরত নিয়ে কপালে ঠেকাল প্রতিমা। যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, তিনি তো মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যিই দেবতা। যদ্দিন স্যার বেঁচে ছিলেন, ডেকে ডেকে পেশেন্ট দিয়েছেন আমাকে। কারুর কাছ থেকে একশো নিতাম, কারুর কাছ থেকে দুশো....কেউ দিতে পোতিবাদ করত না। তা বিধাতাঠাকুর তো ভালমানুষদের বেশি দিন পিথিবিতে রাখেন না, তাই হয়তো কাছে টেনে নিলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষ চেম্বার থেকে বাড়ি গেল, তারই কিনা রাত্তিরে সেরিব্বাল! ডাক্তারকে ফোন করারও সুযোগ দেয় নি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ। কী বলব দিদি, সে কথা ভাবলে আমার.....

সর্বনাশ, এখন গুরুকীর্তন চলবে নাকি? থামালাম তাড়াতাড়ি। বললাম,—চলুন, শুরু করা যাক।

—হ্যাঁ, চলুন। আপনার তেল আছে তো?

—আছে।

আমার সঙ্গে শোওয়ার ঘরে এল প্রতিমা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং নিতে থিরুবনন্তপুরম গিয়েছিল বুল্টু, সেখান থেকে একটা আয়ুর্বেদিক তেল এনেছিল আমার জন্যে। মালিশের। সিল্টা পর্যন্ত খোলা হয় নি, বোতলটা বের করে দিলাম প্রতিমাকে। উৎকট গন্ধ, তবে শোঁকার ধরণ দেখে

মনে হল বেশ পছন্দই হয়েছে প্রতিমার। আমাকে শুতে বলে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে গুটিয়ে মুটিয়ে রাখা তেল চিটচিটে নাইলনের শাড়ি বার করল একখানা। তাঁত শাড়ি খুলে সযত্নে পাট করে পরে নিল নাইলন শাড়ি। শুরু হল কাজ।

নাহ্, মহিলা মালিশটা ভালই জানে। অনর্থক চাপ দিচ্ছে না, দলাইমালাই করছে না, স্নায়ু বুঝে বুঝে, শিরা ধরে ধরে চমৎকার টান দিচ্ছে। নিপুণ অঙ্গুলিচালনার দৌলতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সত্যিই ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর।

ঠিক করে ফেললাম প্রতিমাকে দিয়েই মালিশ করাব নিয়মিত। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন।

মাসখানেকের মধ্যে হাতেনাতে ফল পেতে লাগলাম মালিশের। গা কোমরের ব্যথা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে, দিব্যি ঝরঝরে লাগে সারা দিন। পেটে হাত বুলিয়ে মনে হয় মেদও যেন ঝরছে খানিকটা। ফ্ল্যাটবাড়ির একতলা তিনতলা করতে এখন আর অসুবিধে হয় না তেমন, হাঁপাই না আগের মতন। প্রতিমা আমায় কয়েকটা ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিয়েছে, সেগুলোও করছি রোজ।

প্রতিমাকে নিয়ে একটাই যা সমস্যা। বড্ড বেশি কথা বলে প্রতিমা। বকে বকে কানের পোকা বের করে দেয়। একদিকে আঙুল চলছে, অন্যদিকে মুখ।

—বুঝলে দিদি, গোবিন্দের বাপের খুব বড় কারবার ছিল। ধূপকাঠির। কারখানা তত বড় নয়, তবে লোক খাটত। চন্দন মোগরা গোলাপ, কত গন্ধের ধূপ যে বানাত গোবিন্দর বাপ। শহরে বেচত না। বলত, শহরের জন্য তো বড় বড় কোম্পানি আছে, আমি সুবাস বিলোবো গাঁয়েগঞ্জে। তা সে ধূপ চলতও বটে। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না গো দিদি, গোস্ গোস্ মাল উঠে যেত। মহাজন এসে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকত দোরগোড়ায়। তখন আমার গায়ে গয়না উঠেছে, দামি দামি শাড়ি হয়েছে...

সারা অঙ্গে মালিশের সুখ নিতে নিতে আমি হয়তো একটা বেফাঁস প্রশ্ন করে বসলাম,—তা সে ব্যবসার হাল খারাপ হল কেন?

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে কথা লুফে নিয়েছে প্রতিমা,—কপাল গো দিদি, কপাল। যে মহাজনদের পেট পালার ব্যবস্থা করে দিল আমার স্বামী, তারাই ঠকাতে শুরু করল ভালমানুষটাকে। মাল নিয়ে টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না, শুধু ঘোরায়। সেও সাদা মনের মানুষ, গিয়ে জোরাজুরি করতে পারে না। দেখতে দেখতে তরণী ডুবল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিল এক কর্মচারী। গোবিন্দর বাপ তাকে ছেলের মতো দেখত। সেই কিনা পেটি পেটি মাল চুরি করে হাওয়া। মানুষটার মনের অবস্থা যে তখন কী! শোকে তাপে রোগে পড়ে গেল। ছ ছমাস বিছানায় শয্যাশায়ী। এদিকে ঘরে তখন আমার তিন তিনটে কচি ছেলে, গোবিন্দর তখনও গোঁফের রেখা ওঠে নি....তাদের মুখে অন্ন জোগাতে আমাকেই তখন নামতে হল আয়ার কাজে। পেট কি লজ্জা ঘেন্না মানবে, বলো দিদি? অথ্‌থোপেটিক হসপিটালে চাকরি নিলাম.....দিনের পর দিন নাইট ডিউটি। বামুনের ঘরের মেয়ে হয়ে অজাত কুজাতের গু মুত ঘাঁটছি, তাদের সেবা করছি.....। ঘরে ফিরলে গোবিন্দর বাপ তো হাউমাউ কান্না জুড়ত, তোমার কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারি না মণি।....হ্যাঁ গো দিদি, সে আমায় মণি বলে ডাকে। আমার ডাকনাম তো বুঁচি, ও নাম তার পছন্দ নয়।....তা আমি তখন বলেছি, মন খারাপ কোরো না গো, জীবনে তো জোয়ার ভাঁটা আছেই। জোয়ারে টাকা এসেছিল, ভাঁটির টানে চলে গেছে। কিন্তু তলার মাটিটুকু তো আছে। আর তোমার সেই মাটি তো আমিই, নয় কি? আত্মীয় বন্ধুরা পাশে নেই বলেও দুঃখ কোরো না গো, জানলা খোলা পেলে সুখের পাখিরা সব উড়ে যায়।....ঠিক বলিনি, বলো দিদি?

আমার মতামতের অবশ্য ধার ধারে না প্রতিমাঠাকরুন। মালাইচাকিতে কায়দা করে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে বলে চলে,—গোবিন্দর বাপের ধাতটা কিন্তু একদমই আলাদা গো দিদি। অন্য মানুষ হলে অত বড় ব্যাম্মোর পর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। সে কিন্তু দেখিয়ে দিল। শরীরে একটু বল ফিরে পেতেই ধারকর্জ করে খুলল একটা রোলের দোকান। ময়েম দিয়ে কী সুন্দর পরোটা বানাত গো! আমার স্বামীর হাতের শিক্‌কাবাব যে খেয়েছে, সে মিত্যু অব্দি ভুলবে না। কোথ্‌থেকে যে শিখে ফেলল ওসব! .....ভাল জিনিসের তো মার নেই, কটা মাস যেতে না যেতে জমে গেল

দোকান। খদ্দেররা দাঁড়িয়ে থাকে লাইন দিয়ে। কিন্তু ওই যে বললাম.... কপাল! সাদা মনের মানুষের পায়ে পায়ে বিপদ!....পাশের রোলের দোকানখানা ফেল পড়ার উপোক্কম হয়েছিল। সেই লোকটা পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল গো। কয়েকটা মোদো মাতালকে লেলিয়ে দিলো একদিন, তারা হল্লাগুল্লা করে ভেঙে দিয়ে গেল গোবিন্দের বাপের দোকান। আবার নৌকোডুবি।....তাতেও মানুষটা নুয়ে পড়েনি, এখন পুরি তরকারি বানিয়ে এক ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে বসে বেচে। খুব বিক্রি, বাবুরা সব চেটেপুটে খায়। ও অবশ্যি খুব একটা মাল বানায় নাকো। ওই এক ডেক্‌চি শবজি, আশি একশোটা পুরি, ব্যস। বলে, এতেই তো আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে, লাভ বাড়িয়ে ফের কেন মানুষের বুকে হিংসে ডেকে আনি মণি!....শুনছ গো, ও দিদি? নাকি ঘুমিয়ে পড়লে?

মাথা খারাপ! ওই ধারাবাহিক কাহিনির স্রোতে ঘুমোনোর জো আছে? তার ওপর সে কাহিনি যদি হয় গোবিন্দর বাপের মতো এক লড়াকু মানুষের! যে কখনও হারতে শেখেনি!

শুধু স্বামীই নয়, পরিবারের অন্য সদস্যদের গল্প শোনাতেও ছাড়ে না প্রতিমা। ছেলেদের গল্প বলতে গিয়ে তো বিহ্বল হয়ে পড়ে আবেগে।....কী বলব গো দিদি, জননী হয়ে বড় মুখ করে বলতে নেই, আমার তিন ছেলেই মা মা করে আকুপাকু করে সারাক্ষণ। এখনও। জানো তো, গোবিন্দর লেখাপড়ায় খুব মাথা ছিল, ইচ্ছে করলেই তিন চারটে পাশ দিতে পারত। শুধু মায়ের খাটুনি চোখে দেখতে পারে না বলে জল ঢেলে দিল পড়াশুনায়। বলল, এবিসিডি অআকখ তো শিখে গেছি মা, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও করতে পারি, তার বেশি দিগ্‌গজ হয়ে আমার কী হবে! তার চেয়ে দুটো রোজগার করে যদি তোমার হাতে দিতে পারি....। পনেরো পুরতে না পুরতে ছেলে আমার নামল পাঁপড়ের ব্যবসায়। বড়বাজার থেকে কাঁচা পাঁপড় কিনে এনে বালিগঞ্জ স্টেশনে বসে ভাজত আর বেচত। রমরমিয়ে চলত গো দিদি, ওই বয়সে দিনে বিশ টাকা তিরিশ টাকা করে কামাত রোজ। তা সে ব্যবসা অবশ্যি চালাল না শেষ পর্যন্ত। বাবার হাল দেখে দেখে হিদয়ে ঘেন্না ধরে গেছিল। বলত, ব্যবসা নাকি আমাদের চক্কোত্তি বংশের কপালে নেই। তার

চেয়ে পুরুতগিরির লাইনটাই ধরি না কেন মা! নিজের কাকা বেহালায় পুরুতগিরি করে, তার সঙ্গে লেগে থেকে শিখে নিল পুজো-আচ্চার কাজ। বিয়ে শ্রাদ্য অন্নপাশন তো আছেই, এ ছাড়া দুগ্গোপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো, শনি সত্যনারায়ণ, কিছু না কিছু তো লেগেই থাকে বারো মাসে। চালটা, ফলটা, মিষ্টিটাও নিত্যদিন আসে ঘরে। এই তো গত শ্রাবণের আগের শ্রাবণে বিয়ে দিলাম ছেলের। ব্যানার্জি ঘরের মেয়ে। আমার বাপের বাড়িও ব্যানার্জি কিনা, তাই বেছে বেছে শান্ডিল্য মেয়েই আনলাম। ঠকিনি গো দিদি, বউ আমার মতোই খাটিয়ে। এই যে আমি বেরিয়ে এসেছি কাজে, বউ আমার রেঁধেবেড়ে থালা সাজিয়ে বসে থাকবে। গেলেই বলবে, মা মাগো, তুমি আগে চাট্টি মুখে দাও, তারপর অন্য কথা। গোবিন্দর বাপ তো মা লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান। বলে, ভাল ছেলে গভ্ভেই আসে মণি, ভাল বউ আসে ভাগ্যে। দেওর দুটোকেও বউমা একেবারে যাদু করে রেখেছে। আমার গোপাল নিতাই মাকে যদি ষোলো আনা মানে, তো বউদিকে আট আনা। না, না, বারো আনা।

এরপর গোপাল নিতাই-এর উপাখ্যান বিস্তারিত হতে থাকে ক্রমশ। গোপাল মায়ের ভক্ত, এত ধাড়ি ছেলে এখনও কেমন মায়ের কোল ঘেঁসে বসে....! পিজবোর্ড কারখানায় ম্যানেজারি করছে গোপাল, মাইনে পেয়ে পাইপয়সা পর্যন্ত গুণেগেঁথে তুলে দেয় প্রতিমার হাতে। যে কটা টাকা হাতখরচা দেয় মা, ছেলে তাতেই খুশি। জানে তো কী জন্য মা টাকা সরিয়ে রাখছে! বিয়ে দিতে হবে ছেলের, একফালি জমি কিনতে হবে।....আর মেজর টাকায় যদি জমি হয়, তা ছোট দেবে বাড়ি তোলার খরচ। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ট্যাক্সি কিনেছে নিতাই, গাড়ি খাটিয়ে সেও এখন রোজগারপাতি মন্দ করছে না। তিন ছেলেই রোজ কোরাসে বায়না জোড়ে, আমাদের মানুষ করতে গিয়ে তুমি তো অনেক মুখে রক্ত তুললে মা, এবার জিরোও। বুড়ো বয়সে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে টুকুন সুখ করো। কিন্তু চাইলেই কি প্রতিমা তা পারে আর? তার গুরু যে মরার আগে পইপই করে বলে গেছে, যতদিন না গতরে জং ধরে, শেখা বিদ্যাটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সেবা কোরো প্রতিমা। জেনো তাহলেই তোমার অক্ষয় স্বর্গ বাঁধা।

প্রথম প্রথম প্রতিমার জীবনচরিত শুনতে মজাই লাগত আমার। কিন্তু এক কথা কাঁহাতক ভাল লাগে? তবু প্রতিমা শোনাবেই। নিজের সুখের গল্প শোনানো যেন প্রতিমার কাছে একটা নেশা। অনেকটা ম্যাসাজ নিয়ে আরাম পাওয়ার মতো।

এর মধ্যে বুল্টু এল হোস্টেল থেকে। সেমিস্টার পরীক্ষা হয়ে গেছে, ছুটি মিলেছে দিন চারেকের। দুপুরে প্রতিমা দর্শন করেই সে আমার পিছনে লেগে গেল,—কী মা, শেষে একটা কেঠো বুড়িকে দিয়ে বডি ম্যাসাজ করাচ্ছ?

ভাস্কর ছেলেকে আরও উসকে দিল—ওই বুড়ি তোর মাকে তো মেসমরাইজ করে রেখেছে রে।

—তাই নাকি?

—তাহলে আর বলছি কী। মালিশের সঙ্গে বুড়ি ফ্রিতে একটা মেগা সিরিয়ালও দিচ্ছে।

—শুধু মেগা নয়, বলো মেগার মেগা। আমিও হেসে ফেললাম,—মেগাতেও গল্প অত আটকে থাকে না। এক আধটা অন্তত বাইরের সিন ঢুকে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ। কিন্তু প্রতিমা দেবীর স্টোরির নো নড়ন চড়ন। নিজের স্বামী, নিজের ছেলে, নিজের ঘরসংসারের পাস্ট আছে, প্রেজেন্ট আছে, ফ্লাশব্যাক আছে.....।

—চার্জ কত নিচ্ছে? বুল্টু চোখ নাচাল।

—প্রথম এক দু'দিন সত্তর করে দিয়েছিলাম। এখন পার সিটিং ষাট। ...সবই ঠিক আছে, শুধু বুড়ি যদি একটু বকবকটা কম করত।

—না শুনলেই পারো। কানে তুলো গুঁজে রেখো।

বাহ্, বুদ্ধিটা তো মন্দ নয়। কানে তুলো দিয়ে দিব্যি তো ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারি। বুড়িও রেকর্ড চালু রাখুক, আমিও স্বস্তি পাই।

পুজোতে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। পাহাড়ে। দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং। প্রতিমারও ছুটি ছিল কদিন। লক্ষ্মীপুজোর পরের সপ্তাহ থেকে আসার কথা ছিল ফের। কালীপুজো পেরিয়ে গেল, ভাইফোঁটা গেল, তবু তার দর্শন নেই।

একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। অসুখ বিসুখ করল নাকি? বুড়ি তো কামাই করে না বড় একটা! এ বছর পুজো দেরিতে ছিল, ঠাণ্ডা পড়ে গেছে অল্প অল্প, চামড়াতে টান ধরছে, শরীরেও একটা ম্যাজম্যাজ ভাব, এই সময়েই ডুব মারল প্রতিমা?

আরও দু'একদিন দেখে মিতালিকে ফোন করলাম,—অ্যাই, কী হয়েছে রে বুড়ির? আমার বাড়িতে আসছে না যে বড়?

মিতালিকেও খানিক ভাবিত মনে হল,—জানি না রে। এখানেও তো দেখা নেই।

—খোঁজ নিয়েছিস?

—কাকে দিয়ে খোঁজ নেব? ওকে তো জুটিয়ে দিয়েছিল আমার রান্নার মেয়েটা। সে তো পুজোর শাড়ি নিয়েই ধাঁ।

—মহা ফ্যাসাদ হল! বুড়ি যেন কসবার কোথায় থাকে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রথতলায়। তোর বাড়ির কাছেই। সুদক্ষিণা নামে একটা হাউজিং কমপ্লেক্স আছে, তার পেছনটায়।....খুঁজতে যাবি নাকি ওকে?

—ভাবছি।....দেখি আর দু একদিন।

—খোঁজ পেলে আমায় একটা রিং করিস। বলিস, আমিও কিন্তু ওর ওপর খুব চটে আছি। এরকম করলে ভবিষ্যতে আর কোনও নতুন ক্লায়েন্ট দেব না।

দু তিন দিন নয়, আরও একটা সপ্তাহ প্রতীক্ষা করলাম প্রতিমার। উহুঁ, টিকিটির দেখা নেই।

খানিকটা দোনামোনা করে বেরিয়েই পড়লাম এক বিকেলে। রিক্সা নিয়ে রথতলা। সুদক্ষিণা চেনাই ছিল, খুঁজে খুঁজে বার করে ফেলেছি প্রতিমা দেবীর ডেরা। মালিশের কাজ করে বলেই বোধহয় পাড়ার লোক চেনে প্রতিমাকে, দেখিয়ে দিল এক কথায়।

বারো ঘর এক উঠোনের বাড়ি। টানা লম্বা বারান্দায় সার সার ঘর। মাথায় কালচে টিনের চাল, দেওয়াল টেয়ালগুলো মোটেই পদের নয়, সর্বাঙ্গে কেমন একটা বস্তি বস্তি ভাব। একপাল বাচ্চা খেলছে উঠোনে, জোর ক্যালর ব্যালর চলছে। বারান্দাতেও বিচ্ছিরি হল্লাগুল্লা। এক মাঝবয়সি মহিলা

অশ্লীলতম ভাষায় গাল পাড়ছে কোনও এক অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে, তাকে ঘিরে মজা দেখছে জনা পাঁচ সাত মেয়ে বউ।

থতমত খেয়ে গেলাম। এমন একটা পরিবেশে থাকে প্রতিমা? কথাবার্তা শুনে তো অন্য রকমটাই মনে হয়েছিল।

আমায় উঠোনে দেখে চিৎকার থমকেছে হঠাৎ। খিস্তির ফোয়ারা ছোটানো মধ্যবয়সি বউটাই এগিয়ে এল,—কাকে চাই?

আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম,—প্রতিমা.... চক্রবর্তী এখানে থাকে?

—পতিমা? চোখ পিটপিট করল মহিলা,—মালিশদিদি?....সে তো এখন নেই। হাসপাতালে।

—কেন? কী হয়েছে তার?

—ওর আবার কী হবে, মরতে বসেছে তো ওর বেআক্কেলে বর। আর ওই লোকের জন্য মালিশদিদি হাসপাতালে হত্যে দিয়ে আছে।

—ওমা, সেকী? প্রতিমাদির স্বামী বুঝি খুব অসুস্থ?

—ডেঁকে আনা অসুখ। মদ খেয়ে খেয়ে লিবার একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে গা। পুজোর সময় থেকেই বাড়াবাড়ি চলছিল, তাও ঘরে রেখেই চিকিচ্ছে করছিল মালিশদিদি। গতিক সুবিধের নয় দেখে কালীপুজোর আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি করল। এখনও যমে মানুষে টানাটানি চলছে।

আমি হতবাক। আরও কয়েকটা বউ ঘিরে ফেলেছে আমাকে। নানান বয়সের। ঘুরে ঘুরে দেখছি তাদের।

অল্পবয়সি একটি বউ বলে উঠল,—ঠিক হয়েছে। বুড়োর উচিত শাস্তি হয়েছে। বামুন হয়ে চাঁড়ালদের মতো চুল্লু গিলবে...ধম্মে সইবে কেন? বুড়ো এখন ভালয় ভালয় মরলে হয়, মাসি ওই মড়াখেকোর হাত থেকে বাঁচে। এই বয়সেও একগলা গিলে এসে কী মারটাই না মারে প্রতিমাকে। বউ সারাজীবন খেটেখুটে এনে খাওয়াল, আর উনি তারই বুকে বসে ফুর্তি করে গেলেন!

অস্ফুটে বললাম,—উনি কী সব করতেন না? কী সব পুরি টুরি বেচতেন....?

—ঘোড়ার মাথা। বেচত ঘুগনি। তাও ওই মাসিই কাজে বেরোনোর

আগে বানিয়ে দিয়ে যেত। আর হাঁড়িভর্তি ঘুগনির টাকা উনি চুল্লুর ঠেকে উপুড় করে আসতেন। পাজির পা ঝাড়া আর কাকে বলে!

—যা বলেছ। সারাটা জীবন পোতিমাদিদিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিলে গো লোকটা। ধূপের কারখানায় লেবার খাটত, চুরি করে ধরা পড়ে চাকরি খোওয়াল। পোতিমাদিদি ধরে করে হালতুমোড়ে রোল মোগলাই-এর দোকানে কাজ জুটিয়ে দিল, চুল্লু গিলে নিজের মালিকের দোকানই ভাঙচুর করল শয়তানটা। ভাগ্যিস পোতিমাদিদি মালিশটা জানত, তাই বুড়োও জীবনে তরে গেল।

—মালিশের কাজ তো হালে শিখেছে পোতিমাদিদি। দশ পনেরো বছর হবে। আগে আয়ার কাজে কী খাটনিটাই না যেত দিদির। দেখেছি তো, দিনের পর দিন ডবল ডিউটি করছে, রাতের পর রাত বাড়ি ফিরতে পারে না....। ধুঁকছে। ঘরের অতগুলো প্রাণীর মুখে একা অন্ন জোগানো.....

—তা ছেলে তিনটেও তো কম বেইমান নয়। যে মা অত কষ্ট করে বড় করল, তার মুখেও কেমন লাথি মেরে দিল। ডানা গজাতে না গজাতে যে যার মতো উড়েছে বাবুরা।

কী কাণ্ড, এদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না আমি! মস্তিষ্কে গেঁথে যাওয়া ছবিটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বললাম, —ছেলেরা মায়ের সঙ্গে থাকে না?

—দূর দূর, যত্ত সব কুলাঙ্গার। মা ইস্কুলে ভর্তি করে দিল, যে যার মতো পড়া ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় খেলে বেড়াচ্ছে। গোবিন্দটা তো মার আঁচল থেকে পয়সা মেরে সিনেমাহলে লাইন লাগাত, ন্যাড়ার বাবা কত দিন স্বচক্ষে দেখেছে। শেষে মা শিবমন্দিরের ঠাকুরমশায়ের কাছে পাঠিয়ে পুরুতগিরি শিখিয়ে....

—ওই বড়টাই সবচেয়ে বজ্জাত। হাড়হারামি। ভাব করে এমন একখানা বউ আনল....উঠতে বসতে ওই ঠাণ্ডা শাশুড়ির গালে ঠোনা মারে! খেতে দিয়েও ভাতের থালা মুখের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেত। আমরা আশপাশে না থাকলে ওই বউ-এর হাতেও পিটান খাওয়া কপালে লেখা ছিল পোতিমাদির। গোবিন্দটা বউ নিয়ে ভেন্ন হতে বেচারি প্রাণে বেঁচেছে। স্বামীর

হাতের দু চার ঘা তাও সহ্য হয়, ছেলের বউ যদি....

—বাকি ব্যাটাদুটোও কি এমন দেব্‌তা দিদি? এ বলে আমার দ্যাখ, ও বলে আমায়। এ পাতা খেয়ে পড়ে থাকে, তো ও সাট্টা খেলে পয়সা ওড়ায়। দ্যাখো না, গোপালের বাক্স কারখানার চাকরিটা এবার গেল বলে! কোন মালিক পয়সা দিয়ে পাতাখোর পুষবে?

—ছোটটার তবু মায়া দয়া আছে মনে। ট্যাস্‌কি চালিয়ে যা পায়, তার থেকে দু চার পয়সা তাও ঠেকায় মাকে।

—তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেরও করে নেয় গো। এই তো সেদিন.... বাপের অসুখে মার কী জেরবার দশা....তার মধ্যে টাকা চেয়ে পায়নি বলে মা'র হাত মুচড়ে ধরেছিল নিতাই। ভাবো, কী পাষণ্ড সন্তান!

নাহ্, এবার ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করেছে কান মাথা। কখন যে সরে এসেছি জটলা থেকে, রিক্সায় উঠে বসেছি, ফিরে এসেছি বাড়ি, নিজেও যেন জানি না। ঘোর ঘোর লাগছিল। কী নিপুণ অভিনয় করতে পারে প্রতিমা! কেমন চমৎকার গুছিয়ে একই মিথ্যে বলে যেতে পারে দিনের পর দিন।

দৈন্য ঢাকতে চায়? লুকিয়ে রাখতে চায় নিজের অসহায়তা?

কিন্তু কেন? সত্যি বললেই তো বরং মায়া বেশি বাড়ে মানুষের! আশ্চর্য মহিলা তো!

প্রতিমা এল প্রায় মাস দেড়েক পর।

শীতের দুপুরে দিব্যি কম্বলে ঢুকেছিলাম, কলিংবেলের আওয়াজে উষ্ণ আমেজটুকু খানখান।

প্রতিমাকে দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠেছে বুকটা। আরও শীর্ণ হয়ে গেছে প্রতিমা, আরও বুড়িয়েছে, তবে সে কারণে নয়। সাদা খোলের শাড়ি পরে আছে প্রতিমা, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুরটা নেই।

কিছু বলার আগে প্রতিমারই স্বর বেজে উঠল। ঠোঁটে এক চিলতে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলল,—উনি হঠাৎ চলে গেলেন গো দিদি।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ গো দিদি। ঘরে ঢুকে বেঁটে টুলটায় বসল প্রতিমা। ছোট্ট শ্বাস

ফেলে বলল,—পুজোর সময় উনি বললেন, তোমায় নিয়ে কখনও তো কোনো তীর্থে যাই নি মণি, চলো দুজনে একবার কেদার-বদরি ঘুরে আসি। ছেলেরাও বলল, যাও না মা, তুমি তো চিরকাল ঘরেই বন্দি হয়ে রইলে, স্বচক্ষে একবার বরফে ঢাকা পাহাড় দেখে এসো।

ফের বলে ফেললাম,—তারপর?

—সক্কলের পীড়াপীড়িতে না করতে পারলাম না। বউমা নিজের হাতে বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে দিল, খাবার ভরে দিল টিফিনকেরিয়ারে....আমরাও বুড়োবুড়ি চড়ে বসলাম হরিদ্বারের গাড়িতে। সে যে কত দূর, কত দূর....রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। পথের দুধারে কী শোভা! পাহাড় জঙ্গল নদী....নয়ন যেন জুড়িয়ে গেল। তা হরিদ্বারে পৌঁছেও দিব্যি ছিল গোবিন্দর বাপ। দুজনে গঙ্গায় স্নান করলাম, মন্দিরে পুজো দিলাম, সন্ধ্যারতি দেখলাম, প্রদীপ ভাসালাম....। তারপর বাসে করে চললাম বদরিনাথের পথে। চারদিকে পাহাড় পাহাড়....বরফ বরফ বরফ....মনে হচ্ছে দুজনে পাশাপাশি স্বর্গের পথে চলেছি। যেতে যেতে....যেতে যেতে....কী যেন জায়গাটার নাম....হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবপ্রয়াগ....কী যেন একটা নদী আছে সেখানে....হ্যাঁ হ্যাঁ, অলকানন্দা.... স্বর্গের নদী....। শীতল ধারার পাশে দুজনে মুখোমুখি বসেছি....হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠল গোবিন্দর বাপের। একবার শুধু আহ্ করলে, পরক্ষণে আমার কোলে মাথা রেখে শেষ। পুণ্যবান মানুষ তো, যাওয়ার আগে এতটুকু কষ্ট পেলেন না। ওই অলকানন্দার পাড়েই ওনাকে....। ছেলেরা তো ফেরার পর থেকে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি কত করে বলছি, ওরে তোদের বাবার বড় সাধ ছিল দেবস্থানে দেহ রাখবে....। ....এভাবে স্বপ্নপূরণ হওয়ার সৌভাগ্য কি বেশি লোকের হয়....বলো দিদি?

আমার আর স্বর ফুটছিল না। কীসের যেন ডেলা আটকে গেছে গলায়। মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, মোটেই অভিনয় করছে না প্রতিমা। করেও নি কোনও দিন।

শব্দমুক্তোয় স্বপ্নের মালা গাঁথছে প্রতিমা। হ্যাঁ, স্বপ্ন। যে স্বপ্নগুলোকে নিয়ে প্রতিমারা বেঁচে থাকে আজীবন। ♣

অব্যক্ত

শ্যামলীর আহ্লাদ যেন আর ধরছে না। সদ্য ফিরেছেন ছেলের সংসার থেকে, ননদ নন্দাইকে আমেরিকাবাসের বৃত্তান্ত শোনাচ্ছেন। সবিস্তারে। কত গল্প, কত গল্প। গত জুনে মেয়ে হয়েছে বাবলুর, এগারো মাসের পুঁচকিটা নাকি থুপথুপ হাঁটে এখন। আধো আধো বুলিও ফুটেছে ঠোঁটে, শ্যামলীকে সে থামু বলে ডাকে। আহা, বেচারাকে নাকি এখনও চব্বিশ ঘণ্টা ডায়াপার পরে থাকতে হয়। উপায়ই বা কী, পুরু কার্পেটমোড়া মেঝেতে পটি শুশু করলেও তো সর্বনাশ। সাত বছরের নাতিটা অবশ্য এখন অনেক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাও। নিজের মনে গেম্‌স খেলছে, স্কুলে যাচ্ছে, লেখাপড়া করছে, টিভি দেখছে। তবে শ্যামলীর ভারী ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল টিটো, রাত্তিরবেলা পা টিপে টিপে এসে আম্মার কম্বলে সুড়ুৎ সেঁধিয়ে যেত। বাবলুর নতুন বাড়িখানাও নাকি চমৎকার। সামনে কতটা লন, রাস্তা ঘরে পাক খেয়ে উঠে এসেছে ড্রাইভওয়ে, পিছনে বড় বড় কিচেনগার্ডেন....। বাগানে টম্যাটো, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, বেগুন, বাঁধাকপি, কীই না এবার ফলিয়েছিলেন শ্যামলী। বাবলু বিশাখার তো সব দিকে

তাকানোর ফুরসৎই হয় না, সাড়ে আটটা বাজলেই কর্তা গিন্নি দুজনে দুখানা ঢাউস গাড়ি নিয়ে ধাঁ। উইকএন্ডে হয়তো বাবলু একটু মোয়ার চালিয়ে লনের ঘাস ছাঁটল, বিশাখা ঘরদোর ঝাড়াঝুড়ি করল, কি রান্নাটান্না, ব্যস। ছুটি পেলে বন্ধুবান্ধব পার্টি আউটিং, শপিং সব নিয়েও তো ব্যস্ত থাকতে হয়, না কী? তবে হ্যাঁ, শ্যামলীর আদরযত্নে বাবলু বিপাশা খামতি রাখেনি কোনও। সুযোগ সুবিধে মতো ঘুরিয়েছে এদিন ওদিক, মায়ের খাওয়া দাওয়ার দিকে কড়া নজর রেখেছে। শ্যামলীরও হুশ হুশ করে কেটেছে দিনগুলো। মিঠাইকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন....। ফাঁকে ফাঁকে এটা সেটা বানানো, বাবলুর প্রিয় পিঠেপায়েস, বিশাখার জন্য লাউ-এর কোপ্তা, টিটোর জন্য পুডিং....। নির্জন দুপুরে আমেরিকান চড়ুই-বাবুইরা বড় হানা দিত বাগানে, নাতনি কোলে দুপুরভর তাদের তাড়িয়ে বেড়াতেন শ্যামলী।

টিটো মিঠাই বাবলু বিশাখার গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে বাবলুদের গণ্ড শহরটাও। রাস্তাঘাট কত চওড়া চওড়া, বাতাস কী নির্মল, কী অপরূপ ছবির মতো বাড়িঘর, আকাশে কেমন ঘুড়ির মতো এরোপ্লেন ওড়ে, শহর জুড়ে কতশত ঝলমলে দোকানবাজার....। সব পেয়েছির দেশে দুধ মাখনেরও কী সোয়াদ, এখনও যেন শ্যামলীর জিভে লেগে আছে।

অর্চনা জিজ্ঞেস করলেন,—এবার তাহলে মোট কতদিন থেকে এলে বউদি?

শ্যামলী কড় গুণলেন,—তা ধরো প্রায় চোদ্দো মাস। ভেবেছিলাম মিঠাই-এর প্রথম জন্মদিনটা দেখেই আসব। কপাল খারাপ, ভিসার মেয়াদ আর বাড়ানো গেল না।

—তো কী আছে! পরিমল মাথা দোলালেন,—বাবলুরা তো গ্রিনকার্ড পেয়েই গেছে, আবার না হয় এক দু বছর পরে....

এতক্ষণে একটু বুঝি ম্রিয়মান দেখাল শ্যামলীকে। দু দুটো হয়ে গেছে, বাবলু বিশাখা আর কি বাচ্চা চাইবে? মনে হয় না। ♣

বাড়ি

সেদিন অফিস-ফেরতা মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যেমন যাই, হপ্তায় এক-দু'বার। বাইরের ঘরে পাতা আদ্যিকালের সোফাটায় সবে বসেছি, নজরে পড়ল মাতৃদেবীর মুখখানি একেবারে তেলো হাঁড়ি। ঠোঁটে কুলুপ, ভুরুতে মোটা মোটা ভাঁজ। অন্যদিন তো চৌকাঠ পেরোনো মাত্র মা কলকল করে ওঠে, আজ হলটা কী!

চোখের ইশারায় প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কেসটা কী রে? শাশুড়ির সঙ্গে ফের লাঠালাঠি?

প্রতিমা হেসে ফেলল,—না গো দিদি। আজ বাংলা-বিহার নয়। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান।

—মানে?

—দুপুরে আজ কালবৈশাখী হল না...তখন ঝড়ে-পড়া কয়েকটা আম কুড়িয়েছিল মা। আমাদেরই এলাকা থেকে। দোতলার ওরা দেখতে পেয়েই ব্যস্। চিৎকার হল্লা গালিগালাজ।

মেজাজটা টকে গেল। ওফ্, সেই অনন্ত অশান্তি! প্রায় তিন যুগ আগে সূচনা হয়েছিল বিবাদের, বাড়িওয়ালা উচ্ছেদের মামলা করেছিল বাবার নামে।

—তা, ডালপালাগুলো ও দিকে সরিয়ে নিয়ে যাক। সে লক্ষ্মীছাড়ারা এ দিক পানে ধেয়ে আসে কেন? আমাদের এ দিকে আম পড়লেও ওদের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে হবে এমন কোনও লেখাজোকা আছে নাকি?

—ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না। বাড়িতে কি আম কম আসে? রোজই তো বাজার থেকে...

—বাজারের আম, বাজারের আম। বাড়ির আম, বাড়ির আম। দুটোর স্বাদ কি এক হয়?

—তা হলে আর মুখ ভেটকে বসে আছ কেন? খিস্তি খেউড়গুলোও হজম করে নাও।

—নিচ্ছি তো। কাউকে কি শোনাতে গেছি? তুই-ই তো গায়ে পড়ে...

এই হল আমার মা। কোনও যুক্তির ধার ধারে না। যারা কুচ্ছিত ভাষায় অপমান করে তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে যেচে যেচে। গালাগালির মূল হোতা মন্টুদার বউটা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করো, ওমনি মা ঝামরে উঠবে—আহা রে, কচি বয়সে স্বামী হারিয়েছে, শোকাতাপা মেয়েটার কথা গায়ে মাখতে আছে! বলতে বলতে আঁচলে চোখও মুছে নেবে টুক করে। আর দোতলার কোনও সুসংবাদে? মা তো একেবারে আহ্লাদে গদগদ। শুনেছিস ঋতু, ঝন্টুর একটা কী ফুটফুটে নাতি হয়েছে। ইস্, সূর্যবাবু গীতাদি বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হতেন! গত অঘ্রানে ঝন্টুদার বউ নিজে এসে মাকে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেল, মার তো আনন্দে পাগলপারা দশা। দুল দেবে, না আংটি, নাকি পিওর সিল্ক, ভেবে ভেবে কুল পায় না। টুকটুকির বিয়ের দিন দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে দোতলায় উঠে গেল মা। এ দিকে আমরা ভাইবোনেরা তো কাঁটা হয়ে আছি, পাঁচজনের সামনে না ছ্যার-ছ্যার করে কিছু শুনিয়ে দেয় মন্টুদার বউ। কিংবা মন্টুদার ছেলেরা। অঘটন যদিও কিছু ঘটল না, প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে ফিরে মা জানাল তাকে নাকি বড়ই খাতির-যত্ন করেছে সবাই।

মাস তিনেকের মধ্যেই অবশ্য নমুনা মিলল খাতির-যত্নের। দোতলা থেকে মাছের আঁশ পড়ছে ঝুরঝুর, নেমে আসছে আনাজের খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট। সঙ্গে নোংরা স্যানিটারি ন্যাপকিনও। মার দৃষ্টি তো প্রায় গেছে, সেই

ন্যাপকিন আবার আঙুলে তুলে প্রশ্ন করছে, এটা কী ফেলল দ্যাখো তো প্রমিতা! ওপরের বারান্দায় তখন যুবতী বউদের খিলখিল হাসি, যেন আচ্ছা জব্দ করেছে শ্বশুরবাড়ির ভাড়াটে বুড়িটাকে।

মানছি, আমরা কম ভাড়ায় থাকি। মামলার কারণে সে টাকাও জমা পড়ে রেন্ট কন্ট্রোলে। আমাদের ওপর বাড়িওয়ালার রাগ থাকতেই পারে। তা বলে ওই স্তরের অসভ্যতা? এ পাড়ায় তো আরও অনেক পুরনো ভাড়াটে আছে, বাড়িওয়ালাকে তারাও কিছু পাঁচ দশ হাজার ঠেকায় না, আজ তারা বাড়ি ছাড়লে গৃহস্বামীরা কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবে। কিন্তু ভাড়াটের সঙ্গে এ ধরনের লাগাতার নোংরামি করে চলে কোন বাড়িওয়ালা? নেহাত জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে, নইলে মা বউদি ভাইঝিকে নিয়ে রমু তো কবেই উঠে যেত।

প্রমিতা চা বানাতে গেছে ভেতর বারান্দায়। গলা উঁচিয়ে ডাকল,—দিদি, একটিবারও শুনে যাও।

পায়ে পায়ে কাছে গেলাম,—কী রে?

—জানো তো, পরশু দুপুরে ওপরে নগেন দত্ত এসেছিল।

—সে আবার কে?

—ওই যে গো, মোড়ের রাঘববাবুদের বাড়িটা ভেঙে যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। প্রমিতা গলা নামাল,—লোকটা অনেকক্ষণ ছিল দোতলায়। নামার সময়ে আমাদের পোরশনটা টেরিয়ে-টেরিয়ে খুব দেখছিল।

দক্ষিণ কলকাতার এ অঞ্চলটায় জমি ফ্ল্যাটের এখন বিস্তর দাম, প্রোমোটাররাও তাই পুরনো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর জন্য ছোঁক ছোঁক করছে সর্বক্ষণ। এ বাড়ির ওপরও নজর বড়েছে তা হলে? স্বাভাবিক, এ বাড়িরও বয়স তো কম নয়। সূর্যজেঠার বাবা বাড়িটা বানিয়েছিলেন সেই উনিশশো আঠাশ সালে। আর আমার বাবা-জেঠারা ভাড়া নিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। যখন লোকজন দুদ্দাড়িয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। তারপর তো বাবা-জেঠাদের সংসার হল, সংসার বড় হল, চাকরিসূত্রে জেঠারা একে একে চলেও গেল অন্যত্র, একমাত্র বাবাই যা সপরিবার রয়ে গেল পাকাপাকি। এরপর এ বাড়ি হয়তো মুছেও যাবে কালের নিয়মে।

প্রতিমা কাপে চা ঢেলেছে। চিনি নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল,—আমাদের ফ্লোর এরিয়া কত আছে গো দিদি? হাজার দেড়েক স্কোয়ার ফিট হবে না?

—তা হবে।

—বাড়ি ভাঙা হলে সমপরিমাণ জায়গার ফ্ল্যাট আমরা পাব না? রাঘববাবুদের ভাড়াটে তো পাচ্ছে।

—দাঁড়া। আগে তোদের ওপরওয়ালা রাজি হোক, তাদের সঙ্গে দরে বনুক।

—বনবে গো বনবে। মোটা প্রণামি পেলে ওপরওয়ালাও গলে জল হয়ে যায়।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও কথাটা পাক খাচ্ছিল মাথায়। রাস্তায় নেমে একবার ঘুরে দেখলাম বাড়িখানাকে। ইস্, কী জীর্ণ দশা! রঙের বালাই নেই-ই, চতুর্দিক থেকে প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। নিজেরাও সুরত ফেরাবে না, আমাদেরও হাত ছোঁয়াতে দেবে না। বছর দুয়েক আগে রমু ঘরগুলো চুনকাম করাল, তাই নিয়েও দোতলা থেকে যা খিস্তির ফোয়ারা ছুটেছে।

নাহ্ প্রোমোটারের হাতে গেলেই বেশ হয়। তখন ফ্ল্যাট তো একটা জুটবেই, সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অশান্তির অবসান। তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও স্বস্তি পাই। নগেন না খগেন, তাকে বলে একটা ফ্ল্যাটকেই যদি দুটো করে নেওয়া যায়, একটাতে রমু থাকল অন্যটায় তুলতুলিকে নিয়ে প্রমিতা। সমু মারা যাওয়ার পর রমুই সংসারটা দেখে, নিজে বিয়ে-থা করেনি, বউদি-ভাইঝির কোনও অযত্নই সে করে না। তবু পায়ের নীচে নিজের ফ্ল্যাটের শক্ত মাটি থাকলে প্রমিতাও বুঝি একটু বেশি নিশ্চিন্ত হয়।

হা হতোস্মি, কোথায় কী! পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখি প্রমিতার মুখভার, মা ফিকফিক হাসছে। সোফায় বসতে না বসতেই মাতাঠাকুরানির সে কী উচ্ছ্বাস,—অ্যাই জানিস তো, মন্টুর বউ এতদিনে একটা বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে।

ধান্দা মাখা মুখে বললাম,—কী রকম?

—এক বজ্জাত প্রোমোটার বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানানোর টোপ দিতে এসেছিল, তাকে ঘেঁটি ধরে বের করে দিয়েছে।

শুনে খুশি হব, না ব্যথিত বুঝে উঠতে পরেছিলাম না। মা ফের বলল—তোরা তো শুধু বউটার নিন্দেমন্দই করিস, দ্যাখ একটা কত বড় প্রলোভন জয় করল।

—ওকথা বলবেন না মা। প্রতিমা ঝনঝন বেজে উঠেছে,—শুনিয়ে শুনিয়ে কী বলছিল কানে যায়নি আপনার?

—আমি অত খেয়াল করিনি। মা নির্বিকার।

প্রমিতা উত্তেজিতভাবে বলল,—কী বলে চেল্লাচ্ছিল জানো? হারামজাদা ভাড়াটে ফোকটে ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে, এমন ডিলে আমি পেচ্ছাব করে দিই। ভাবো দিদি, কেমন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার পলিসি! ঝণ্টুদা-মণ্টুদা দু তরফেই তো ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে, দোতলায় এখন না হোক আট-নটা প্রাণীর বাস। নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়। তবু তেএঁটেপনা যাবে না। ভাড়াটেকে বাম্বু দেওয়া যাচ্ছে, এতেই প্রাণে মলয় বইছে!

—তাতে তোমার এত জ্বালা ধরে কেন বাছা? মা ফুট কাটল, ওদের সুবিধে অসুবিধে ওরা বুঝবে, তোমায় ভাবতে হবে না।

ফোঁস ফোঁস মন্তব্য, টুকুস টুকুস টিপ্পনির চাপান উতোর শুরু হয়ে গেছে। হাওয়া গরম ক্রমশ। আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বেরিয়ে আজও একবার ঘুরে দেখলাম বাড়িটাকে। আমার কুমারীবেলার গন্ধমাখা বাড়িটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ভেবে বুঝি বা একটু স্মৃতিমেদুরই হয়ে পড়েছিলাম সেদিন, আজ মোটেই তেমনটা লাগছে না। বরং বিরক্তিই জাগছে যেন। মনে হচ্ছে ছিরিছাঁদহীন এক বুড়ো গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া আলখাল্লা চাপিয়ে মাড়ি বার করে ভেংচাচ্ছে আমাকে। তর্জনী নাচিয়ে বলছে, নেহি মিলেগা শান্তি, নেহি মিলেগা।

দিন আষ্টেক পর আবার গেলাম মায়ের ডেরায়। ফোনে মা এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন, ইডলি বানাচ্ছি, খেয়ে যা। সে দিন উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, গৃহে অপার শান্তি বিরাজমান। শাশুড়ি-বধূ দু'জনেই সুহাসিনীম্,

সুমধুরভাষিণীম্। বাড়ি ভাঙাভাঙি তো দূরস্থান, দোতলার প্রসঙ্গই উঠল না। রমুও ফিরেছে চটপট, তুলতুলিরও টিউটোরিয়াল নেই, সকলে মিলে জমিয়ে আড্ডা মারলাম সারা সন্ধে।

সময় গড়াচ্ছে নিজের মনে। গোটা গ্রীষ্মকালটা কলকাতাবাসীদের এ বার তাপে ভাজা ভাজা করলেন সূর্যদেব। কপাল ভাল, মৌসুমি বায়ু বেশ জলদি জলদি পৌঁছে গেল। আষাঢ়ের গোড়াতেই বৃষ্টির কী ধুম! সারাটা দিন আকাশ পাঁশুটে বর্ণ, কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে মেঘবাহিনী, টিপটিপ ঝিরঝির ঝমঝম কত বিচিত্র ধারাই যে ঝরছে অবিরাম।

এ বারও বর্ষায় ও বাড়ির অবস্থা বেশ কাহিল। রেনপাইপ ভেঙে উঠোন বারান্দা জলে কাদায় থইথই, স্নানঘরের ফুটো চাল দিয়ে ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি ঢুকে পড়ছে, পাঁচিলের ওপারে গাছ গাছড়া বেড়ে মশককুলের বংশবৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত। আর রুটিন মাফিক ঝরে-পড়া পচা আবর্জনায় ঘরের আশপাশ তো ম ম করেই।

তা, রেনপাইপে তো আর হাত ছোঁয়ানোর অনুমতি নেই। ও পারের মশানিধনও নিষিদ্ধ। বোধহয় ওপরওয়ালা আশায় আশায় আছে এ বার ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাবে, ম্যালেরিয়ায় টাঁসবে ভাড়াটের গুষ্টি। এ সবের মধ্যেই আমার নির্বিরোধী ভাইটি হঠাৎ একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসল। ঝটাক্‌সে বদলে ফেলল কলঘরের টিনের চালখানা। কত আর বৃষ্টিতে ভিজে চৌবাচ্চা থেকে গায়ে জল ঢালা যায়!

প্রথম এক-দু'দিন বাড়িওয়ালা চুপচাপ, তারপরেই নতুন করোগেটেড টিনের আচ্ছাদনে ধাঁই ধপাধপ ইট। ছোটখাটো ঢেলা নয়, আস্ত আস্ত থান ইট। নিয়ম করে পড়ছে রোজ, সন্ধে নামার পরে। হঠাৎই বুদুম্ করে একটা আওয়াজ হয়, তারপর ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য, কয়েক সেকেন্ড পর দোতলার বারান্দায় চাপা খিলখিল হাসি। মা একদিন নরম করে গলা উঠিয়েছিল, কেন বাবা ও রকম করছ? কষ্টের পয়সায় সারানো চালাটা ভেঙে যাবে যে। অমনি যুবককণ্ঠে ওপর থেকে হরিধ্বনি, বলো হরি, হরি বোল। বুড়িকে এবার খাটে তোল।

রমু বেচারি নার্ভাস হয়ে পড়েছে রীতিমতো। সে চিরকালই সাংসারিক

ঝামেলা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলতে চায়। ও বাড়ি যেতে সেই রমুর গলাতেই অন্য সুর,—আর তো পারা যায় না রে দিদি। এ বার একটা এসপার-ওসপার করতেই হবে।

—কী করবি? থানায় যাবি?

—দূর দূর, দারোগাবাবুদের ডিম খাইয়ে কী হবে। ভাবছি দোতলার সব কটাকে একদিন বাঁশপেটা করে আসব।

বুঝলাম, উদাসীন রমু খেপেছে বিস্তর। শান্ত করার জন্য ঠাট্টা জুড়লাম,—তারপর লাল গামছায় মুখ ঢেকে হাতকড়া পরে কোর্টে উঠবি, তাই তো?

—কপালে বোধহয় সেটাই নাচছে। জানিস, কাল তুলতুলিটা এক চুলের জন্য বেঁচে গেছে। উঠোনে কী জন্যে যেন নেমেছিল, ওমনি ছাদ থেকে মিসাইলের মতো একখানা ফাঁকা মদের বোতল। একটা টুকরো যদি ছিটকে এসে বিঁধে যেত...

—আমরা তো সন্ধের পর কলতলা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। প্রমিতা বলে উঠল,—অমূল্য বালতি করে জল তুলে রাখে, ভেতর বারান্দার ছোট বাথরুমটাতেই...

—হুম। বড় একটা শ্বাস টেনে খানিকটা হাওয়া ভরে নিলাম বুকে। মাথা নেড়ে বললাম,—কিন্তু এটা তো কোনও পার্মানেন্ট সলিউশান নয়।

—সমাধানের তো একটাই রাস্তা। রমুর স্বর গুমগুমে,—সূর্য চাটুজ্যের শয়তান নাতিগুলোরই জয় হোক। আমরা মানে মানে কেটে পড়ি।

—পালাবি?

—উপায় কী? টিনের চালটা ভেঙে গেলেই যে ওরা থামবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে? প্লাস রোজ রোজ খ্যাচোর খ্যাচোর, টেনশান...বাড়ি ফিরলেই এই কমপ্লেন, ওই কমপ্লেন...। আমি কাজকর্ম করব, না থানা-পুলিশ করে বেড়াব? রমু মাথা ঝাঁকাচ্ছে,—বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে দিতে পারছে না বলে আমাদের ওপর আক্রোশ আরও বাড়ছে। যত রকম ভাবে পারে এখন হ্যারাস করবে। তার চেয়ে বরং সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, বাইপাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেলি। লোন-টোন নিয়ে হোক, যে

করে হোক। তারপর পজেশান পেলে চলে যাব।

—উঠে যাব আমরা? বাড়ি ছেড়ে? বহুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকা মা হঠাৎই প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে,—কেন যাব?

—ওরা আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না, তাই।

—ওরা চাইলে চলে যেতে হবে? কে ওরা? মার গলা আরও চড়ে গেল,—কদ্দিন আছে ওরা এই বাড়িতে? ছোঁড়াগুলো তো এই সেদিন জন্মাল! ওদের বউগুলোই বা কত দিন এসেছে, অ্যাঁ? তিন বছর? চার বছর? পাঁচ বছর? আমি আছি পাক্কা ঊনষাট বছর। সেই বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক। ঝণ্টু-মণ্টুর বউরা যতদিন এ বাড়িতে আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি দিন।

—আশ্চর্য, এ যে কমলাকান্তের মতো যুক্তি! দুধ আমি খেয়েছি, অতএব গরুও আমার! রমু ঠোঁট বেঁকাল,—বি প্র্যাকটিক্যাল মা। ঊনষাট বছর বসবাস করলেই বাড়ি ভাড়াটের হয়ে যায় না।

—আলবত হয়। লক্ষ বার হয়। এটাই তো আমার ভিটেমাটি। এ বাড়িতেই বউ হয়ে আমি প্রথম পা রেখেছিলাম, এখানেই আমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, এখানেই এত কাল সংসার করলাম, এ বাড়িতেই তোর বাবা মরেছে, আমার সমু মরেছে...

মার গলা মাঝপথেই আটকে গেল। স্বরযন্ত্র স্তব্ধ, কিন্তু কণ্ঠনালীর ওঠানামা চলছেই। ক্ষীণ হয়ে আসা দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জল।

এ কি শুধুই অশ্রু? নাকি ঊনষাট বছর ধরে এ বাড়ির একতলার ভিতে ইট-কাঠে কড়ি-বরগায় জানলা-দরজায় চারিয়ে যাওয়া অদৃশ্য এক শিকড়ের রস? বুঝতে পারছিলাম না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মার কথাগুলো হয়তো নেহাতই হাস্যকর। নিছকই এক বৃদ্ধার প্রলাপ। তবু যে কেন গলার কাছে একটা ডেলা জমাট বাঁধে।

নাহ্, শিকড়টাকে এখন উপড়ে ফেলা অসম্ভব। মণ্টুদার ছেলেরা বোমা মেরেও পারবে না। ♣

নকল রাজা

সার্কিট হাউসে পৌঁছেই দড়াম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল বরদাকান্ত। ওফ্, বুকটা এখনও ঠকঠক করছে। আর একটু হলেই খ্যাপা পাবলিকের হাতে জোর গোবেড়েন খেতে হত আজ। ভাগ্যিস সেলিম বুদ্ধি করে ছুটিয়ে দিয়েছিল গাড়িটা!

তলপেটে গভীর নিম্নচাপ। হাঁচোর পাঁচোর করে বরদাকান্ত টয়লেটে ঢুকল, মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে লো ইংলিশ কটের খোঁদলে ভুস করে ডুবে গেল শরীর। সর্বাঙ্গ এলিয়ে আসছে। মাথার ভেতর একটানা ডোরবেলের শব্দ। রাতেও ভাল ঘুম হয়নি। একে কড়া অম্বলের জ্বলুনি, তার সঙ্গে হাজারো দুশ্চিন্তা। কাক ডাকার আগেই বিছানা ছাড়তে হয়েছে, তার ওপর এই টানা ছ ঘণ্টার সফর। এবং তুলকালাম। দেহ আর কত নিতে পারে?

নরম বিছানায় জ্যান্ত পাশবালিশটি হয়ে খানিক গড়াগড়ি খেল বরদাকান্ত। মখমল মোড়া গদির ওপর তুলতুলে পালকের বালিশ, এসি মেশিন ঠাণ্ডা বাতাস ছড়াচ্ছে ঘরময়, এখন ঘুম চাই। একটু ঘুম। শান্তির ঘুম।

সত্যি, কপালজোরে ফাঁড়াটা কাটল আজ। খাসি পাড়া ছেড়ে গাড়ি

সবে সং-এর বাজারে ঢুকছে, দ্যাখ না দ্যাখ শ'দেড়েক মানুষ উড়ে এল গাড়ির সামনে। ব্যাস্, গোটা কনভয় পলকে স্ট্যাচু। কানের পাশে কী কান ফাটানো চেল্লানি, বাপ্স! হট্টগোলে একটি শব্দও পরিষ্কার বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে স্প্লিনটারের মতো টুকরো টুকরো ধ্বনি শুধু ছিটকে আসে—চাই!...হবে।...দাও! দুমদাম হাত-পা ছুঁড়ছে পাবলিক, পারলে বুঝি গাড়িটাকেই ভেঙে দেয়, গুঁড়িয়ে দেয়! সরখেল আর পাহাড়ি অবশ্য যথেষ্ট ঝানু মাল, মন্ত্রীটন্ত্রিদের পাহারাদারি করে করে হাড় পাকিয়ে ফেলেছে। আগেই আন্দাজ করে গাড়ির কাচ তুলে দিয়েছিল তারা। তাতেও বেসামাল দশা। চাকভাঙা বোলতা যেন পিলপিল করছে চারদিকে। ভাগ্য ভাল, গোটা পুলিশফোর্স এসে গেল সময় মতো। বরদাকান্ত তখন দরদরিয়ে ঘামছে। ক'দিন আগে অগ্নিপন্থীদের সঙ্গে নৈঋতপন্থীদের জোর লড়াই হয়ে গেছে এ অঞ্চলে। জখম গোটা পঞ্চাশ, মারা গেছে তিনজন। তার মধ্যে একটা আবার মহিলা। রাতভর যুদ্ধে গোটা এলাকা তছনছ। ঘটনাটা মোটামুটি জানাই ছিল বরদাকান্তর, কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে মনের সব জোর পলকে খতম। গাড়িতে বসে উৎসর্গীকৃত ছাগলের মতো কাঁপতে কাঁপতে সে শুধু আড়চোখে দেখেছিল ওদিকের কোনাকুনি রাস্তাখানা ধরে কালো বুলেটপ্রুফ গাড়িটা বেরিয়ে গেল সাঁ-সাঁ। মহামন্ত্রীকে নিয়ে অতঃপর নিজের গাড়ির নাকে লটকানো জাতীয় পতাকার দিকে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকা ছাড়া বরদাকান্তর তখন আর উপায় কী!

মহামন্ত্রী পার হয়ে যেতেই আর এক দৃশ্য। সরখেল আর পাহাড়ি সামনের সিটে ঠুঁটো জগন্নাথটি হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ, অকস্মাৎ নড়ে উঠেছে দুজনে। গাড়ি থেকে নেমে দুই মূর্তি হাত মুখ নেড়ে কী বলল, কে জানে, কিন্তু পাবলিক আরও মারমুখী সহসা। তাদের সেই এক দাবি, মন্ত্রীমশাইকে নামতেই হবে গাড়ি থেকে। এবং সেদিনের ঘটনাটির কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, জানাতে হবে তাদের। বোঝো ঠেলা! বরদাকান্তর হাত পা তখন পেটের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে শামুকের মতো। হৃৎপিণ্ডে নেহাই-এর ঘা। পাকস্থলীতে গুড়গুড় গুড়গুড়। আপন মনে গাল পাড়ছে নিজেকে। শালা রাজা সাজার শখ। নাও, এখন ম্যাও সামলাও।

পুলিশ অবশ্য সময় নষ্ট করেনি বেশি। প্রগতিশীল ডান্ডা চালিয়ে মুহূর্তে সাফ করে দিয়েছিল সামনেটা। মাখন মাখানো লাঠির ঘায়ে কুচো চিংড়ির মতো লাফাচ্ছিল লোকগুলো। তখন সেলিমকে আর পায় কে, ঝটাক্‌সে হাঁকিয়ে দিল গাড়ি।

বরদাকান্ত পাশ ফিরল। কত কিছুই ঘটে যেতে পারত আজ। পাবলিক ধরে ছেঁচতে পারত তাকে। চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারত। নিদেনপক্ষে কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে সুখ তো করে নিতে পারত হাত পায়ের। থান ইট মেরে কাচ ভেঙে ফেলাও তো মোটেই অসম্ভব ছিল না। নাহ্, এবার জেনে নিতে হবে তার গাড়িটা কতটা মজবুত। আজকাল সাঁইসুঁই গুলি চালায় লোকজন, কাচগুলো বুলেটপ্রুফ তো? অবশ্য না হলেই বা বরদাকান্তর কী করার আছে? তার তো আর হুকুমজারি করার ক্ষমতা নেই, ওহে এবার আমাকেও বুলেটপ্রুফ করে দাও! শুনলে রক্ষাসচিব হয়তো খ্যাঁক খ্যাঁক হাসবে, মাস গেলে ফোকটে এতগুলো টাকা পাচ্ছেন, সঙ্গে এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা...! শহিদ হওয়ার জন্যই না এ চাকরিতে এসেছেন! না পোষালে যান, আবার যাত্রাদলের রাবণ সাজুন গিয়ে!

বাড়িতে সুভদ্রাও প্রায় এক সুরে গান গায়। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তুমি বড় আজুলি আছ বাপু। অত ভয় পেয়ে চলে নাকি? ফোকটে আরামটাও কত পাচ্ছ বলো তো?

—তা পাচ্ছি। তবে যে কোনওদিন ফৌতও হয়ে যেতে পারি।

—বালাই ষাট। তুমি মরবে কোন দুঃখে? মরলে মরুক বগলাচরণ। কিংবা নুটুবিহারী। মা রক্ষাকালী তোমায় ঠিক বাঁচিয়ে রাখবেন, দেখো। কিংবা মার্কসবাবা, গান্ধিবাবা।

—বাহ্, এই নাহলে মেয়েমানুষের হৃদয়! বগলা আর নুটুর বুঝি প্রাণের দাম নেই?

—না। নেই। মনে রাখবে, এ পৃথিবীতে নিজের ছাড়া আর কারুর প্রাণের দাম নেই। মুখে আজকাল খই ফোটে সুভদ্রার। অবলীলায় বলে,—কপালগুণে মহামন্ত্রীর নকল সাজার সুযোগ পেয়েছ, মরার কথা না ভেবে বউ ছেলের জন্য সুখটুকু কুড়িয়ে নাও। তাছাড়া দেশের দশের স্বার্থে মহামন্ত্রীকে

রক্ষা করা তোমার একটা কর্তব্যও তো বটে। দেশের নেতা আগে? না তুমি?

বরদাকান্ত ভেবে পায় না, সুভদ্রার মনে কবে থেকে এমন দেশপ্রেম চাগিয়ে উঠল। মহাসতী অপেরায় তার পাশে মন্দোদরী সাজত সুভদ্রা, কখনও বা দুখিনী সীতা, কিংবা কোনও এক পতিপ্রাণা গাঁয়ের বধূ। শহুরে যাত্রাদল তো নয়, দুজনে মিলে কোনক্রমে অন্নসংস্থান করত। ছেঁড়াকাটা সংসার চলত তাপ্পি মেরে মেরে। এখন সাড়ে চার হাজারি সাজানো ফ্ল্যাটে তাদের বাস। কথায় কথায় ট্যাক্সি, নিউমার্কেট, শপিং মল, দামি দামি জামা জুতো, শাড়ি গয়না। হাতে সেলফোন নিয়ে সুভদ্রা যখন রাস্তা দিয়ে সেজেগুজে হাঁটে, দেখে অন্য কারুর বউ বলে ভ্রম হয়। শিক্ষাসচিবের কলমের এক গুঁতোয় সাহেবি কেতার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল ভান্তু, হ্যাম পুডিং পিজা বারগার ছাড়া ভেতো খানা আর মুখে তোলে না বাবু। তা এত স্বাচ্ছন্দ্য, এই বিলাস কি শুধু প্রাণের ভয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়?

বরদাকান্ত উঠে বসল। নাহ্, বিশ্রাম হবে না, মাথাটা গজগজ করছে। সরকারের কাছে আগেই খবর ছিল মহামন্ত্রী ঘেরাও হবেন আজ, ঝুটঝামেলাও হতে পারে। তাই তো মাঝরাতে ফোন করে তড়িঘড়ি তৈরি হতে বলা হল বরদাকান্তকে। এরকমই দুমদাম নির্দেশ আসে। বগলাচরণ আর নুটুবিহারীকেও জিজ্ঞেস করে দেখেছে, তাদেরও আগেভাগে কিছু জানানো হয় না। কার কখন ডাক আসবে জানে না কেউই। একটু আগেই বরদাকান্ত যেমন খবর পেল, নুটুবিহারী হেলিকপ্টারে উড়ে আসছে। এখানে। এই সার্কিটহাউসে। বিকেল চারটেয় কাদাভাঙা মাঠে মহামন্ত্রীর জনসভা, সার্কিটহাউস থেকে মিটিং অবধি পথটুকু নুটুই হাত নাড়তে নাড়তে যাবে। খোলা জিপে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমন মহামন্ত্রী থাকতে চান সবসময়ে। জনতার উদ্দেশে হাত দোলাবে ক্রমাগত, আর ছুড়ে ছুড়ে দেবে হাসি। সরখেল আর পাহাড়ি নিয়মমতোই থাকবে পাশে। সজাগ হয়ে। ওই পথটুকু পার হওয়াতেই নাকি আজ ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। ওদিকে ঈশানপন্থীদের বেজায় দাপট, কোথা থেকে যে কে কী ঝেড়ে দেয়! টেলিস্কোপিক এ-কে ফরটিসেভেন তো এখন ঘরে ঘরে। বক্তৃতামঞ্চের মাঝখানে তিনদিক ঘেরা বুলেটপ্রুফ কাচের পোডিয়াম বানানো হয়েছে, সেখানে মহামন্ত্রীর গায়ে আঁচড়

পড়ার আশংকা নেই। জিপ থেকে নামার পর টুপ করে হয়ে যাবে বদলাবদলিটা। মিশমিশে কালো গাড়িটায় সেঁধিয়ে যাবে নুটুবিহারী, আর উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে পড়বেন মহামন্ত্রী। অবিকল নুটুর মতোই ঠোঁটে অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে। হাতে নমস্কারের মুদ্রা সমেত। কেউ ধরতেও পারবে না। নুটুবিহারীকে নিয়ে গাড়ি নিঃশব্দে চলে আসবে সার্কিট হাউসে।

ডোরবেল বাজছে। বরদাকান্ত উঠে দাঁড়াল।

—লান্‌চ দিতে বলব স্যার?

—আধ ঘণ্টা পর। নিজেকে মহামন্ত্রীতে ফিরিয়ে আনল বরদাকান্ত।

সিকিউরিটির লোকটা লম্বা সেলাম ঠুকল। দরজার ওপাশে আরও দুজন নিরাপত্তাকর্মী বসে, মুখের গদগদ ভাব দেখে মনে হয় না ও ব্যাটারাও কিছু জানে। জানার কথাও নয়। ডামি সংক্রান্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর গোপনীয়। হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রিহার্সাল আর বন্ড সই করার পর বরদাকান্তদেরও এই চাকরিতে আসা। বেফাঁস হওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোনোখানেই।

দরজা বন্ধ করতে না করতেই আবার ঘণ্টি। বরদাকান্ত টান টান হয়ে দাঁড়াল। একটু আগের ভাবনা ভয় সব কেটে গেছে, সে এখন সত্যি সত্যিই মহামন্ত্রীর ভূমিকায়। মাঝে মাঝে এই রাজা সাজার ব্যাপারটা কেন যে এত গৌরবের মনে হয়?

—স্যার, এখানকার কিছু লোকাল নেতা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বরদাকান্তর বুক ফের ঢিপঢিপ করে উঠল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আসল মহামন্ত্রী তো পৌঁছে গেছেন বহুক্ষণ, কার সঙ্গে কী প্রোগ্রাম সব আগে থেকে তৈরিও আছে, সেক্রেটারি স্বয়ং সেগুলোর দেখাশুনো করছে, নেতাই হোক কি জনতা, বরদাকান্তর কাছে আসে কী করে?

ঝটপট উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাল বরদাকান্ত। মুখে এক পোঁচ গাম্ভীর্য টেনে বলল,—সরি। ওদের বলুন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। তাছাড়া আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে...

—স্যার, ওরা বলছে এখনই নাকি ওদের টাইম দেওয়া হয়েছে।

কী আশ্চর্য, টাইম পেয়ে থাকলে আসল মানুষটির কাছে যাক,

বরদাকান্তকে গাড্ডায় ফেলা কেন?

গলা আরও ভারী করল বরদাকান্ত,—বলছি তো, এখন সম্ভব নয়। বলে দিন বিকেলে মিট করব। জনসভার পর।

—কিন্তু স্যার...

—ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। গো অ্যান্ড কনসাল্ট মাই সেক্রেটারি।

নিরাপত্তা কর্মিটি ধমক খেয়ে বেরিয়ে যেতেই বরদাকান্তর ভুরু জড়ো। যত্ত সব উটকো বখেড়া। এসব মিটিং কী, ভালই জানা আছে বরদাকান্তর। মুখে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে টুপি দেওয়াও যে খুব কঠিন কাজ নয়, তাও সে জানে। তবু ঘাড় পেতে অতিরিক্ত দায়িত্ব সে নেবে কেন? যাক্, আপাতত ভাগানো গেছে। আশা করা যায় এখুনি এখুনি আর কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

সুসজ্জিত কামরার মানুষপ্রমাণ বেলজিয়াম আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বরদাকান্ত। কাচের ভেতরে মহামন্ত্রী। তার চোখে চোখ রেখে হাসল, সামান্য,—ঠিক আছে তো স্যার?

—শাবাশ। ভালই চালাচ্ছ। চালিয়ে যাও।

—মাঝে মাঝে বড্ড নার্ভাস লাগে স্যার। দিব্যি তাঁতি তাঁত বুনে খাচ্ছিল...

—ও কথা বোলো না। কখনও কখনও নিজেকে রাজা ভেবে তো আনন্দও পাও।

—তা ঠিক। তবে জানেন কি স্যার...

—কী?

—সবই ঠিক আছে। শুধু আপনার প্রাণটা যদি আমার ভেতর না রাখতেন...। নইলে আগের কাজের সঙ্গে এই চাকরির তেমন তফাত তো দেখি না। তখন ধড়াচুড়ো পরে রাবণ সাজতাম, এখন মাস্ক সাঁটিয়ে মহামন্ত্রী। কাজ তো দুটোই মোটামুটি এক।

—বাজে বোকো না। রাবণ সাজা আর মহামন্ত্রী সাজা কি এক হল?

—দোষ নেবেন না স্যার। আমার চোখে তো মাত্র একটা তফাতই ঠেকে। রাবণ সেজে পেটের ভাত জুটত না, আর এ লাইনে প্রচুর টাকাপয়সা, আরাম, ইজ্জত। শুধু ওই প্রাণভয়টুকুই যা...

—আহ্, শুধু প্রাণভয় আর প্রাণভয়। মজাটার কথাও ভাবো।

—ওই মজাটার কথা ভেবেই তো...। যেমন আমার রাবণের অ্যাক্টিং দেখে লোকে আমায় রাবণ ভাবত, তেমনি মহামন্ত্রী সেজেও তো...

—অ্যাই, তুমি আমায় বিদ্রূপ করছ নাকি?

—কী যে বলেন স্যার। বরদাকান্ত একহাত জিভ বার করল,—আমি আপনার অধীনের অধীন। আপনাকে ব্যঙ্গ করার মতো বুকের পাটা আমার কোথায়?

—হুম।

মহামন্ত্রী নিজের গালের চামড়া ধরে টানলেন একটু। চামড়া তো নয়, যেন, মেমসাহেবের স্টকিংস্। পাতলা ফিনফিনে খোলস ইলাস্টিকের মতো বেড়ে উঠেই টাঁই করে সেঁটে গেল গালে। বরদাকান্ত হো হো হেসে উঠল। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শৌখিন শয্যায়।

ভুরিভাজ সেরে টুকুন বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল বরদাকান্ত, জাগল বিকেলের মুখে মুখে। নুটুবিহারীর ডাকাডাকিতে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বরদাকান্ত বলল,—কখন আসা হল?

—এই তো।

—আছেন কেমন?

—আর থাকা। নুটুর চোখ ছলছল করছে,

—বাড়িতে ঘোরতর অশান্তি চলছে মশাই। মেয়েটা একটা লক্কা পায়রার সঙ্গে ভেগে পড়বার তাল করেছে। ফিরে গিয়ে কী দেখব কে জানে। আদৌ ফিরব কিনা তাও তো বলা যায় না।

—আহা, বিচলিত হচ্ছেন কেন? বরদাকান্ত হাত রাখল নুটুবিহারীর কাঁধে,—মাত্র তো ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার।

—বাইরে কী পোস্টার দেখলাম জানেন? মহামন্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে ওরা গেন্ডুয়া খেলতে চায়।

—আরে দূর, ও তো শুধু চমকানোর জন্য। আদতে এরা ওরা সবাই তো এক। আর ওরা যদি এরা হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন এরাই তখন ওরা হয়ে গিয়ে একই পোস্টার মারছে। সত্যি সত্যি কেউই কারুর গায়ে হাত

দেবে না।...শুধু কমন পাবলিককে নিয়েই যা একটু ঝামেলা। ওরা তো ইমোশানে চলে, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। কমন পিপলকে একটু সামলে সুমলে চললেই...

—হুম। নুটুবিহারী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—বুঝি তো সবই, তবু ভয়টা যে যায় না। সত্যিকারের মহামন্ত্রী হলে হয়তো...

আর কোনও কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ মুখোমুখি বসে। নুটুবিহারী নাক টানছে মাঝে মাঝে। মিনিট কয়েক পরে আরও ভারী একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রিফকেস খুলল। বের করছে ধবধবে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি। পোষাক বদলে চুলে দু-চারটে রূপোলি রেখা টানল তুলি দিয়ে। বরদাকান্তও হাতের চাপে টেনে টেনে খুলল রবারের মুখোশখানা, তুলে দিল নুটুবিহারীর হাতে। চার্জ মেকওভার টেকওভারের পালা শেষ।

ডোরবেলে ডিং ডং। দরজায় আবির্ভূত হয়েছে পাহাড়ি,—বাইরে কনভয় রেডি স্যার।

—আমিও রেডি। নুটুবিহারী বেরোতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাশে মুখে তাকাল বরদাকান্তর দিকে। নীচু গলায় বলল,—আমার কিন্তু সত্যিই আজ খুব নার্ভাস লাগছে বরদাবাবু। দেখুন, হাঁটু দুটো কাঁপছে কেমন। ডান চোখ নাচছে।

বরদাকান্তরও চোখ কেঁপে উঠল,—আমাদের এখন আর পালাবার পথ নেই নুটুবাবু। যা হওয়ার হবে, মধুসূদনের নাম নিয়ে নেমে যান স্টেজে। বেশি বিপদ দেখলে না হয় মুখোশটা খুলে ফেলে দেবেন।

নুটুবিহারী ফ্যাল ফ্যাল তাকাল।

—আরে মশাই, ঠিকই বলছি। আমরা তবু মুখোশটা খুলতে পারি। বেচারা মহামন্ত্রীর কথা ভাবুন তো। তার তো মুখোশ খোলার সুযোগটাও নেই। সে নিজে মানুষটা কেমন, তাই হয়তো সে ভুলে গেছে।

নুটুবিহারী কি সান্ত্বনা পেল কোনও। বোঝা গেল না। করিডোর পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার আগে ঘুরে তাকাল একবার।

বরদাকান্ত দূর থেকে হাত নাড়ল,—গুডবাই স্যার। ♣

অতি তুচ্ছ

সিগারেট ধরানোর সময় কখনই হাতের কাছে দেশলাই খুঁজে পায় না ঊশীনর। অথচ সে যে দেশলাই কেনে না এমন নয়, রোজই কেনে। বেশির ভাগ সময়েই সিগারেট কিনতে গেলে সঙ্গে একটা দেশলাই কেনা তার অভ্যাস।

এইমাত্র রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে শোওয়ার ঘরে এসেছে ঊশীনর! এখন ধূমপানের সময়। অভ্যাস মতোই দেরাজের মাথা থেকে প্যাকেট খুলে সিগারেট বার করল ঊশীনর, অন্যমনস্ক হাত দেশলাই খুঁজছে। পলকে বিরক্তি। রাখী পাপাই-এর দুধ গরম করতে রান্নাঘরে ঢুকেছে, নির্ঘাৎ রাখীই সরিয়েছে দেশলাই। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে ঈষৎ তেতো মুখটা একবার আয়নায় দেখে নিল ঊশীনর। সঙ্গে সঙ্গে গলাও চড়িয়েছে, রাখী আমার দেশলাই দিয়ে যাও।

পাম্প দেওয়া স্টোভ নিয়ে কসরৎ করছিল রাখী। পাপাই হওয়ার পর একজন বয়স্কা মহিলা রাখা হয়েছে, ডিউটি আওয়ারস সকাল নটা থেকে সন্ধে ছটা, রাখী অফিস থেকে ফিরলে তবে তার ছুটি। তারপর থেকে ছেলের পরিচর্যার ভার রাখীরই। সঙ্গে টুকটাক কাজকর্মও সারে সংসারের।

রাতের রুটি করা, কাচা জামাকাপড় ইস্ত্রি, পরদিন সকালের জন্য কুটনো কুটে রাখা, মশলা বের করে রাখা...

সজোরে হাওয়া-কাটা শোঁও শব্দ ছুটোছুটি করছে রান্নাঘরে। রাখী ঊশীনরের ডাক শুনতে পেল না। পেলেও বুঝি তার উত্তর দেওয়ার স্পৃহা নেই।

ঊশীনর গটগটিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে এল, কী হল, আমার দেশলাই কই!

হাতা দিয়ে আলতো করে দুধ নাড়ছে রাখী। উদাস জবাব দিল, সে তো তোমারই জানার কথা।

—তুমি স্টোভ জ্বালালে কিসে?

—জ্বালিয়েছি। রান্নাঘরে দেশলাই আছে।

—মোটেই না। ওটাই আমার দেশলাই।

—কক্ষনো না। আমি গণেশের মাকে দিয়ে আনিয়েছি।....তোমার জ্বালায় বাড়িতে দেশলাই রাখার জো আছে? রাখী স্টোভের আওয়াজের সঙ্গে গলা মেলাল।

কর্মরত রাখীকে আর কি ভাতানো উচিত হবে? ঊশীনর গলা নরম করল, ঠিক আছে, তোমারটাই দাও আপাতত।

—স্টোভ থেকে আগুন নিয়ে নাও। রাখী আঁচলে ধরে সসপ্যান নামাল, কাঠি বেশি নেই, কাল সকালে লাগবে।

অগত্যা এক ফালি কাগজই ভরসা। মুখে আগুন নিয়ে ঊশীনর ফিরল ঘরে। বিছানায় শুয়েছে টান টান। ধোঁয়া মাথায় যেতেই আশ্চর্য সুখানুভূতি, চোখ বুজল ঊশীনর। সন্ধেয় কেনা দেশলাইটা গেল কোথায়? সিগারেটের দোকান থেকে কোথায় কোথায় যেন গিয়েছিল? উঁহু, ক্লাবে তো আজ যায়নি, সুতরাং আড্ডায় ফেলে আসার চান্স নেই। গিয়েছিল অচিন্ত্যদের বাড়ি, ওখানে আধঘণ্টাটাক বসেই বাজার। অচিন্ত্যদের ওখানেই কি তবে ফেলে এসেছে? তাই বা কী করে হয়? অচিন্ত্য গোটা দুয়েক সিগারেট খাইয়েছিল, দুবারই লাইটার জ্বালিয়ে। বাজারের রঘু নন্দীর দোকানে পাপাই-এর বেবিফুড কিনেছিল, সেখানে সিগারেট ধরিয়েছিল কি? বোধহয় ধরিয়েছিল। বাজার থেকে বেরিয়েই হঠাৎ তপতীর সঙ্গে দেখা, সুদর্শন সুউপায়ী বর আর

ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরে বাসস্টপের দিকে ধাবমান তপতী। সম্ভবত দিদির বাড়ি এসেছিল।

দেশলাই-এর ভাবনা থেকে তপতীতে ডুবে গেল ঊশীনর। কলেজে তপতীর ওপর বেশ দুর্বলতা ছিল ঊশীনরের, ক্লাসরুমে চোখে হারাত। কী দেখতে ছিল তখন তপতী! রাজহাঁসের মতো গায়ের রঙ, দোহারা চেহারা, মোমপালিশ করা হাত পা, কোমর অবধি ঢেউ ঢেউ চুল, সামান্য গোল মুখ, চিবুকের কাছে গভীর খাঁজ। আর পাঁচটা ছেলের মতো ঊশীনরের সঙ্গে সমান ভাবে মিশত তপতী, তবু যেন ঊশীনরের মনে হত তপতী তাকেই বেশি চায়। মনে হলেই শরীর জুড়ে আলি আকবরের সরোদ! হৃদয়ের কথা তপতীকে বলা যায় কি যায় না স্থির করার আগেই ঝুপ করে বিয়ে হয়ে গেল তপতীর।

আজ রাস্তায় ঊশীনরকে দেখে তপতী হই হই করে উঠেছিল, কী রে, আছিস কেমন?....বিয়ে থা করেছিস শুনলাম? কী হয়েছে, ছেলে না মেয়ে?

তপতীর বর ভদ্রলোকটির সঙ্গে আগে একবার আলাপ হয়েছিল ঊশীনরের, কিন্তু তার নামটা কিছুতেই তখন মনে এল না। এই এক দোষ ঊশীনরের, ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারগুলো এমন বিশ্রীভাবে ভুলে যায়! ওই দেশলাই এর মতোই।

ঠোঁটে অমায়িক হাসি বুলিয়ে ভদ্রলোক ফাইভ ফিফটি ফাইভ বাড়িয়ে দিয়েছিল, ওখানেই কি ঊশীনর দেশলাই বার করেছিল? ধুৎ, তপতীর সূর্যদেব তো মিউজিক লাইটার দুলিয়ে আগুন নাচাচ্ছিল তখন।

তপতী ঊশীনরকে শুনিয়ে বলেছিল, আর বলিস না, ওর গাড়িটা পরশু থেকে খারাপ হয়ে আছে....এত রাতে কি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? ঊশীনর জোরে জোরে কটা টান দিল সিগারেট। অজান্তেই মুখটা বেঁকে চুরে গেছে। বিদেশি লাইটারঅলা স্বামীর বউরা কি ওই ভাষাতেই কথা বলে? তোর বরের গাড়ি আছে কি নেই তাতে ঊশীনরের কী এসে যায়!

রাখী ঘরে এসেছে। মাটিতে বসে বোতল ধরেছে পাপাই এর মুখে, আট মাসের ওস্তাদ ছেলে টানছে চোঁ চোঁ।

ছেলের চুলে বিলি কাটতে কাটতে রাখী মুখ তুলেছে, বেমালুম শুয়ে পড়লে যে? একদিন একটু বিছানাটাও করে নিতে পার না?

রাখীর গলার ঝাঁঝটা মনে মনে মাপল ঊশীনর। তেমন তাত নেই। আড্ডায় না গিয়ে ঊশীনর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে বলে রাখীর মেজাজ বুঝি কিঞ্চিৎ শরিফ আজ। ঊশীনর চোখ চালিয়ে বউকে দেখল একটুক্ষণ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তপতীর মতো সুন্দরী নয় রাখী, সাধারণ ঘরের মেয়েদের চামড়ায় মাখন মাখন ভাব আসবে কোথা থেকে? তার ওপরে আবার রাখী চাকরি করে! সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রূপচর্চা করার সময় কোথায় বেচারার! বিয়ের আগে অবশ্য রাখীর শরীর স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না, পাপাইটা হওয়ার পরে বড্ড রোগা হয়ে গেল। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে গলার দুদিকে দুটো খোঁদল, গাল চুপসে গেছে, চামড়া খসখসে মেরে গেছে বেশ। তবু জোড়া ভুরু, পাতলা ঠোঁট, ছোট্ট কপালের রাখী এখনও খুব একটা হেলাফেলার নয়। হঠাৎই ঊশীনরের বুক কী এক অচেনা মায়ায় দুলে গেল। অফিস করে এসেও কী হাঁচোড় পাঁচোড় করে ঘর সামলায় রাখী। গণেশের মা থাকলেও নিজের হাতে রান্না করা চাই, ঘরদোর ঝাড়াও। ছেলে হওয়ার পর থেকে বেচারার তো একদম হিমশিম দশা। ঊশীনর কি তাকে একটুও ঘরের কাজে সাহায্য করতে পারে না?

সিগারেট নিবিয়ে ঊশীনর উঠল। হঠাৎই ভাল ছেলের মতো বিছানা ঝাড়তে শুরু করে দিয়েছে। সত্যি সত্যি যদি এখন থেকে রাখীকে সংসারের কাজে সাহায্য করে, কেমন হয়? টুকিটাকি, টুকিটাকিই সই। পেরে উঠবে কি? মেয়েলি কাজে হাত লাগানো কি তার মতো পুরুষের কর্ম?

রাখী চাপড়ে চাপড়ে পাপাইকে ঘুম পাড়াচ্ছে, চোখ ঊশীনরের দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, ওই তো তোমার দেশলাই!

—কই?

—ওই তো বেডকভার ঝাড়তেই পড়ল মাটিতে। শব্দ পেলে না?

ঊশীনর বেশ অবাকই হল। এত কাছে ছিল, একেবারে হাতের গোড়ায়, তবু যে কেন চোখে পড়েনি! নীচু হয়ে দেশলাইটা তুলে নিল ঊশীনর, একটু হাত বুলিয়ে পাজামার পকেটে রেখে দিল। নাহ, তুচ্ছ এই জিনিসটাকে আর হেলাফেলা করা চলবে না।

কথাটা ঊশীনর ভাবল বটে, পরদিন আবার ফেলে এল দেশলাই।

অফিসে। ছুটির পর ব্রিজ কম্পিটিশন চলছিল, নেশাগ্রস্তের মতো ঊশীনর দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তখনই কে যেন চেয়ে নিয়েছিল। আশ্চর্য তুচ্ছ ওই একটা বস্তু হারিয়ে ফেলা যেন ঊশীনরের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে! হারাবে খুঁজবে, হারাবে খুঁজবে, কখনও পাবে, কখনও পাবে না.... জীবনের অনুষঙ্গ কি তবে এটাই?

টিপ টিপ বিরক্তির মধ্যে এরকমই সব ফিলজফিকাল চিন্তা আসছিল ঊশীনরের মাথায়। ভাবতে ভাবতেই কখন পাড়ার মোড়ের পান সিগারেটের দোকানে এসে দাঁড়িয়েছে।

—এই মন্টু, একটা দেশলাই দে তো।

—শুধু দেশলাই, সিগারেট চাই না?

—নাহ্, আছে। দেশলাইটাও ছিল....

—হারিয়ে গেল? দেশলাই বড় আজব মাল রে! থাকে আবার থাকেও না।

মন্টু ঊশীনরের স্কুলের বন্ধু। এক সময়ে এক ক্লাসেই পড়ত, ক্রমশ গাড্ডু খেতে খেতে পিছিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারে নি, বাবা কান পাকড়ে ছেলেকে বসিয়ে দিয়েছিল দোকানে। পান বিড়ি বেচে বলে মন্টুর কোনো কমপ্লেক্স নেই, সত্যি বলতে কি দোকানটা সে ভালই চালায়, এবং মাস গেলে ঊশীনরের থেকে রোজগারও বেশি। হয়তো বা সেই সুবাদেই বন্ধুকে জ্ঞান দিতে ভারী উৎসাহ।

দোকানের তাক থেকে একটা রঙচঙে দেশলাই পাড়ল মন্টু, বিজ্ঞের সুরে আবার বলল, মানুষের এইটাই নেচার। দরকারি জিনিসের কদর বোঝে না।

মন্টুর কথার ভঙ্গিতে এবার বেশ মজা পেল ঊশীনর। হাসল গাল ছড়িয়ে—বলছিস?

—বলছি।...এই যেমন ধর বউ। পাশে থাকলে খেয়ালও থাকে না, আবার প্রয়োজনের সময়ে তাকে না পেলেই ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। মন্টু চোখ টিপল—মানিস কথাটা?

কথাটা আঁতে লেগে গেল ঊশীনরের। রাখীকে কি সে বেশি অবহেলা করছে আজকাল? কোন এক দূর গ্রহের প্রাণী তপতী, রাস্তায় কটা মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল কি হয় নি, তার কথা তিন তিনবার মনে পড়েছে! সকালে বাজারের কুমড়ো কেনার সময়ে, অফিসের আয়নায় নিজেকে জিভ

ভেঙাতে ভেঙাতে, এবং অবশ্যই মিনিবাসের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকার কালে। কই, একটি বারের জন্য রাখীর কথা তো মনে পড়ে নি! রাখী কি তাহলে এখন দেশলাই এর মতো তুচ্ছ, যখন তখন মন থেকে হারিয়ে ফেলা যায়? আর তপতী টুং টাং বেজে ওঠা বাজনাদার শৌখিন লাইটার?

চোরা মর্মপীড়ায় ভুগতে ভুগতে বাড়ি ফিরল ঊশীনর। ঢুকে যা দেখল, তাতে পীড়া আরও বেড়ে গেল। স্টোভে পিন করতে করতে গলদঘর্ম রাখী, ফালি প্যাসেজটার মধ্যিখানে বসিয়ে রেখেছে পাপাইকে, বুকে ভর দিয়ে এদিক ওদিক পিছলে পিছলে চলে যাচ্ছে পাপাই, কাজের মধ্যে দৌড়ে দৌড়ে এসে রাখী সামলাচ্ছে ছেলেকে। ছিঃ ছিঃ, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পাপাইকে তো সে অন্তত ধরতে পারে!

ঊশীনর অফিসের পোষাকেই মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ল, কোলে তুলে নিল পাপাইকে। বাধো বাধো গলায় বলল, স্টোভটা খুব প্রবলেম করছে, না?

—প্লিজ, ঢঙের কথা বোলো না। রাখী ঝনঝন করে উঠল, কদিন ধরে একটা নতুন স্টোভ কেনার কথা বলছি, মনে থাকছে কারুর?

—বিশ্বাস কর, আজ বাজারে যাওয়ার সময়ও মনে ছিল। ঊশীনর অপরাধী অপরাধী মুখ করল, মৃণ্ময়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এমন ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল মৃণ্ময়দা....

—বুঝেছি। এ কাজটাও আমাকেই করতে হবে। কবে আমি অফিস থেকে ফেরার সময়ে নিয়ে আসব....

—দেখো, কাল ভুল হবে না।

—থাক, তুমি নিজেকে নিয়েই থাক।

স্টোভ দপ্ করে জ্বলে উঠেছে, হলুদ শিখা নীল হচ্ছে ক্রমশ। টানা গোঁ গোঁ আওয়াজটাও বাড়ছে ধাপে ধাপে।

একদৃষ্টে আগুনের শিখাটাকে দেখছিল রাখী। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, এবার কি বাবুর চা তেষ্টা পাবে? সাফ বলে দিচ্ছি, নো ঘ্যানর ঘ্যানর, আগে আমি ছেলের খাবার তৈরি করব, তারপর তোমার ফরমায়েশ।

সহানুভূতিতে ঊশীনরের চোখে প্রায় জল এসে গেল। এত কষ্ট করে রাখী। সরকারি অফিসে চাকরি হোক আর যাই হোক, বাস ঠেঙিয়ে অফিসটা তো যেতে হয়, কাজও নিশ্চয়ই করতে হয় কিছু, আবার ফিরে এই হাড়ভাঙা

খাটুনি.....! কদিন ধরে উলের গোলা নিয়ে যাচ্ছে, তরতর করে এগোচ্ছে পাপাই এর সোয়েটার, সেও তো কাজ! এরপরেও ঊশীনরের নেশাটার কথা ভোলে না রাখী, আর সে নিজে.....?

মিনমিন স্বরে ঊশীনর বলে উঠল, আজ থেকে আমি নিজেকে বদলে ফেলব রাখী।

রাখীর চোখ সূঁচের মতো সরু হয়ে গেল—কী রকম?

—তোমার সব কাজে আমি হাত লাগাব। ঘর ঝাড়া, ইস্ত্রি করা, রুটি বানানো, পাপাই-এর দুধ গরম.....

—তুমি! রাখীর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, চাকি বেলন কী করে ধরতে হয় জান?

—শিখব। তুমি শেখাবে। প্রথমে আটামাখা, তারপর রুটি বেলা, তারপর চাটুতে ফেলা সেঁকা....খুব কঠিন কাজ কি? বল তো আজ থেকেই শুরু করতে পারি।

—থাক, তোমাকে আর আটা মাখতে হবে না। অনেকক্ষণ অভুক্ত আছি, রাতের খাওয়াটা আমার মাটি করে কাজ নেই। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাত চলছে রাখীর। পাপাই এর ভেজিটেবলস প্রেশারে বসে গেল, টিন থেকে বার করছে আটা, মেপে মেপে দুকাপ জল ভরল কেটলিতে। টেরচা চোখে তাকাল ঊশীনরের দিকে, চাইলে একটা কাজ অবশ্য তুমি করতে পারো।

ঊশীনর উদ্‌গ্রীব স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—কী?

—গণেশের মা বালিশের ওয়াড় কেচে মেলে দিয়ে গেছে, বারান্দা থেকে তুলে এনে ঝটপট গিয়ে পরিয়ে ফ্যালো তো।

দারুণ প্রাণিত বোধ করল ঊশীনর। পাপাইকে রাখীর জিম্মায় দিয়েই বড় বড় পা ফেলে ওয়াড় নিয়ে সোজা শোওয়ার ঘরে। শুরু হয়েছে কর্মবিলাস। দুমিনিটেই টের পেল, কাজটার মধ্যে একটা গোপন রহস্য আছে, নাহলে কোনও ওয়াড়ই কোনও বালিশে খাপ খায় না কেন? হয় ল্যাৎল্যাৎ করে ঝোলে, নয়তো বালিশেই গলানো যায় না! গণেশের মা অন্য কোনও বাড়ির ওয়াড় কেচে দিয়ে যায়নি তো?

রাখী দরজায় দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসছে, মুরোদ বোঝা গেছে মশাই। ওঠ।

ঊশীনর অপ্রতিভ মুখে বলল,—হয়ে যাবে। একটু সময় লাগবে, প্রথম

প্রথম তো....

—তুমি নতুন, তা বলে ওয়াড়গুলো তো নতুন নয়। ছিঁড়ে যাবে যে। রাখী রহস্যময় কাপড়ের খোলগুলোকে ছিনিয়ে নিল, পটাপট পরিয়ে ফেলছে, তুমি বরং একটা সহজ কাজ কর দেখি। প্রেশার কুকারটা নামিয়ে চায়ের জলটা চড়িয়ে দাও গিয়ে।

এই বা মন্দ কী, এও তো সাহায্য করা। ঊশীনর দ্রুত রান্নাঘরে এল। জল চড়িয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দাঁড়াল একটু। পাপাই এর স্টুটা যদি সেই বানিয়ে ফেলে আজ, কেমন হয়? কী কী দিতে হয় দেখেছে তো! নয় কম করেই দেবে, পাপাই তো সত্যি সত্যি স্বাদ বুঝতে পারবে না! বড় হয়ে নিশ্চয়ই মনেও থাকবে না বাবা একদিন একটা কুৎসিত স্টু খাইয়েছিল!

উদ্যমী পুরুষের চিন্তায় আর কর্মে ফারাক থাকে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সমস্যা দেখা গেল। কুকারের ওপরের ওয়েটটা খুলতেই তীব্র শব্দসহ ধেয়ে এল বিট গাজরের বাষ্প, সোজা ছুটে যাচ্ছে সিলিং এর দিকে। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অদ্দূর পৌঁছল না, বিগ্রেডের ফোয়ারার মতো নেচে নেচে থেমে গেল। উঁকি মেরে একবার দেখে নিল ঊশীনর, রাখী কিছু জানতে পারে নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কুকারের ঢাকনা খেলার চেষ্টা করল ঊশীনর। এ কী রে বাবা, খোলে না কেন? যেভাবেই ঘোরাক, যেভাবেই কসরৎ করুক, কোথাও না কোথাও ঠিক আটকে যাচ্ছে! রাখী খোলে কী করে, লাগায়ই বা কী কায়দায়?

চায়ের জল ফুটে গেছে। কুকার ছেড়ে কেটলিতে খপাৎ করে এক মুঠো চা পাতা ফেলে দিল ঊশীনর। চিনি দুধ মিশিয়ে মোটামুটি একটা চা চা রঙও এনে ফেলল কাপে।

রাখীর সামনে কাপ প্লেট হাজির। তৃপ্ত উজ্জ্বল মুখ। গর্বিত মোরগের মতো ঘাড় দুলিয়ে ঊশীনর বলল, করেই আনলাম, বুঝলে? অফিস থেকে ফিরে রোজ রোজ তো তুমিই আমায় চা খাওয়াও, এবার থেকে আমিই....

রাখী মেঝেতে পাপাই এর হামা টানা দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তুমি করলে?

—হুঁ হুঁ, সব পারি। তুমি অফিসে যেতে পার, আমিও সংসারের কাজ করতে পারি।....দেখ, খেয়ে বল কেমন হয়েছে!

চুমুক দিয়ে কি মুখটা বিকৃত হয়ে গেল রাখীর? ঊশীনর ঠিক বুঝতে পারল না। রাখী টেরচা চোখে দেখছে ঊশীনরকে,—তেতো করে ফেলেছ, তবে খাওয়া যায়।

তেতো হওয়াটা মোর স্টিমিউলেটিং। ঊশীনর যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, ইচ্ছে করেই তেতো বানালাম।

রাখীর চোখ নড়ল না, ভুরু নাচাচ্ছে,—আজ কেসটা কী বল তো? হঠাৎ কাজের বাই চাপল যে! বলে বলেও তো কখনও তোমাকে দিয়ে কুটোটি নাড়ানো যায় না।

পকেটে হাত দিয়ে দেশলাইটাকে একটু অনুভব করে নিল ঊশীনর,—বললাম তো, আজ থেকে নিজেকে বদলাচ্ছি। দেখো, আর কখনও হারাবে না।

—কী হারাবে না?

বলতে গিয়েও সামলে নিল ঊশীনর। হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গেল। মনে মনে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, মুখে যাই বলুক রাখী আজ খুশিই হয়েছে। এইটুকুই তো চেয়েছিল সে! এইটুকু করলেই এত শান্তি!

রাতে খাওয়ার সময়ে অফিসের গল্প শোনাচ্ছিল রাখী। রোজই শোনায়, ঊশীনরের সে সময় হাই ওঠে, আজ সে একাগ্রমনা। হাসার সময়ে একটু বেশি হাসল, কৌতূহল তো দেখালই, কখনও ভীষণ সিরিয়াস মুখ করে মতামতও জানিয়ে ফেলল। এও তো কাজ, রাখীকে আনন্দ দেওয়া।

আমে দুধ মিশে গেলে আঁটি গড়াগড়ি যায়। পাপাই ঠিক আঁটি না হলেও বাধা তো বটে। রোজ সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যিখানে বাফার স্টেটের মতো শুয়ে থাকে। আজ তার স্থান হল খাটের ও পাশে, ছোট্ট কটটায়। নিভাঁজ শয্যায় এলিয়ে পড়ার আগে শেষ সিগারেটটা খেয়ে যত্ন করে বালিশের নীচে রঙচঙে দেশলাইটা রাখল ঊশীনর। তারপর বিছানায় নীল জ্যোৎস্না এল, মধু বাতাস এল, ফুলের সুবাস এল, নাম-না জানা পাখিও ডাকল কত। দেশলাইটাও বাজনা হয়ে বাজছিল তখন, মিউজিকাল লাইটারের মতো।

পরদিন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ হয়ে অফিস গেল ঊশীনর। অফিস থেকে বেরনোর সময়েও দেশলাইটা পকেটে ছিল। বাড়ি ফিরব ফিরব করেও যখন তাসের আড্ডায় চলে গেল, তখনও আছে।

তারপরই দেশলাইটা হারিয়ে গেল। ঊশীনর যে এখন কী করে! ♣

বড়িওয়ালা

প্রতি মাসেই বড়ি দিতে এসে একটানা খানিকক্ষণ বকবক করে যায় লোকটা। নিজের সুখদুঃখের কাহিনি, অভাব অনটনের গল্প। সেই কবে সব খুইয়ে ওপার বাংলা থেকে চলে এসেছিল, কী ভাবে এখানে দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েছে, কত যুদ্ধ করে তার বাপ জ্যাঠারা কলোনি গড়ল, বাখারি দরমার দেওয়াল কী ভাবে একটু একটু করে পাকা হল, তারপর বাপ মরল, মা মরল, লেখাপড়া শিকেয় তুলে একটা সেরামিক্সের কারখানায় চাকরি জুটিয়েছিল, সেই কারখানাতেও কবে তালা ঝুলে গেছে, তখন থেকে শুরু হয়েছে এই বড়ি-আচার ফিরি করার কাজ, দাদারা ঠকিয়ে আলাদা করে দিয়েছে, বুড়ি পিসি এসে পড়েছে ঘাড়ে, তার মধ্যেই বিয়ে, তার মধ্যেই ছেলে...

শুনতে মন্দ লাগে না সুমিতার। মায়াও হয়, রোমাঞ্চও জাগে। আহা রে, কত কষ্ট করেই না বেঁচে থাকে মানুষ!

আজ বড়িঅলা একটু যেন বিমর্ষ। নীরবে বড়ি দিল, নীরবেই চলে যাচ্ছিল, সুমিতাই ডাকল,—তোমার শরীর টরীর খারাপ নাকি?

একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি মাঝবয়সেই কপালে বলিরেখা এসে যাওয়া মানুষটা ম্লান মুখে বলল,—ছেলেটাকে নিয়ে বড় ভাবনায় আছি বউদি।

—কেন, কী হয়েছে ছেলের?

—আর বোধহয় ওর পড়াশুনো চালাতে পারলাম না।...নাইনে উঠল, চার পাঁচশো টাকার বই কিনতে হবে...কী ভাবে যে কী করি... দিনে তো এই তিরিশ চল্লিশ টাকা রোজগার...বড়িঅলা বড় করে একটা শ্বাস ফেলল,—ছেলেটার খুব মাথা ছিল বউদি। অ্যালজেব্রা জিওমেট্রি সব টকাটক করে ফেলে। স্কুলের স্যাররা বলেন, সত্যবন্ধু স্কুলের নাম রাখবে...

—কোন স্কুলে যেন পড়ে তোমার ছেলে?

—কলোনিরই স্কুল। আগে এইট পর্যন্ত ছিল, এখন মাধ্যমিক হয়ে গেছে।

—তা ছেলের মাথা আছে বলছ, হেডস্যারকে বলো যদি বইটই দিয়ে সাহায্য করেন।

—তাঁরা দিয়েছেন কয়েকটা। তবু...

সুমিতার মনটা দয়ায় ভরে গেল। রাজা গত বছর স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে, কিন্তু ওর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বই তো নিশ্চয়ই বড়িঅলার ছেলের চলবে না। চট করে ঘরে গিয়ে একটা একশো টাকার নোট নিয়ে এল সুমিতা,—আপাতত এটা রাখো। দ্যাখো কতদূর কী হয়, না হলে পরে আবার এসে...

বড়িঅলার চোখ চিকচিক করে উঠল,—সবার প্রাণে যদি আপনার মতো দয়ামায়া থাকত বউদি! সামান্য বড়ি আচার নিয়েই কত লোকে কত কথা শোনায়! বেশি দাম নিচ্ছ! বড়িতে ময়দা মেশাও কেন? হিঙের গন্ধ কই! অথচ আমার পিসি নিজের হাতে বড়ি দেয়, আচার বানায়।

আপনমনে বিনবিন করতে করতে লোকটা চলে গেল।

বুকের মধ্যে একটা খুশি কুলকুল করছিল সুমিতার। অভাবী মানুষকে সাহায্য করতে পারার গরিমা। আহা রে, ওর ছেলেটা যেন ভাল হয়, বাপের দুঃখ ঘোচায়, স্কুল পাশ করে কিছু একটা অন্তত জুটিয়ে ফেলে। সে টুকিটাকি কোনও হাতের কাজই হোক, কি লেবারের কাজ, কি ড্রাইভারি...

বছর দুয়েক কেটে গেছে। বড়িঅলা আজকাল আসে কম। পিসি মারা গেছে বড়িঅলার, সে এখন বেচে ধূপ, চানাচুর, বিস্কুট। এসব জিনিস বড় দোকান থেকেই কেনে সুমিতার বর। ফেরিওয়ালার জিনিসে তার আস্থা কম, নামি ব্র্যান্ড ছাড়া মন ওঠে না।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ জ্বলজ্বলে চোখে এসে হাজির বড়িঅলা, হাতে এক বাক্স মিষ্টি।

সুমিতা বেজায় অবাক,—কী ব্যাপার, এত মিষ্টি কেন?

—আপনার আশীর্বাদে ছেলেটা মাধ্যমিকে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে বউদি। ছিয়াশি পারসেন্ট পেয়েছে, পাঁচটা লেটার, অঙ্কে আটানব্বই।

—সুমিতা চমকে গেল। বড় বড় চোখে বলল,—ওমা, তাই নাকি?

বড়িঅলা উচ্ছ্বসিত মুখে বলল,—ওর মাস্টারমশাইরা বলছেন ওকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে।

সুমিতা গলা ঝেড়ে বলল,—বাহ্, ভাল। খুব ভাল।

—আমি ওকে জয়েন্টে বসাব বউদি। খেয়ে না খেয়ে যেমন করে হোক ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াব। আপনার ছেলের মতো।

সুমিতার মুখটা পাংশু হয়ে গেল। কষ্ট করে তবু একটা হাসি ধরে রাখল মুখে। বড়িঅলা চলে যেতেই মিষ্টির বাক্সটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল সুমিতা। ♣

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স

চন্দ্রা মোটেই ভাল নেই। আজকাল সে টের পায়, একটা হালকা বিষণ্ণতা যেন তাকে জড়িয়ে আছে দিনভর। হেমন্তের বিকেলের কুয়াশার মতো। অথচ চন্দ্রার তো এমনটা হওয়ার কথা নয়। যা যা আঁকড়ে ধরে একজন পঁয়তাল্লিশের রমণীমনে সুখের বোধ সঞ্চারিত হয়, সবই তো চন্দ্রার করায়ত্ত। দায়িত্ববান স্বামী, বাধ্য ছেলে, নিজস্ব সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট, ফ্রিজ-টিভি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, কী নেই তার! চন্দ্রার শরীর স্বাস্থ্যও রীতিমতো ভাল, জ্বরজারি সর্দিকাশির বাইরে তেমন কোনও রোগব্যাধিও তাকে ধরেনি এখনও। মধ্যবয়সি দুঃখবিলাসী গৃহে আবদ্ধ নিঃসঙ্গ গৃহবধূও তাকে বলা যাবে না, কারণ সে চাকরিও করে একটা। অফিস যে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়, এমন অপবাদও কি চন্দ্রা দিতে পারে? উহুঁ। সেখানে তো ফাঁকিবাজিটাই কাজ। আসি যাই মাইনে পাই, এমন চাকরিতে কতটুকুই বা পরিশ্রম?

তবু চন্দ্রা ভাল নেই? কিছু ভাল লাগে না তার, কিছু না। টিভি দেখতে

না, গান শুনতে না। আড্ডা মারতে না, হই-হই করতে না...। ভাল না লাগার এক জটিল আবর্তে সে যেন ঢুকে পড়েছে, বেরনোর পথ পাচ্ছে না। সকালবেলা বিছানা ছাড়তে আলস্য, যদি বা উঠলও কারুর সঙ্গে কথা বলতে বিরক্তি। প্রভাতি চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে তৃপ্তি নেই, কাগজে চোখ বোলাতে ইচ্ছে করে না, সুবিমল কী বাজার আনল তা দেখতেও অনীহা, রান্নার জন্য মানিকের মাকে নির্দেশ ছুঁড়তেও ফুটতে চায় না স্বর। সারাটা সকাল কী হুড়ুদ্দুমই না চলে বাড়িতে! একজনের অফিস রওনা হওয়ার তাড়া, তো একজনের স্কুল। বাপ-ছেলের হল্লাগুল্লাতেও চন্দ্রার ঘোরঘোর ভাব কাটে কই! বরং তাকে বেরোতে হবে স্মরণে এলেই বুক শ্রাবণের মেঘে ছেয়ে যায়। আবার অফিস না থাকলেও বিচিত্র এক অবসাদে কষ্‌টে মেরে থাকে মন। কী যে হল চন্দ্রার?

আর কিছুকাল পরে জরায়ু যে চিরনিদ্রায় যাবে, এ কি তারই কোনও সংকেত? আগাম বারতা?

আজও সল্টলেকের বাজার প্রাঙ্গণে এসে ঘন ঘন হাই উঠছিল চন্দ্রার। কোনো এক মন্ত্রী মারা গেছে কাল, অফিস তাই হাফ ছুটি হয়ে গেল, দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেল অনেকে, তাদের কাটিয়ে চন্দ্রা চলে এসেছিল এখানে। নতুন এই শপিং মলটার কাছেই তার বাড়ি। হাঁটা পথে মিনিট দশেক। ভেবেছিল এখানে খানিক সময় কাটিয়ে ফিরবে সন্ধের মুখে মুখে। বদ্ধ হলে বসে পরদার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার যন্ত্রণাও পোহাতে হল না, ফাঁকা ফ্ল্যাটের নির্জনতায় ফিরে একা একা কড়িকাঠও গুনতে হল না— আলো ঝলমল পরিবেশে হেঁটে চলে বেড়ানো তাও মন্দের ভাল। কিন্তু এখানেও ঠিক চন্দ্রার পোষাচ্ছে কই?

নাহ্, এই বিচ্ছিরি শুকোরোগটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। নিজেকে শায়েস্তা করতেই বুঝি ঘুরে ঘুরে খানকতক জিনিস কিনে ফেলল চন্দ্রা। দুটো সুদৃশ্য রঙিন মোমবাতি, মাইক্রোওয়েভের টুকরো টাকরা কিছু বাসনকোসন, এক বাক্স পেপার ন্যাপকিন। মৃদু একটা সৌরভ আছে ন্যাপকিনে, গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে অলস পায়ে চন্দ্রা এসে দাঁড়িয়েছে এক ঘড়ির দোকানের সামনে। অন্দরে দেওয়াল জোড়া আয়না। ঝুলছে অজস্র

বাহারি ওয়ালক্লক। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা সময়। কান পাতলে কাঁটার আওয়াজও যেন শোনা যায়। টিক টিক টিক টিক।

ঠিক তখনই মস্তিষ্কে জোর ঝাঁকুনি। ঘড়ির দোকানের আয়নায় ও কার প্রতিবিম্ব? অভ্র না? উল্টোদিকের আইসক্রিম পারলারে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে?

প্রাথমিক অভিঘাতটুকু সামলে চন্দ্রার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর। অভ্র এখানে এল কোত্থেকে? চন্দ্রা যত দূর জানত, অভ্র তো হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা। বহুকাল। যদি বা কাজকর্মে কলকাতায় এসেও থাকে, তার বাড়ি তো সেই গড়িয়ায়! লবণহ্রদের এই বাজারে সে একা একা কী করতে এসেছে? নিশ্চয়ই শুধু আইসক্রিম খেতে নয়? কিছু কিনতে টিনতে আগমন? দূর অতীত, প্রায় আগের জন্মের কথা, তবু চন্দ্রার মনে পড়ল। মার্কেটিং অভ্রর দু'চক্ষের বিষ ছিল। পারতও না। গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া পর্যন্ত কখনও স্বহস্তে কেনেনি। দায়িত্বটা ছিল অভ্রর মার ঘাড়ে। এবং বিয়ের পর চন্দ্রার। সেই কত যুগ আগে শেষ দেখা, চন্দ্রা ভুল করছে না তো?

চন্দ্রা ঘাড় হেলাল। অতি সন্তর্পণে। যেন কোনও ভাবেই না অভ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। তেরচা দৃষ্টি হেনে সিগনাল পেল মগজের, অভ্রই বটে। ছিপছিপে চেহারা ভারী হয়েছে সামান্য, মুখে ঈষৎ ফোলা ফোলা ভাব, তবে মাথাভরা চুল এখনও একই রকম ঘন, মোটা লেন্সের ভেতর দিয়েও চোখ অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। হাবভাবেও বদল হয়নি এতটুকু। সেই আগের মতোই উদোমাদা ভঙ্গি, সেই লম্বা শরীরখানা ঝুঁকিয়ে বাচ্চাদের মতো চেটে চেটে আইসক্রিম খাওয়া, সেই বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে দোকানের মধ্যিখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকা...। কে বলবে ওই লোকটাও পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে?

কানের পরদায় ঘড়ির কাঁটার অস্পষ্ট ধ্বনি। চোখের তারায় ঝাপসা ঝাপসা ছবি। জামাইষষ্ঠীতে চন্দ্রার বাপের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে অভ্র। পাঁঠার নলি পড়েছে পাতে। দিদি জামাইবাবু বাবা চন্দ্রা সবার খাওয়া শেষ, ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে, অভ্র বেহুঁশের মতো নলি ঠুকে চলেছে প্লেটে আর মাঝে মাঝে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে টানছে। নতুন জামাইয়ের কান্ডকারখানা দেখে মা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না, বাবারও তথৈবচ

দশা। জামাইবাবু চেখের ইশারায় চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করল, অভ্রর মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে কিনা। দিদি ভ্রূকুটি হানল জামাইবাবুকে।

সামাল্ দেওয়ার জন্য চন্দ্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—তোমাকে কি আর একটা হাড় দেবে? ওতে বোধহয় আর কিছু নেই।

—আছে আছে। অভ্র নির্বিকার,—দ্যাখো, শাঁস এখনও পুরো বেরোয়নি।...তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, হাত ধুয়ে নাও।

সেদিন বাড়ি ফিরে চন্দ্রা খুব বকাবকি করেছিল, অভ্র আমলই দেয়নি। যেন ভেবেই পায়নি ওই তুচ্ছ একটা ব্যাপারে অন্যের মাথাব্যথা কেন। কী যে সব বাজে বাজে অভ্যেস ছিল অভ্রর! প্রবল শব্দ তুলে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া, চকাম চকাম আওয়াজ করে খাবার চিবোনো...। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে খোশ গল্পের মাঝে এঁড়ে তর্ক জুড়ে দিত যখন তখন। মতে না মিললেই যাকে তাকে যা নয় তাই বলে দিত। একবার তো চন্দ্রার বাবাকেই শুনিয়ে দিল, আমায় আলফাল বোঝাতে আসবেন না, আমি সব বুঝি! কী শিক্ষা দিয়েছিল অভ্রর মা! ছোটবেলায় বাপ মরেছে বলে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে কচি খোকাটি বানিয়ে রেখেছিল ছেলেকে। আর চন্দ্রারও কপাল, ওই ছেলেমানুষি দেখেই কিনা মায়া জাগল মনে, দুম করে প্রেমে পড়ে গেল, বিয়েও পর্যন্ত করে ফেলল আগুপিছু না ভেবে। এই সময়ে কত বারণ করেছে বন্ধুরা। অনর্গল কানের কাছে বিনবিন করত, লালটু চেহারা দেখে ভুলিস না চন্দ্রা; ছেলেটা কিন্তু এক নম্বরের ক্যালাস...! কিন্তু চন্দ্রার যে তখন রোখ চেপে গেছে। দ্যাখ না তোরা, ওকে আমি মানুষ করে ছাড়বই! হায় রে, অভ্রকে সযুত করবে চন্দ্রা! একটা কুঅভ্যাসও বদলাতে পেরেছিল অভ্রর? পারলে কি বিয়ের দু'বছর কাটতে না কাটতেই সুতোটা ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যায়?

আইসক্রিম শেষ। সেই পুরনো প্র্যাকটিস, টিপ করে বিনে কাপ ছুঁড়ল অভ্র। এবং বাইরে ফেলল। চন্দ্রা ঝটিতি মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাঁটা শুরু করেছে।

পাঁচ পা'ও বুঝি যায়নি, ঘাড়ের কাছে গমগম গলা,—কী ব্যাপার, দেখেও কেটে পড়ছ যে?

অগত্যা চন্দ্রাকে থামতেই হয়। সরাসরি অভ্রর মুখ পানে তাকাল চন্দ্রা। অভ্র মিটিমিটি হাসছে। চন্দ্রাও জোর করে চিলতে হাসি ফোটাল ঠোঁটে।

অপ্রস্তুত স্বরে বলল,—না মানে...ভাবলাম তুমি হয়তো...

—অ্যাভয়েড করছ কেন? এখনও রাগ পড়েনি?

—যাহ্, কী যে বল! অ্যাদ্দিন কেউ রাগ পুষে রাখে নাকি?

—আমিও তো তাই ভাবছিলাম। আমাদের সম্পর্ক তো কবেই চুকে বুকে গেছে। এখন তো আমি আর তোমার শত্রু নই, ঠিক কি না?

অভ্রকে কি কখনও চন্দ্রা শত্রু ভেবেছিল? রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির সময়ে হয়তো কথাটা বলেও থাকতে পারে, এখন আর স্মরণে নেই। তবে অভ্রর তো কখনও খারাপ চায়নি। চন্দ্রা মৃদু স্বরে বলল,—হুম।...তা আছ কেমন?

—কেমন দেখছ?

—মনে হচ্ছে তো ভালই।

—তাহলে তাই।

—হায়দ্রাবাদে চলে গিয়েছিলে শুনেছিলাম। আশা করি এখনও সেখানেই...?

—না তো। হায়দ্রাবাদ কবেই ছেড়ে দিয়েছি। ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোরে গেছিলাম। তারপর চেন্নাই। দেন টু পুনে। সেখান থেকে নাগপুর। অভ্র একগাল হাসল,—এখন গোয়ায়। অ্যাট পানাজি।

আবার অদৃশ্য এক ঘড়ির কাঁটায় আওয়াজ। টিক টিক টিক টিক।

হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিধারী অভ্র বিয়ের প্রথম বছরেই তার তিন নম্বর চাকরিটি ছেড়ে বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। তখনও চাকরি না পাওয়া চন্দ্রা স্তম্ভিত মুখে বলল,—তুমি এখানেও টিকতে পারলে না?

—ধুৎ, পোষালো না। ছত্রিশটা রুম, তো তার একশো ছেষট্টি রকমের ফরমায়েশ। এ এসে চোখ রাঙায়, ও এসে মেজাজ দেখায়...। প্লাস, শালা মালিকটা বহুৎ খাটাচ্ছে।

—তোমার তো প্রতিবারই এক কমপ্লেন।

—প্রবলেম সেম হলে কমপ্লেনও সেম হবে।

—তুমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলে কেন? জানতে না, কাস্টমারও ডিল করতে হবে? কেন একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছ না?

—জ্ঞান মেরো না তো। তোমার অসুবিধেটা কী হচ্ছে শুনি? মা'র তো

এখনও রিটায়ারমেন্টের ছ'বছর বাকি আছে।

—লজ্জা করে না বলতে? বিয়ে থা করে মা'র ঘাড়ে বসে খাবে?

—ঘ্যান ঘ্যান কোরো না তো। মা'র পয়সায় খেতে তোমার মানে বাধলে তুমি কোনও কাজে লেগে যাও।...আর হ্যাঁ, ভাল করে এককাপ চা বানাও তো দেখি। লিকার বেশি, দুধ বেশি, চিনি বেশি।

—তুমি কী গো? তোমার কোনও ভাবনা নেই?

—ফালতু টেনশন করব কেন? দু চার মাসের মধ্যে আবার একটা কাজ ঠিক পেয়ে যাব।

সেই প্র্যাকটিস আজও বজায় রেখেছে অভ্র! চন্দ্রা অপাঙ্গে অভ্রকে দেখতে দেখতে বলল,

—তুমি তাহলে বদলাওনি?

—এবার ভাবছি বদলাব। গোয়াতেই সেটল করে যাব।

—তাই বুঝি?

—ইয়েস। অভ্র ঘড়ি দেখল। ঈষৎ চঞ্চলও হয়ে উঠল যেন। জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি তাড়া আছে?

—কেন?

—চলো না একটু কফি শপে গিয়ে বসি।

চন্দ্রা একটুক্ষণ ইতস্তত করল। অভ্র কি তার সঙ্গ কামনা করছে? শেষের দিকে তাদের সম্পর্কটা এত তিক্ত হয়ে গিয়েছিল যে এক পলক অভ্রকে সহ্য করতে পারত না চন্দ্রা। অথচ কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে তো অভ্রর প্রস্তাবে কোনও বিরক্তি জাগে না মনে? একটু বা হয়তো আড়ষ্ট লাগছে, তার বেশি কিছু নয়। কালের পলির নীচে বিরাগ কি তবে চাপা পড়ে গেছে পুরোপুরি? নাকি মনের কোনও গহিনে অভ্র রয়ে গেছে এখনও? নাকি এ শুধুই চোরা কৌতূহল, যা শুধু মেয়েদেরই থাকে? এক সময়ের প্রিয় পুরুষ এখন কেমন আছে তা জানার গোপন ঔৎসুক্য কি এ?

হ্যাঁ না বলতে হল না, ঘাড়ও নাড়ল না চন্দ্রা, হাঁটছে ধীর পায়ে। অভ্রর পাশে পাশে। দু'ধারের বিপণিতে থরে থরে মনোহারি সামগ্রী, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল চন্দ্রা, তবে সেভাবে কিছুই দেখছিল না। টুকরো টুকরো কথা মনে

পড়ছিল। সুখের। দুঃখের। তিক্ততার। আনন্দের। বিশ বছর ধরে কোনো ঝাঁপিতে যে রয়ে গেছিল স্মৃতিগুলো? সামান্য নাড়াচাড়া করে চন্দ্রা সরিয়ে রাখছিল তাদের। ফুসফুসে খানিকটা বাতাস ভরে নিয়ে চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল,—কোথায় উঠেছ? তোমাদের গড়িয়ার বাড়িতে?

—ও বাড়ি তো বিক্রি হয়ে গেছে। মা'র রিটায়ারমেন্টের পর পরই।

—ও। তোমার মা তাহলে তোমার সঙ্গে...?

—ছিল। এখন নেই। অভ্র ম্লান হাসল,—মা আর দুনিয়াতে নেই।

—কবে হল?

—এই তো, বছর দুয়েক আগে। হঠাৎ স্ট্রোক। পানাজিতেই!

—সরি। খবরটা আমি জানতাম না।

—জানার তো কথাও নয়। তারপর তো আর আসিও নি কলকাতায়, এখনাকার কারুর সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগও নেই...। এবার মাসি হঠাৎ ডাকল...মাসখানেকের ছুটিও পেয়ে গেলাম...

কথায় কথায় এসে গেছে কফি শপ। খোলা আকাশের নীচে ছড়ানো ছেটানো বেশ কিছু টেবিল চেয়ার। প্রথম ফাল্গুনের বিকেল, রোদের তেমন তাপ নেই, তাও একটা ছায়া ছায়া কোণ দেখে বসল চন্দ্রা। অভ্রর মুখোমুখি। অভ্র জিজ্ঞেস করল,—কী খাবে বলো?

—কফি।

—সে তো বলছিই। সঙ্গে স্যান্ডুইচ? বারগার?

—শুধু কফি।

বেয়ারাকে দুটো কফির অর্ডার দিয়ে অভ্র গুছিয়ে বসেছে। চন্দ্রা ভুরু কুঁচকে বলল,—তুমি না এক্ষুনি আইসক্রিম খেলে? আবার কফি খাবে?

—সো হোয়াট? তখন আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছিল, এখন মনে হচ্ছে কফিও একটু চলতে পারে।

—পারোও বটে। সেই হুইমজিকাল নেচার আর গেল না।

—সবাই কি আর মেথডিকাল হতে পারে? তোমার মতো? অভ্রর চোখে আলগা ঠাট্টা, ডিভোর্সের পর কেমন সুন্দর পরীক্ষায় বসলে, চাকরি পেলে, বিয়ে থা করলে

চন্দ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—বিয়েটা খুব ক্যালকুলেশন করে করিনি অভ্র। বাবা মা খুব দুশ্চিন্তা করত আমায় নিয়ে... দিদি জামাইবাবু খুব জোর করল...

—আহা, ঠিক আছে। আমি কি কৈফিয়ত চাইছি নাকি? অভ্র হা হা হেসে উঠল। কবজি ঘুরিয়ে আর একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল,—যাক গে, দিস টাইম ইউ আর হ্যাপি আই প্রিজিউম?

চন্দ্রা উত্তর দিল না। ঠোঁট টিপল সামান্য।

—তোমার হাজব্যান্ড যেন কী করেন?

—চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রাইভেট ফার্মে আছে।

—ওরে বাবা, সি এ! তাহলে নিশ্চয়ই খুব হিসেবি মানুষ? অভ্রর গলায় ফের ব্যঙ্গ।

চন্দ্রা গোমড়া হল,—ডিপেন্ড করা যায় এমন মানুষ তো বটে। ভেরি কেয়ারিং পারসন। আমার মাথা ধরলেও সে উতলা হয়ে পড়ে।

অভ্র একটু থমকে রইল। অতীতের কথা কিছু মনে পড়ল কি? পরক্ষণেই মুখে অমলিন হাসি,—তুমি ঠিক ডিসিশনই নিয়েছিলে চন্দ্রা। আমার সঙ্গে থাকলে তোমায় শুধু জ্বলতেই হত।

চন্দ্রা যেন শুনেও শুনল না কথাটা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে এদিক-ওদিক। খানিক তফাতে একটাই কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে দুখানা স্ট্র ঢুকিয়ে হুশ হুশ টানছে একজোড়া তরুণ-তরুণী, মাঝে মাঝেই পান থামিয়ে দুজনে ভেঙে পড়ছে উচ্ছল হাসিতে। অনেকদিন আগের একটা দৃশ্য চন্দ্রার বুকে উঁকি দিয়ে বুকেই মিলিয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হল চন্দ্রা। সুবিমলের সঙ্গে এরকম কোনও ছবি আছে কি তার? এতটা তরল হওয়ার কথা সুবিমল বুঝি ভাবতেই পারে না। সে স্বামী। প্রথম থেকেই পুরোপুরি স্বামী। প্রেমিক কদাপি নয়।

কফি এসেছে টেবিলে। অভ্র গলা খাঁকারি দিল,—নাও।

—হুম।

—কী এত ভাবছ?

—কিছু না। কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালো চন্দ্রা,—তোমার খবর বলো। কী

করলে অ্যাদ্দিন?

—চাকরি। ঘুরে ঘুরে। চরে চরে।

জিজ্ঞেস করবে না করবে না করেও চন্দ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তা বিয়ে করলে না কেন?

অভ্র চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখল চন্দ্রাকে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে কাপে, আগের মতোই শব্দ করে।

শব্দটা আজ যেন সেভাবে কানে বাজল না চন্দ্রার। ফের বলল,—আমার মতোই আর একটা ট্রাই নিতে পারতে। নেক্সট জন আমার মতো দজ্জাল নাও হতে পারত।

চন্দ্রার গলায় হাল্কা কৌতুকের সুর। তবে অভ্র বুঝি সেভাবে খেয়াল করল না। ঈষৎ আনমনা ভাবে তাকাচ্ছে চন্দ্রার দিকে, নামিয়ে নিচ্ছে মাথা। অভ্র যেন লজ্জা পাচ্ছে, মনে হচ্ছিল চন্দ্রার। শুধু চন্দ্রার কথা ভেবে ভেবেই কুড়িটা বছর কাটিয়ে দিল, এই সরল সত্যটুকু উচ্চারণ করতে নির্ঘাৎ দ্বিধা বোধ করছে অভ্র। ডিভোর্সে যে অভ্রর সায় ছিল না, সে তো চন্দ্রা ভাল মতোই জানে। অপদার্থ খামখেয়ালি অভ্র সেনগুপ্তকে জীবন থেকে নির্বাসিত করার জন্য চন্দ্রাই কি বেশি ব্যাকুল ছিল না? মিউচুয়াল সেপারেশনের প্রস্তাবটা অবশ্য অভ্ররই, কোর্টকাছারির যুদ্ধে সে যেতে চায়নি। লড়াই হলে চন্দ্রার পক্ষে মুক্তি পাওয়া অত সহজ হত কি? চরিত্রহীন তো দূরস্থান, অভ্রর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগটাও কি সে প্রমাণ করতে পারত?

সহসা আজ, এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল চন্দ্রার। কুড়ি বছর পর। মাঝের এই লম্বা সময়টার অভ্রর কথা যে তার কখনও মনে পড়েনি, এমনটা নয়। কিন্তু এই দংশন বোধহয় কখনও ছিল না। বরং এর মধ্যে সে একটু একটু করে একটা নিটোল সংসার গড়ে নিয়েছে। স্বামী ছেলে নিয়ে এখন তো দিব্যি এক নিশ্চিন্ততার দুর্গে তার বাস। কিন্তু অভ্র কী পেল জীবনে? চন্দ্রাকে ভালবেসে? ভাবনাটায় বুঝি চাপা তৃপ্তিও আছে, যা কিনা সময়কে অনেকটা পেরিয়ে এলে তবেই অনুভব করা যায়। কুয়াশামাখা হেমন্তের বিকেলটা যেন সরে যাচ্ছিল চন্দ্রার। পড়ন্ত সূর্যের মায়াবি আলোয়, ফাল্গুনের নরম বাতাসে, তার সামনে অভ্রর এই নতমুখে নিশ্চুপ বসে থাকা

হঠাৎই কেমন অলীক মনে হচ্ছে। এ যেন সুখও।

অনুচ্চ স্বরে চন্দ্রা ডাকল,—অভ্র?

—উঁ?

—একটা কথা বলব?

—কী?

—এখনও সময় যায়নি। একটা বিয়ে করে ফ্যালো।

—বলছ?

—হুঁ। শেষ বয়সে তো একটা সঙ্গীরও দরকার হবে।

—মা'ও ঠিক এ কথা বলত। আমি পাত্তা দিইনি। অভ্র নড়েচড়ে বসল,—ভাবতাম, মা আর আমি আছি, ভালই তো কেটে যাচ্ছে। একবারই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, শখ করে আবার কে ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় বলো? কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর থেকে সত্যিই খুব লোনলি ফিল করছি। বাড়ি ফিরে ভূতের মতো বসে থাকা...হয় টিভি, নয় বোতল...ভাল লাগে না। তাই মাসি যখন বলল, আমার জন্য একটা মেয়ে দেখে রেখেছে...আমি আর না করতে পারলাম না। ইনফ্যাক্ট, বিয়েটা করার জন্যই এবার আমার কলকাতায় আসা।

থতমত চন্দ্রার মুখ পলকে পাংশু। জোর করেও হাসি ফোটাতে পারছে না। কোনও ক্রমে বলল,—তাই বুঝি?...তা সে কী করে?

—একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়াচ্ছে। এখানেই। সল্টলেকে। বি-এড করা আছে, গোয়ায় গিয়েও চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না। অভ্র আবার ঘড়ি দেখল। একটু চিন্তিত মুখে বলল,—এতক্ষণে তো চলে আসার কথা। এই কফি শপে আমায় ওয়েট করতে বলেছিল।

কোথ্থেকে আচমকা একরাশ ক্রোধ এসে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল চন্দ্রার পাঁজরে। রাগটা কোনও মতে গোপন করল বটে, কিন্তু গলায় বাঁকা সুর এসেই গেল,—তোমাদের এখন কোর্টশিপ চলছে বুঝি?

—ধুৎ, এই বুড়ো বয়সে ওসব হয় নাকি।...জাস্ট পরস্পরকে একটু চিনে রাখা, এলোমেলো আড্ডা...। শ্রীপর্ণার তো তেমন একটা বন্ধুবান্ধব নেই, দুজনে মিলে তাই একটু সময় কাটানো...। নেক্সট উইকেই রেজিস্ট্রিটা

করে ফেলছি।

—ও। এবার চন্দ্রা ঘড়ি দেখল,—তোমাদের তা হলে আর ডিস্টার্ব করব না। উঠি।

—এই-ই, যাবে কোথায়, বোসো। শ্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

চন্দ্রার ভেতরটা চিড়বিড় করছিল। কিন্তু হুট করে চলে যাওয়াও তো বিসদৃশ দেখায়। অভ্র যদি বুঝে যায়, চন্দ্রা হিংসেয় জ্বলছে, নিশ্চয়ই হাসবে মনে মনে। হয়তো হবু বউকে চন্দ্রার চকিত পলায়নের গল্প শুনিয়ে দারুণ মজা পাবে।

চন্দ্রা নিজেকে স্থির করল। তবু ফাল্গুন হাওয়া তাকে যে কেন বেপথু দেয় বার বার? এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও? আশ্চর্য, যাকে সে একদিন স্বেচ্ছায় বাতিল করেছিল, দীর্ঘকাল যার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই, কালেভদ্রেও যার কথা মনে পড়ত কি না সন্দেহ, হঠাৎ সে আজ চন্দ্রাকে তোলপাড় করে দেয় কোন ম্যাজিকে? এক্ষুনি একটা ভূমিকম্প টুমিকম্প হলে ভাল হত কি?

এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা দিনের চেয়েও দীর্ঘতর। প্রতিটি মিনিট যেন বছরের চেয়েও লম্বা। সূর্যের গতি সহসা থেমে আছে। সময় কি এগোতে ভুলে গেল?

ঘড়ির কাঁটার হিসেবে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না চন্দ্রাকে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে গেছে অভ্রর শ্রীপর্ণা। কালো শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঁয়তাল্লিশ না হলেও চল্লিশ তো হবেই। ইশ্, এর নাম শ্রীপর্ণা? অভ্রর রুচিরও বলিহারি, এরকম একটা বউ পছন্দ হল? চন্দ্রার পরে? আবার ছোট করে বলে শ্রী! আদিখ্যেতা।

স্মিত মুখেই শ্রীপর্ণার সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা সারল বটে চন্দ্রা, তবে রইল না বেশিক্ষণ। দুটো চারটে মামুলি কথা বলে বেরিয়ে এল দোকান ছেড়ে। রাস্তায় এসে টের পেল শরীরটা কেমন কাঁপছে। মাথায় জ্বালা জ্বালা ভাব। অভ্র আজ এইভাবে তাকে প্রতারণা করল? প্রতারণাই তো। একটা

বিশ্বাসকে আস্তে আস্তে মনে গেঁথে দিয়ে হঠাৎ তা সমূলে উপড়ে ফেলাকে আর কী বলা যায়? কী অপমান, কী অপমান। চন্দ্রা কিনা ধরেই নিয়েছিল অভ্র এখনও তার বিরহে বিবাগী হয়ে আছে? কেমন ঝামা ঘষে দিল মুখে? কুড়ি বছর পর?

চন্দ্রা একটা গনগনে আঁচ নিয়ে বাড়ি ফিরল। অভ্রর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎটা যে নিছকই আকস্মিক, এর মধ্যে কারুরই কোনও হাত ছিল না, এই সোজা ব্যাপারটুকুও আর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে চিন্তা করতে পারছে না সে। মিছিমিছি টুবলুকে দাবড়াল খানিক, রাতের রুটি যথেষ্ট নরম হয়নি বলে বকুনি খেল মানিকের মা...। টিভি খুলে বসেছে। চ্যানেল ঘোরাচ্ছে বার বার, ভলিউম কখনও বাড়াচ্ছে তো কখনও কমাচ্ছে...। ঘুরেফিরে চোখের পাতায় অভ্র আর শ্রীপর্ণা। ছি, এই বউ নিয়ে গোয়ার বিচে বেড়াবে অভ্র? কুৎসিত। হাস্যকর।

সুবিমল যথারীতি দেরি করে ফিরল অফিস থেকে। নৈশাহার সেরে ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল নিয়মমতো। শোওয়ার ঘরে যাওয়ার আগে টুবলুকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল চন্দ্রা। এবার নাইন হবে টুবলুর, অ্যানুয়াল পরীক্ষা প্রায় এসে গেল, ছেলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছে এখনও। ভারী শান্ত ছেলে। বাবার কার্বন কপি। ঠিক এগারোটা বাজলেই লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়বে ছেলে, চন্দ্রা জানে। ঘরে এসে চন্দ্রা ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়াল। মুখে নাইটক্রিম ঘসতে ঘসতে শ্যেনদৃষ্টিতে নিজেকে নিরীক্ষণ করছে। মুখমণ্ডলের শুকনো শুকনো ছাপ একটা আছে হয়তো, তবে তার ত্বক এখনও যথেষ্ট মসৃণ, কপালে বলিরেখার আভাসমাত্র নেই। এমন কিছু মুটোয়ওনি সে। হাসলে এখনও ছোট্ট টোল পড়ে গালে। হানিমুনে ওই খাঁজটুকুতেই না ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি ফেলে পান করেছিল অভ্র!

আচমকা পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল চন্দ্রার। আবার অভ্র কী করবে? ওই আধবুড়িটার তোবড়ানো গালে ও কি...!

সুবিমল ল্যাপটপের সামনে বসে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই চোখ পড়েছে চন্দ্রায়। অবাক হয়ে বলল,—একা একা হাসছ কেন? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

চন্দ্রার হাসি আরও বেড়ে গেল। চপল স্বরে বলল,—এই জানো, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

—কী রকম?

—সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেখানে বহুকাল পর হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা। কে বলো তো?

—আমি কী করে বলব?

—গেস করো।

—আমার গেস-টেস আসে না।

—আহা, একটু গেস করোই না।

—তোমার অফিসের কেউ?

—উহুঁ।

—তা হলে বুঝি তোমার সেই পিসি? যিনি তিন নম্বর সেক্টরে বাড়ি করেছেন।

—তুৎ, ওরকম কেউ নয়। অভ্র।

—কে অভ্র?

—আহা, জানো না যেন! অভ্র...অভ্র...

—ও, তোমার সেই অভ্রকুমার?

—হ্যাঁ গো। অনেক গল্পটল্প করল, কফি খাওয়াল...। চন্দ্রার পেটে আবার সোডার বোতলের বুড়বুড়ি,—বুড়ো বয়সে তার ফের ছাদনাতলায় যাওয়ার সাধ জেগেছে। বিয়ে করতে এসেছে কলকাতায়। পাত্রীটিও দেখলাম। ম্যাগো, রূপের ধুচুনি।

—সে যার যাকে ভাল লাগে। সুবিমল লম্বা হাই তুলল। ল্যাপটপ অফ করতে করতে বলল,—যাক গে, কাজের কথা শোনো। শ্রীধর কিন্তু মার্চেই ফ্ল্যাটটা রং করছে। টুবলুর পরীক্ষা হয়ে গেলেই কাজ শুরু। দিন সাতেক মতো সময় লাগবে। তখন হয়তো তোমায় ছুটি নিতে হতে পারে, অফিসে বলে রেখো।...শ্রীধর এস্টিমেট যা দিল, হাজার পঁচিশ পড়ে যাবে। তাও খুব একটা বেশি নয়, কী বলো?

চন্দ্রার উচ্ছ্বাস ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেছে যেন। কতকাল পর

অভ্রর ক্ষণিক সান্নিধ্যে অজস্র রঙিন অনুভূতির খেলা চলছিল অন্তরে। কখনও বা মেদুর স্মৃতি, কখনও বা জয়ের পুলক, কখনও আবার অকারণ ঈর্ষার চোরা কামড়। সবই যেন ভোঁতা সহসা। বিবর্ণ। যেন নিস্তরঙ্গ পানাপুকুরে ঢেউ পড়েছিল একটা, ঘূর্ণি থেমে ফের সবুজ পানায় ঢেকে যাচ্ছে জলতল।

কোনও উত্তর দিল না চন্দ্রা। ভারী পায়ে বিছানায় এল।

ল্যাপটপের ডালা বন্ধ করে টেবিলে রাখল সুবিমল। ফ্যানের রেগুলেটার কমাল এক পয়েন্ট, দেখে নিল মশাবিতাড়ন যন্ত্রটি জ্বলছে কি না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল,—এবার ভাবছি রংগুলো একটু বদলাব। অফ হোয়াইট ঘেঁষা হলে ঘরের লাইট অনেক বাড়ে।

চন্দ্রা বালিশে মাথা রাখল। চোখ বুজেছে।

সুবিমল ফের বলল,—শেডকার্ডটা দেখেছ? ড্রেসিংটেবিলেই তো রাখা আছে।

চন্দ্রা অলস গলায় বলল,—দেখব'খন।

—যে রং পছন্দ, টিক মেরে দিয়ো কিন্তু। আমার মনে হয় অ্যাপল হোয়াইটটা আমাদের বেশ স্যুট করবে।

চন্দ্রা নিশ্চুপ। পাশ ফিরল। আবার সেই কিছু ভালো না-লাগা কুয়াশার ছোঁয়া। আবার সেই হেমন্তের বিকেল। ♣

সাদা গুঁড়ো লাল রং

চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে নীলা বলল,—সরস্বতীর শয়তানিটা দেখেছ! আজ আবার ডুব মারল।

ফাল্গুনের সকাল। শুভময় সোফায় বসে কাগজ গিলছিল। অনেকটা ঝুঁকে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। এমন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদেও তার কোনও হেলদোল নেই, হাতের ইশারায় নীলাকে বসতে বলল শুধু।

নীলার খটকা লাগল। বাজার যাওয়ার আগে ভারী অলস মেজাজে থাকে শুভময়, নীলার বিরক্তির উত্তরে পালটা চুটকি ছোঁড়াই তার স্বভাব। আজ শুভময়ের মুখভাব যেন কেমন কেমন!

নীলা জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছে?

—কেলো কেস। শুভময়ের স্বর চাপা,—সরোজ ধরা পড়েছে।

—কে সরোজ?

—আমাদের সরোজ। অফিসের সরোজ ব্যানার্জী। যার ছেলের পৈতেতে সেদিন খেয়ে এলে। কাল পার্ক স্ট্রিটের কোন বারে বসে পার্টির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল, ভিজিলেন্সের লোক গিয়ে...একেবারে কট্

রেডহ্যান্ডেড।

নীলা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। একেবারে সামান্যও নয়, আবার ভীষণও নয়। সরোজ ব্যানার্জী শুভময়ের পুরনো সহকর্মী, তবে তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ইদানীং দুজনেই এক অফিসে পোস্টেড বলে শুভময়ের মুখে নাম শুনেছে সরোজের, তবে দেখেছে সাকুল্যে ওই একবারই। ওই পৈতের দিনই। মুখটাও মনে পড়ে গেল নীলার! ফর্সা, গোলগাল, মাথায় অল্প টাক, চোখ দুটো হাস্যময়। কথাবার্তায়ও ভারী অমায়িক, নীলাদের খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ তদারকি করছিল। মাংস পোলাও শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কেটারারকে ডেকে লাল্টুর পাতে জোর করে দুটো ফিশফ্রাই চাপিয়ে দিল। বেচারা লাল্টু একটা ফ্রাই তো ছুঁতেই পারল না। দেখে ভদ্রলোকের কী হাসি! কী মিসেস চক্রবর্তী, আজকাল ইয়াং ছেলেরাও ডায়েটিং শুরু করেছে নাকি! আমরা তো ওই বয়সে...। শুভময় যে এত মুখের রক্ত তুলে পয়সা রোজগার করছে, খাবেটা কে!

সেই লোকটা ধরা পড়েছে!

নীলা অবিশ্বাসের সুরে বলল—যাহ্।

—যা নয়, হ্যাঁ। থার্ড পেজের লাস্ট কলমটা দ্যাখো।

খবরের কাগজখানা হাতে নিল নীলা। তেমন বড় কিছু খবর নয়, জোর সাত-আট লাইন। তবে তাকালেই হেডিংটা চোখে পড়ে যায়—ঘুষ নিতে গিয়ে সরকারি অফিসার ধৃত। ভেতরের লাইনের খুদি খুদি অক্ষরগুলো পড়ছে নীলা। চোখ কুঁচকে, দৃষ্টি থেকে কাগজ বেশ খানিক তফাতে রেখে। সম্প্রতি নীলার চোখে চালশে এসেছে, চশমা করানো হয়নি। গড়িমসি। কী হবে ছাতার মাথা চোখে দুটো ঠুলি এঁটে! সিনেমা টিভি তো খালি চোখেই দিব্যি সাফ দেখা যায়।

শুভময় বড় বড় চুমুক দিচ্ছে কাপে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ছি ছি ছি, মানইজ্জত সব চলে গেল। কোথ্থাও আর মুখ দেখানো যাবে না।

—তোমার কী? পড়া থামিয়ে নীলা টেরচা চোখে তাকাল,—তোমাকে ধরেছে?

—এই না হলে মেয়েছেলের বুদ্ধি! দেখছ না, অফিসের নাম ধাম সব

ছেপে দিয়েছে!

—তো? বিশ্বসুদ্ধ সবাই বুঝি তোমার অফিসের নাম জেনে বসে আছে?

—চেনা লোকেরা তো জানেই। শুভময় গোঁজ মুখে কিংসাইজ সিগারেট ধরাল,—বাকিরাও জানে। না জানার ভান করে।

—জানলে জানে। অত কেয়ার করার কী আছে?

কথাটা নীলা বলল বটে, তবে স্বরে যেন তেমন প্রত্যয় ফুটল না। আশঙ্কাটা তার বুকেও ছ্যাঁক করে উঠেছে। এই না বাপের বাড়ি থেকে ফোন এসে পড়ে। বাবা দাদা করবে না, তারা যথেষ্ট বুঝদার। কিন্তু বউদি? তা ওই কৌতূহলী মার্জারীকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্য আছে নীলার। স্ট্রেট কাট বলে দেবে, চোর-ডাকাত আজকাল কোন অফিসে নেই ভাই! আগেও ছিল, চিরকালই থাকবে। উৎকোচ শব্দটা বাংলা নয়, সংস্কৃত।

শুভময় কাকে যেন ফোন করতে উঠল। বোধহয় অফিসের কোনও বন্ধুটন্ধুকে। নীচুগ্রামে বাক্যালাপ চলছে, এত নীচু যে স্বরযন্ত্রের ওঠা-নামাকে অলীক বলে ভ্রম হয়। ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট ধরাল, দু-টান দিয়েই নিবিয়ে দিল। এক হাতে কপাল চেপে বসে আছে। হঠাৎ পাড়ার থিয়েটারের স্বগতোক্তির ঢং-এ বলে উঠল,—এক্কেবারে ক্যালাস্। মাথামোটা। একুশ বছর চাকরি হয়ে গেল, অ্যাদ্দিন পর ধরা পড়ার কোনও মানে হয়?

আক্ষেপের মমার্থ সঠিক উদ্ধার করতে পারল না নীলা। আগে ধরা পড়লে তার বুঝি কোনও মানে হত?

চিন্তিত মুখে নীলা প্রশ্ন করল,—এখন তা হলে কী হবে?

—কার্? সরোজের? শুভময় ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—ধরে নাও, চাকরি গন্।

—চাকরিই গন্?

—আপাতত সাসপেন্ড হবে, কেস চলবে...যদি তরে গেল তো ভাল, নইলে....হাতে নাতে ধরা পড়েছে, এ কেসে বাঁচা খুব মুশকিল।

—ইশ্, ফ্যামিলিটা তো তাহলে ভেসে গেল!

—হুম। অত সুন্দর সুন্দর দুটো ছেলেমেয়ে....তুমি তো দেখেছ, ছেলেটা সামনের বছর সি বি এস সি দেবে। মেয়েটাও কী একটা কনভেন্টে পড়ে।

ক্লাস এইট। ভাইবোন দুটোই নাকি লেখাপড়ায় খুব ব্রিলিয়ান্ট।

—মেয়েটার কথাবার্তাও খুব মিষ্টি। কী সুন্দর প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে সকলকে আপ্যায়ন করছিল।

—মেয়েটার চোখে কী একটা প্রবলেম হচ্ছে। সরোজ মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। গরমের ছুটিতে ম্যাড্রাসে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবে বলছিল।

—আহারে। নীলার মন দুঃখে ভরে গেল—ওদের বাড়িতে একটা ফোন করো না। তোমার অ্যাদ্দিনের কলিগ, একটা তো খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

এক মুহূর্ত থমকে থেকে শুভময় বলল,—খেপেছ? এই সময়ে? কী করতে কী হয়ে যাবে...। থলি দাও, বাজার সেরে আসি। আজ একটু সকাল সকাল অফিস বেরোব।

পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে গেল শুভময়।

লাল্টু এখনও ঘুমোচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আর তিন হপ্তা মতো বাকি, রাত জেগে পড়ে ছেলে, উঠতে বেলা হয়। নীলা ছেলের ঘরে ঢুকে চারদিকের ছত্রখান চেহারাটা দেখল একবার। টেবিল অগোছালো, জামাকাপড় লুটোচ্ছে মেঝেয়, খাটময় বইখাতা। বালিশের পাশে ওয়াকম্যান। গান শুনতে শুনতে অঙ্ক কষে লাল্টু, ওতে নাকি মনোযোগ বাড়ে। ছেলে শুয়েও আছে দ্যাখো কেমন কুঁকড়ে-মুকড়ে, যেন শিশুটি! আপনমনে হাসল নীলা, দ্রুত হাত চালিয়ে মোটামুটি বিন্যস্ত করল ঘরটাকে। বেরিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার মুখে কী ভেবে একটু থামল। সেন্টার টেবিল থেকে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে সোজা চালান করে দিল নিজেদের ঘরের বিছানার নীচে। শুভময়দের খবরটা লাল্টুর না দেখাই ভাল। এমনি অবশ্য ছেলের কাগজ পড়ার তেমন নেশা নেই, ওই খেলার পাতাই যা দেখে দু চার মিনিট। দরকার কি, যদি চোখে পড়ে যায়! কী ভাবতে কী ভাববে, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন জুড়বে, মিছিমিছি বিব্রত হবে শুভময়।

নীলা কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ল। সিঙ্কে গত রাতের বাসনের কাঁড়ি, একটা একটা করে মাজছে। চেপে চেপে। ঘষে ঘষে। সরস্বতীটা মহা নেমকহারাম। এত টাকা মাইনে দেওয়া হয়, তবু কথায় কথায় কামাই, কথায় কথায় কামাই। এ মাসে ছাড়বে না নীলা, মাইনে কাটবে। কাজ ছেড়ে দেয় দিক,

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। চড়াং করে মনে পড়ল, কাপড়ের স্তূপ ভেজানো রয়েছে বাথরুমে। হা ঈশ্বর, ওসব এখন কে কাচে, কে মেলে! কদ্দিন ধরে শুভময়কে বলছে, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো...! আচ্ছা, সরোজ ব্যানার্জীর ছেলেমেয়ের স্কুলে খবরটা জানাজানি হলে কী হবে? ইশ, বাচ্চা দুটোর ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। লাল্টু ঘঙ-ঘঙ কাশছে কেন? উঠে পড়েছে কি? সকালের দিকে এখনও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে, ফুল স্পিডে ফ্যান না চালিয়ে ঘুমোয় না ছেলে, পরীক্ষার আগে অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে বসে। কী ব্রেকফাস্ট করা যায় আজ লাল্টুর জন্য? সেই টোস্ট ওমলেট কলা? নাকি চিকেন স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবে? ফ্রিজে তো মুরগি সেদ্ধ করা আছেই। দুধ খাওয়া নিয়ে বড় নকড়া-ছকড়া করে লাল্টু, আজ একটু চকোলেট গুলে দিতে হবে। সরোজ ব্যানার্জী কি বারে মদ খুব গিলেছিল? মনে হয়, তাই-ই। মোদোমাতালরা ভারী অসাবধান হয়। ভাগ্যিস শুভময়ের ওই কুঅভ্যাসটি নেই! ও হরি, শুভময়ের ভাতও তো বসাতে হবে। বাজার থেকে মাছ আনলে নো প্রবলেম। দু পিস ভেজে দিলেই সোনামুখ করে খেয়ে নেবে শুভময়। যদি মাংস আনে? কিংবা পাবদা, কি চিতল? কাল রাতে লাল্টু মালাইকারির কথা বলছিল, শুভময়ের কানে গেছে, যদি চিংড়ি নিয়ে হাজির হয়? দেখা যাবেখন। আলু-টালু ভেজে দিলেও চলবে, সঙ্গে ঘি। সরোজবাবুর বউ কি কাল রাতেই খবর পেয়েছিল? পুলিশ বোধহয় জানিয়ে দেয়, নাহলে সারা রাত...!

বিজবিজে ঘামের মতো সরোজ ব্যানার্জীর ভাবনাটা কিছুক্ষণ লেগে রইল নীলার মস্তিষ্কে, তারপর উবে গেল। কত কাজ হাতে, কত কাজ!

চিন্তাটা ফিরে এল সন্ধেবেলা। শুভময় অফিস থেকে ফেরার পর।

শার্ট ছাড়তে ছাড়তে শুভময় বলল,—বুঝলে গো, যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই। কেস পুরো জন্ডিস হয়ে গেছে। সরোজ আজ বেল পায়নি।

নীলা হাঁ হয়ে গেল—কেন?

—পেল না। সাত দিন এখন পি.সি.-তে থাকবে। পি.সি. মানে জানো তো? পুলিশ কাস্টডি। থানার হাজত। সাত দিনে রস একেবারে নিংড়ে নেবে।

—সে কী! একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে চোরছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে রাখবে?

—কপাল। শুভময় হাত ওল্টাল,—যা ইন্টারোগেশান চলবে না!...পেট থেকে সর্ষেদানা পর্যন্ত বার করে আনবে।

নীলা ঘাবড়ে যাওয়া মুখে বলল,—তোমাদের কথা কিছু বলে দেবে না তো সরোজবাবু?

—ধুৎ, আমাদের কথা কী বলবে?

—না, মানে তোমরাও তো...। নীলা বুদবুদটা গিলে নিল।

লাল্টু টিউটোরিয়ালে, আটটা সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। এখন এই চার দেওয়ালের মধ্যে লুকোছাপা হুশহাশ না করলেও চলে। শুভময় হো হো করে হেসে উঠল—দূর দূর, আমরা কি আয় তবে সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি করে কাজ করি নাকি? যার যার, তার তার। একজনের সিক্রেট অন্যজন জানবে কী করে?

আশ্বস্ত নীলা রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল চড়াল। সন্ধের পর শুভময় চা তেমন পছন্দ করে না। বিকেলে একবার বেরিয়েছিল নীলা, টুকটাক সাংসারিক জিনিসপত্র কিনতে। গোটা কয়েক বার্গার এনেছিল সেসময়ে, হট অ্যান্ড কোল্ড থেকে। দুটো বার্গার বার করে ওভেনে গরম করতে দিল।

সরোজের থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই বুঝে সরোজের ওপর আবার যেন একটু মায়া জন্মাচ্ছিল নীলার। দুঃখী দুঃখী গলায় প্রশ্ন ছুড়ল—ওদের বাড়ির লোকের খবর কিছু পেলে?

—শুনলাম তো সরোজের মিসেস কোর্টে গিয়েছিল। ভাল উকিল টুকিলও লাগিয়েছে। নো রেজাল্ট। বউটা নাকি খুব কান্নাকটি করছিল কোর্টে।

—তোমায় কে বলল?

—অনিমেষ, আবার কে। ও তো আজ সারাক্ষণ কোর্টে ছিল।

অনিমেষকে ভালই চেনে নীলা। সে নাকি খুব দাপুটে অফিসার। শুভময়দের অ্যাসোসিয়েশানের একটা মাথাও বটে। শুভময় বলে, অনিমেষ ভারী আপরাইট মানুষ। ঠিকাদার কনট্রাক্টর ছাড়া কারুর কাছে সে মাথা নোয়ায় না। এমনকী নিজের বাবা মার কাছেও না। পাছে নত হতে হয় সেই কারণে মিনিবাসে পর্যন্ত ওঠা ছেড়ে দিয়েছে অনিমেষ, গাড়ি-ট্যাক্সি ছাড়া সে

দু পা'ও চলে না। অফিস কলিগদের বিপদে-আপদে সব সময়ে অনিমেষ পাশে থাকে। তাই চাকরিতে ঢের জুনিয়ার হলেও অনিমেষের ওপর শুভময়ের গভীর শ্রদ্ধা, নীলা জানে।

কফি আর বার্গার নিয়ে শোওয়ার ঘরে এল নীলা। মুখ হাত ধুয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে শুভময়, গড়াচ্ছে বিছানায়। খাবারের ট্রে বিছানার পাশের টেবিলে রাখল নীলা, বেতের গোল মোড়া টেনে খাটের ধারে বসল,—আর কী বলল অনিমেষ?

—কী আর বলবে! দুঃখ করছিল। সরোজের মিসেসকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল...

—কাল ঠিক কী ঘটেছিল কিছু শুনলে?

—ও হ্যাঁ, সে তো এক কেচ্ছাকেলেঙ্কারি কাণ্ড। শুভময় তড়াং করে উঠে বসেছে। একটা বার্গার হাতে তুলে নিল,—ঠক্কর ব্রাদার্স বলে একটা পার্টির লাইসেন্স নাকি সরোজ অনেকদিন ধরে আটকে রেখেছিল। দরেটরে বনছিল না বোধহয়। ওই শালারাই কাল টোপ দিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, গ্রিন হেভেনে। পার্টির কাছ থেকে একশো টাকার একটা বান্ডিল নিয়ে যেই না সরোজ ব্রিফকেসে ভরতে গেছে, ওমনি ভিজিলেন্সের লোক এসে ক্যাঁক। সরোজ নাকি নার্ভাস হয়ে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, বাট ততক্ষণে দা গেম ইজ ওভার। টেবিলে জলের গ্লাস ছিল, সরোজের হাত ধরে গ্লাসে চুবিয়ে দিয়েছে, দেন অ্যান্ড দেন গ্লাসের জল লাল।

নীলা মুখের হাঁ বন্ধ করতেও ভুলে গেল—বুঝলাম না।

—তুমি একটা ট্যাড়োশ! ডিটেকটিভ সিরিয়ালে দ্যাখো না, অপরাধীর দুষ্কর্ম প্রমাণ করার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগে? সরোজের হাতের ছাপ তোলার জন্য নোটের গায়ে এক ধরনের গুঁড়ো লাগানো ছিল। সাদা-সাদা কী যেন নাম! মিনপ্‌থেলিন না ফিনপ্‌থেলিন। লাল্টু বলতে পারবে।

—আহ্, লাল্টুকে এর মধ্যে টানা কেন!

—না, মানে...লাল্টু সায়েন্সের স্টুডেন্ট তো, হয়তো জিনিসটার নাম জানে।...হ্যাঁ, যা বলেছিলাম। ওই গুঁড়োমাখা হাত জলে ডোবালেই জল নাকি লাল হয়ে যায়। এই জন্যেই না বলে কট্ রেডহ্যান্ডেড। এখন আর সরোজ ডিনাই করতে পারবে না। সাক্ষীরা ছিল, তারা দেখেছে। সঙ্গে নোটেও

আঙুলের ছাপ।

নীলার হঠাৎ কেমন শীত শীত করে উঠল। কী সব্বোনেশে ব্যাপার! গুঁড়োটাও সাদা সাদা, জলেরও কোনও রং নেই, অথচ ওই গুঁড়োমাখা হাত জলে পড়লেই...!

অস্ফুটে নীলা বলল,—ধরারও এত সব প্যাঁচ-পয়জার আছে নাকি?

—আছে বৈকি। ফাঁদ কি এক রকম হয়?

—তুমি জানতে ব্যাপারটা?

শুভময় উত্তর দিল না। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরিয়েছে। চোখ ঘুরছে এদিক ওদিক। খাটে আলগা ঠেসান দিল,—তবে আমরাও ছাড়ছি না। ওই ঠক্কর ব্রাদার্সকে আমরা এমন শিক্ষা দেব...! হতে পারে সরোজের সঙ্গে তার ইয়ে চলছিল। হতে পারে সরোজেরই দোষ। বেশি স্কুইজ করার চেষ্টা করছিল। বাট দিস ইজ আনএথিকাল।

—কোনটা আনএথিকাল? স্কুইজ করা?

—উঁহু, ওই ধরিয়ে দেওয়াটা। তোরা টাকা দিস কেন বাছা? তোরা হারামজাদা চোর নোস? রবি ঠাকুর কী বলেছেন? অন্যায় যে করে, অন্যায় সে সহে...! শুভময় স্পষ্টতই উত্তেজিত,—আমরা সইব না। ছুটির পর অনিমেষকে নিয়ে বসেছিলাম। ডিসিশন হয়ে গেছে। এককাট্টা হয়ে ঠক্কর ব্রাদার্সকে বয়কট করব আমরা। দেখি শালা কী করে ব্যবসা করে খায়! দরকার হলে অন্য পার্টিদেরও সমঝে দেব।

—সব্বাই তোমাদের কথা মানবে? তুমিই তো বলো, তোমাদের অফিসে যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে চলে?

—এটা মানবে। মানতেই হবে। সারভাইভালের প্রশ্ন না? ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল।

রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না নীলার। এলোমেলো কথা ভাবছিল। শুভময়ের কথা, সরোজ ব্যানার্জীর কথা...। নীল অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছে সরোজ ব্যানার্জী বসে আছে হাজতে, তার বউ ছেলেমেয়ে মুখ কালো করে দেখতে এসেছে তাকে, দাঁড়িয়ে আছে গরাদের এপারে। কী লজ্জা! কী অপমান! কে বেশি হেনস্থা হচ্ছে? সরোজ ব্যানার্জী, না তার

বাড়ির লোকজন? কেন এত লোভ করল সরোজ ব্যানার্জী? মেয়ের চিকিৎসার জন্য? শত বিপদে পড়লেও এমনটা করবে না শুভময়। মুখে যতই তড়পাক, শুভময় কক্ষনো খামচা-খামচি করে না। কাজ হাসিল হলে যে যা ভাল মনে দেয়, শুভময় তাতেই খুশি। সারা মাস খেটে ক'পয়সাই বা পায় শুভময়! কারুর পাকা ধানে মই না দিয়ে কটা টাকা বাড়তি আনলে যদি একটু বেশি সুখ কেনা যায়, সেটা কি খুব দোষের?

নীলা টের পেল শুভময় নড়াচড়া করছে। মৃদু স্বরে বলল,—ঘুমোওনি?

—গরম লাগছে।

—গরম, না হাতি! নীলা আলগা ছুঁল স্বামীকে,—উল্টোপাল্টো ভাবনা করছ তো?

—নাহ্ কী আর ভাবব...

শুভময় চুপ করে গেল। ঘর যেন নিঝুম হঠাৎ। পাখা ঘুরছে সোঁ সোঁ, একঘেয়ে চাপা শব্দে বেড়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্য। অন্ধকারে সময়ও যেন সহসা প্রলম্বিত হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর শুভময়ই কথা বলল,—শুনছ?

—উঁ।

—এবার বোধহয় আমাদের একটু রয়ে সয়ে চলার সময়।

নীলা ছোট্ট হাই তুলল,—হঠাৎ এ কথা?

—বোঝোই তো, সারাক্ষণ সকলের চোখ টাটাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি, সব্বার।

—তো?

—আড়ালে আবডালে কে কী ফিসফিস করে ঠিক নেই...

—তো?

—তো তো করছ কেন? সব কথা কি খুলে বলতে হবে?

এই অন্ধকারও যেন সব কথা খুলে বলার জন্য যথেষ্ট আড়াল নয়!

নীলা ভার ভার গলায় বলল,—ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? সোজাসুজি বলো। কী বড়মানুষিটা করি আমরা যে লোকের চোখ টাটাবে?

—আমরা নয়, তুমি। কলকাতায় এসেই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে পাগল হয়ে

গেলে। ঠিক আছে, চিরটা কাল বাইরে বাইরে ঘুরেছি, আজ এখানে বদলি, কাল ওখানে। এবার যখন কলকাতায় মোটামুটি থিতুই হয়েছি, একটা নয় নিজের আশ্রয় বানালামই। কিন্তু তারপর?

—কী তারপর?

—লিস্ট দিতে হবে? আজ হাড়ে আদা দিয়ে দিয়ে চালু ফ্রিজ পাল্টে গন্ডার সাইজের ফ্রিজ কিনছ, কাল কালার টিভির মডেল বদলাচ্ছ। কথায় কথায় গয়না গড়াচ্ছ, শাড়ি কিনছ...এই সেদিন পনেরো হাজার দিয়ে নতুন সোফা কিনলে...পরশুদিনই তুমি সাড়ে তিন হাজার দিয়ে একটা বালুচরি কেনোনি? আবার বউদিকে ফোনে ঘটা করে দাম জানাচ্ছিলে! পৃথিবীসুদ্ধু লোক কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, অ্যাঁ?

—সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ? ছেলেকে আহ্লাদ করে ভিসিআর কিনে দিল কে? প্যাকেট প্যাকেট বিদেশি সিগারেট ওড়াচ্ছ...বোন ভগ্নিপতিকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে যাবে, টুরিস্ট বাস নয়, গাড়ি ভাড়া করে চলো...এগুলো বুঝি কারুর নজরে পড়ে না?

—ঠিক আছে, নয় আমরা দুজনেই করি। এবার থেকে একটু সমঝে বুঝে চললে...

—থামো তো। রামের ঠ্যাং ভেঙেছে বলে কি শ্যামকেও খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে? নীলা খ্যাক খ্যাক করে উঠল,—পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন দেখিও না। সব্বার সব আমার জানা আছে। ঘাঁটলে প্রত্যেকের গু থেকেই গন্ধ বেরোবে।

—সকলের গু তো এক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছে না। যারটা নিউজ হয়েছে, তারটা নিয়েই এখন সকলে খোঁচাখুঁচি করবে।

—রাত দুপুরে সতীপনার নাটক শুরু করলে কেন বলো তো? নীলা মটকা মেরে উল্টো দিকে পাশ ফিরল। গরগর করতে করতে বলল,—বেশ তো, কাল থেকে তেলাপিয়া নাইলন ট্রিকা ছাড়া মাছ আনবে না। ঝিঙে কুমড়ো দিয়ে থলি ভরতি কোরো, তাই তোমাদের পাতে ঢেলে দেব। দেখি, বাপ ছেলের কদ্দিন রোচে!

—খচে যাচ্ছ কেন? ভালর জন্যই তো বলছি। শুভময় নীলাকে টানার চেষ্টা করল,—সরোজটা এমন একটা স্টুপিডের মতো কাজ করল...

নীলা ঠেলে সরিয়ে দিল শুভময়কে। সে যতবার শুভময়কে সরোজের থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে, ততই নিজেকে সরোজের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে শুভময়।

কে স্টুপিড? সরোজ, না শুভময়?

দুটো দিন যেতে না যেতে সব আবার স্বাভাবিক। অথবা গয়ংগচ্ছ।

সরোজ সংবাদের আর কোনও প্রচার নেই, সকালবেলা অলস মেজাজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের পাতা উল্টোতে পারছে শুভময়। বাজার থেকে চিতল চিংড়িও আসছে নিয়মিত। আসছে মুরগি মাটন, আসছে পনির কলা আপেল আঙুর বেদানা। স্বামী আর ছেলের জন্য নিত্যনতুন খাবার বানাচ্ছে নীলা, পুষ্টি আর জিভ দুদিকেই খেয়াল রেখে। পায়েস পুডিং কাবাব চাঁপ...। একদিন দুপুরে দোতলার ফ্ল্যাটের সেনগিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে নিউমার্কেট চষল নীলা, চব্বিশ মিটার পর্দার কাপড় কিনে আনল। প্রায়শই বিকেলে পার্টির গাড়ি নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শুভময়কে, ঘরে ঢুকেই ঘটাং-ঘটাং আলমারি খুলছে শুভময়। সুরেলা বাজনাওলা নতুন গ্যাস-লাইটার শোভা পাচ্ছে শুভময়ের পকেটে। উপহার।

এর মধ্যে শুভময় একদিন জানাল সরোজ জামিন পেয়ে গেছে। মুক্ত হয়েই সরোজ পরদিন অফিসে এসেছিল, গুলি ফুলিয়ে বলে গেছে আরও বড় উকিল লাগাবে। সেই উকিল নাকি কোর্টে ভিজিলেন্স অফিসারদের প্যান্টজামা খুলে নেবে।

শুনে নীলার কী হাসি। যেন কল্পচোখে ভিজিলেন্সের দুঁদে লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে। জাঙ্গিয়া পরে কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মলিন মুখে চোখ মুছছে লোকগুলো।

হাসতে হাসতেই স্বামীকে চিমটি কাটল,—তাহলে যে তুমি বললে সরোজবাবুর দফা রফা?

—সেরকমই তো মনে হয়েছিল। অবশ্য ওটা সরোজের বারফাট্টাইও হতে পারে! চালবাজ টাইপের লোক, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

—উহুঁ, নিশ্চয়ই কোনও ক্যাচ আছে। দ্যাখো হয়তো তোমাদের

ভিজিলেন্সকেই ম্যানেজ করে ফেলেছে সরোজবাবু। ভিজিলেন্সের লোকেরা তো আর কনখল থেকে নৌকো ভাসিয়ে কলকাতায় আসেনি। তেমন টাকনাদার চার খাওয়ালে তাদেরও গাঁথা যেতে পারে।

—আই ডাউট। ওখানে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে কি? সত্যি খুঁটি যদি ওর থাকে, অন্য জায়গায় আছে। মিনিস্ট্রি মহলে। ওর ভায়রাভাই নাকি কোন এক মন্ত্রীর পি.এ.-র বোতলবন্ধু। সে কোনও কলকাঠি নাড়লেও নাড়তে পারে।

নীলা প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করল ওপর মহলে তাদের কেউ জানাশুনো আছে কিনা, হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ধুস্, কেন এত ভাবছে সে? শুভময় তো সরোজ নয়।

অন্য কথায় গেল নীলা,—তোমাদের সেই ঠক্কর ব্রাদার্সকে টাইট দেওয়ার কী হল? ছেড়ে দিলে?

—সে হারামজাদা তো এখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে। অফিসের ত্রিসীমানা মাড়াচ্ছে না। সেন্স অফ গিল্ট্। অপরাধবোধে ভুগছে। শুভময় ঠোঁট টিপল,—তবে একটা মোক্ষম উপকার হয়েছে। বলো তো কী?

নীলা ফ্যালফ্যাল চোখে দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

—এই জন্যই তো তোমায় ট্যাঁড়োশ বলি। শুধু ট্যাঁড়োশ নয়, তুমি একটি চালকুমড়ো। অন্য পার্টিরা এখন আতঙ্কে কেঁচো হয়ে থাকে, বুঝলে? টুসকি বাজালেই অ্যামাউন্ট গুঁজে দেয়। শুভময় চোখ মারল,—রেটও চড়েছে।

ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নীলা। মঙ্গলময় তিনি, যা করেন মানুষের ভালর জন্যই করেন। সরোজ ব্যানার্জীর ধরা পড়াটা শাপে বর হয়ে গেল।

নাহ্, শুভময় নয়, সরোজটাই স্টুপিড। শুভময় ধরা পড়লে সরোজ এই পরিস্থিতিটার ফায়দা লুটতে পারত।

পরের পরের দিন ছবিটা আমূল বদলে গেল। অফিস থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল শুভময়। মুখ শুকিয়ে আমসি, ঘামছে দরদর। নীলাকে শোওয়ার ঘরে টেনে নিয়ে এসে বলল,—খুব খারাপ খবর। শিয়রে শমন।

নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল,—কী হয়েছে?

—ঠক্কর ব্রাদার্স মেইন কালপ্রিট নয়। সর্ষের মধ্যে ভূত। আমাদের ডিপার্টমেন্টই বেশ কয়েকজনকে বাঁশ পুরে দিয়েছে। নাম পাঠিয়ে দিয়েছে

ভিজিলেন্সে। সেই মতোই আমাদের অনেক পার্টিকে ট্র্যাপ করেছিল ভিজিলেন্স, আলটিমেটলি ঠক্কর ব্রাদার্সই দাবার ঘুঁটি হতে রাজি হয়। সরোজ ব্যানার্জীর ভিকটিম হওয়াটা মিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট। এটা সরোজ না হয়ে অন্য কেউও হতে পারত।

—যাহ্। নীলা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল,—গুজব-টুজব নয় তো?

—একদম না। এ হল গিয়ে একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। আমাদের অফিসের মিসেস মুখার্জিকে তো চেনো। বেঁটে মতন, গোলগাল মুখ, চশমাপরা, টিকটিকির ল্যাজের মতো চুল...তোমার সঙ্গে রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংশনের দিন আলাপ হয়েছিল...

—বুঝেছি। যে মহিলা হাঁসের মতো ঘুষ খায়, তাই তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নারী প্রগতি! সমান অধিকার! মেয়েছেলেরাই বা কম যাবে কেন!...ওই বলছিল।

—সে জানল কোথ্থেকে?

—ওরেব্বাস, ওর যা দারুণ নেটওয়ার্ক। হেডকোয়ার্টারে রেগুলার বাতাসা ছড়ায়, অনেক পোষা গুপ্তচর আছে। শুভময় বড় করে শ্বাস টানল, —এ তো হল খারাপ খবরের ট্রেলার। আসল দুঃসংবাদটি শুনলে পিলে চমকে যাবে। ভিজিলেন্স সাসপেক্ট করছে ওই ঠক্কর ব্রাদার্সের মেথডে আর কাউকে পাকড়াও করা যাবে না, তাই এবার তারা সরাসরি বাড়িতে হানা দেবে। মানে আর যাদের নাম আছে, তাদের বাড়িতে। হঠাৎ করে। কাকপক্ষীও টের পাবে না।

নীলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—কার কার নাম আছে?

—সে লিস্ট তো আর অফিসে টাঙিয়ে দেয়নি। মিসেস মুখার্জির খোঁচড়রাও পুরো ডিটেলস জানে না। তবে...

—কী তবে?

—লিস্‌ন নীলা। শুভময়ের স্বর গম্ভীর,—সাবধানের মার নেই। ঘরদোর ক্লিন রাখাই ভাল।

ইঙ্গিত বুঝল নীলা। এত হিসেবি, এত সতর্ক বলেই না শুভময়ের ওপর নীলার এত আস্থা। এই গুণের জন্যই শুভময়রা কখনও সরোজ হয় না।

তবু নীলা মিনমিন করল,—আমাদের কী এমন হিরেজহরত আছে?

—নো। যেটুকু না থাকলেই নয় সেটুকুই শুধু বাড়িতে থাকবে। বাকি সব লকারে চালান করে দাও।

—লকারও যদি দেখতে চায়?

—আহ্, ব্যাঙ্কের লকার নয়। অনিমেষ আমাকে একটা প্রাইভেট লকারের সন্ধান দিয়েছে, বড়বাজারে।

—সেফ্ তো? চোটপোট হয়ে যাবে না তো?

—আরে না না। মিনিস্টারদের সুইস ব্যাঙ্কের থেকেও সেফ।

দরজায় ছায়া। নীলা চমকে তাকাল। লক্ষ্মী। সরস্বতীর বদলে কাজে ঢুকেছে। সকালবেলা আসে, সন্ধেয় যায়।

লক্ষ্মীর দুহাতে কফির পেয়ালা। ইশারায় টেবিলে রাখতে বলল নীলা। রেখেও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

নীলার ভুরু জড়ো হল,—কিছু বলবি?

—রাতের জন্য ক'টা রুটি করব আজ?

—যা করিস তাই করবি। বারো চোদ্দোটা।...লাল্টুকে জলখাবার দিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—কী করছে দাদা? পড়ছে?

—হ্যাঁ।

দু এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মী চলে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখল নীলা। মেয়েটার আড়িপাতার অভ্যেস নেই তো? কী নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল! শুনেছে কি কিছু?

নীলা দরজায় এসে গলা ওঠাল,—লক্ষ্মী শোন।...রুটি করতে হবে না। আটাটা মেখে রেখে চলে যাস।

শুভময় পোশাক বদলে দ্রুত কফি শেষ করল। তারপর আলমারি খুলেছে। কী একটা ফাইল দেখছে উল্টেপাল্টে।

নীলা বকের মতো গলা বাড়াল,—কী ওটা?

—অ্যাসেট স্টেটমেন্টের কপি। দেখছি কী কী শো করা আছে।...নতুন ফ্রিজ-টিভি কিছুরই তো এনট্রি নেই দেখছি।

—ও দুটো পুরনোর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে কিনেছ। তাও ক্যাশে নয়, মাসে মাসে ইনস্টলমেন্ট গুনতে হয়।...ও নিয়ে কেউ ঝামেলা করবে না।

—ফ্যাচ-ফ্যাচ কোরো না। কিস্তির মাল বলে কি সাত খুন মাপ? মাসে মাসে কত করে কিস্তি গুনতে হয় সেটা ওরা দেখবে না? যদি জিজ্ঞাসা করে মাসে সাড়ে দশ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে একত্রিশশো টাকা ইনস্টলমেন্ট গোনেন কী করে? মনে রেখো, সঙ্গে আবার ফ্ল্যাটের লোনের আঠাশশো আছে।

—বলবে, পেটে কিল মেরে চালাই।

—ও রকমই কিছু বলতে হবে। মানলে হয়।...সে কি এই ফ্ল্যাট দেখেও মানবে এটা সাড়ে তিন লাখের মাল?

—বারে, প্রোমোটার তো কাগজেকলমে দাম দেখিয়েই দিয়েছে। তোমারও সমস্ত পেপার সাবমিট করা আছে।

—হ্যাঁ, ওই যা রক্ষে। তবে ওরা কি বুঝবে না কতটা দুধে কত জল মেশানো হয়!...কিন্তু কিছু করতে পারবে না।...ফ্রিজ-টিভির ক্যাশ মেমোগুলো অন্তত বার করে রাখো।

কোনও কাগজপত্রই নীলার সেভাবে গোছানো থাকে না। কোনওটা খুচরো কয়েনের বাক্সে, তো কোনওটা শাড়ির ভাঁজে...। তবে সবই পাওয়া গেল।

শুভময় চোখ কুঁচকে বিল মেমো দেখছে, নীলা ফস করে বলে উঠল,—তোমার ভি.সি.আর.-এর কোনও কাগজপত্র কিন্তু আমার কাছে নেই।

থাকার কথাও নয়। ভি.সি.আর.টি খাঁটি জাপানি জিনিস, খিদিরপুরের চোরাই মার্কেট থেকে কেনা। স্মাগলড গুডসের রসিদ দেওয়ার রীতি এখনও চালু হয়নি।

শুভময় চিন্তিত মুখে বলল,—ওটা কদিনের জন্য তোমার বাপের বাড়িতে রেখে আসা যায় না?

—পাগল! গত মাসে বউদি চেয়েছিল দিইনি, এখন যেচে রাখতে গেলে...! বরং তোমার বোনের বাড়ি চালান করো।

—হুম্। নট এ ব্যাড আইডিয়া।...লাল্টু কিছু ভাববে না তো?

—ভাবার কী আছে! ওকে কি এখন টিভি দেখতে দিই! বলব, তোমার পরীক্ষা বলে পিসিকে দেখতে দিয়েছি। শুভ্রাকেও তাই বলব।

বলতে বলতে দরজাটা আলগা ভেজিয়ে দিল নীলা। আলমারির লকার খুলে গয়না বার করল। এক জোড়া বালা, এক জোড়া চুড়, দুটো নেকলেস, কানের ঝুমকো গোটা চারেক, বেশ কয়েকটা টাব, আংটি।

শুভময় আঁতকে উঠল,—বাড়িতেই এত গয়না রেখে দিয়েছ?

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরি যে। নীলা ঢোঁক গিলল,—কাল ব্যাঙ্কে রেখে আসব।

—খবরদার না। ব্যাঙ্কেও বেশি রাখবে না। সব একটা দুটো করে রেখে বাকিগুলো শুভ্রাকে দিয়ে আসবে। কালই।

—সব? শুভ্রাকে? শুভ্রা কী ভাববে?

—সে আমার দায়িত্ব। আমার বোন, আমি বুঝিয়ে বলব।

হ্যাঁ, তারপর ফোকোটের মাল ভেবে সব ঝেড়ে দিক, মনে মনে বলল নীলা। তার অপ্রসন্ন মুখ দেখে কিছু যেন আঁচ করল শুভময়। একটু যেন দ্বিধান্বিতও হয়েছে,—ঠিক আছে, ওগুলোকেও সব প্রাইভেট লকারে পুরে দেব। বটুয়ায় একসঙ্গে ভরে রাখো।

আলমারির দুই তাকের মাঝে টানা চ্যাপ্টা গোপন কুঠুরি। তার থেকে এবার এক এক করে নোটের বান্ডিল বার করছে শুভময়। একশো টাকার, পঞ্চাশ টাকার, দশ টাকারও আছে। পুরনো পুরনো মলিন বান্ডিল।

শুভময় গুনছে। এক বার, দু বার, বার বার। চোখ ছোট করে তাকাল,

—একটা পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল কম আছে মনে হচ্ছে!

—কম?

—হ্যাঁ। শুভময় আবার গোটা তাক হাতড়াল,—নাহ্, ভেতরে তো নেই।

—কম কী করে হবে! ভাল করে গোনো।

—বিশ বার কাউন্ট করেছি। বলতে বলতে আরেকবার গুনল শুভময়, —থাকার কথা একচল্লিশ, আছে চল্লিশ।

—অসম্ভব! টাকার কি ডানা আছে?

—সে তুমিই জানো। বের করোনি?

—আমি ওখানে হাতই দিইনি।

—এ তো মহা চিন্তার কথা হল। তোমার শাড়ির ভাঁজে-ফাঁজে নেই? তুমি তুলবার সময়ে কোনওদিন ভুল করে...যা ন্যাতা ছ্যাতা করে রাখার স্বভাব।

—বাজে কথা বোলো না। ঝট করে কথাটা নীলার গায়ে লেগে গেল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে নামাচ্ছে শাড়িগুলো,—দ্যাখো দ্যাখো, কোথায় আছে দ্যাখো।

—ও কি আর এখন পাওয়া যাবে? কোথায় কোন স্যাকরার গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছ। কিংবা শাড়ি কিনে বসে আছ। হারামের মাল পেয়েছ...

—চেঁচিও না। তোমার এই তাকের টাকায় আমি কক্ষনো হাত দিই না। যা খরচা করি, সব লকারের টাকা থেকে করি। কিংবা যা ভিক্ষে দাও তা থেকে করি। নীলার দাঁতে বিষ এসে গেল,—নিজে কোথাও ফুর্তিফার্তা করে ওড়াও নি তো? এখন ভুলে গিয়ে ঢং করছ!

—আমি ফুর্তিফার্তা করি? কী ফুর্তি করি?

—সে তুমিই জানো। আমি তো তোমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাইনি।

ক্রমশ গলা চড়ছে দুজনের। মানুষ থেকে শ্বাপদ, শ্বাপদ থেকে ক্রমে সরীসৃপ হয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী।

ভটাং করে দরজা খুলে গেল,—কী ব্যাপার? সন্ধেবেলা হঠাৎ ফাইট শুরু করলে কেন?

দুজনেই থতমত খেয়ে চুপ।

লাল্টু ঘরে ঢুকল,—একি! সব এমন লণ্ডভণ্ড করল কে? এদিকে গয়না, ওদিকে শাড়ি...!

ছড়ানো টাকা শাড়ির আড়ালে চাপা দেওয়ার অক্ষম চেষ্টা করল নীলা। শুভময় চটপট বলে উঠল,—একটা টাকা রাখা ছিল...পাচ্ছি না।

—কত টাকা?

—পাঁচ হাজার।

—পঞ্চাশ টাকার একটা গোছা তো? লাল্টুর স্বর নির্বিকার,—ওটা আমি নিয়েছি।

—তুই! নীলা শুভময়ের গলা কোরাসে বেজে উঠল,—কেন?

—দরকার ছিল।

—কী দরকার? আমাদের বলিসনি কেন?

—সব ব্যাপার কি তোমাদের বলা যায়!...তবে ওড়াইনি।

নীলা স্থিত হয়েছে খানিকটা। ছেলের এই ভাবলেশহীন আচরণ সহ্য হচ্ছে না তার। কড়া সুরে বলল,—কী এমন ব্যাপার যে আমাদেরও বলা যায় না?

—শুনবে? খুব সিক্রেট। লোককে আবার বলে বেড়িও না। শর্টস টিশার্ট পরা লাল্টুর মসৃণ চোয়ালে রহস্যময় হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ ছোট করে বলল,—আমাদের টিউটোরিয়ালের জ্যোতির্ময় স্যার তিনটে পেপারের কোয়েশ্চেন দিয়েছেন। ফিজিক্সের দুটো পেপার আর কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার। তিন দুগুণে ছ'হাজার চেয়েছিলেন, বলে কয়ে পাঁচ হাজারে করিয়েছি। জেনুইন কোয়েশ্চেন। একদম অরিজিনাল। না হলে টাকা ফেরত।

ঘরে কি বাজ পড়ল? মাটি কাঁপছে নাকি? ফ্যানটা কি যথেষ্ট জোরে ঘুরছে না?

শুভময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে ছেলেকে। কোনওক্রমে বলল,—কোয়েশ্চেন পেপার কিনে পরীক্ষা দিবি তুই?

—হাতে এসে গেলে নেব না? উনি বেচছেন, তাই তো কিনছি। আমি তো আর একা নই, অনেকেই...

—এত যে তোর রাত জেগে পড়া, নোট বানানো, ঘড়ি দেখে উত্তর লেখা, সবই কি তাহলে ফাঁকি? শুধু আমাদের দেখানোর জন্য? নীলার গলা কেঁপে গেল।

—তা কেন? খেটে তো আমি ষাট-সত্তর পেতেই পারি। তাই বলে কি সেখানেই থেমে থাকব? কটা টাকা দিলে যদি নাইনটি পারসেন্ট এসে যায়, সেটা কি দোষের? লাল্টুর গলায় অভিমান,—মনে রেখো, মাধ্যমিকে আমি স্টার মিস করেছিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে গেল লাল্টু।

নীলা অবশ হাতে শাড়িগুলো তুলছে এক এক করে। গয়নাগুলো জড়ো করছে, টাকাও। হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ে গেল। দর্পণে পাশাপাশি দুটো মুখ। শুভময় আর নীলা। দুজনে দেখছে দুজনকে।

কী সরাবে তারা এখন! কোথায় সরাবে! ♣

চেনা অচেনা

টেরচা চোখে সুবালাকে দেখল মিতালি,—তুই তাহলে কবে ভর্তি হচ্ছিস হাসপাতালে?

রান্নাঘরের দরজায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে সুবালা। নখ দিয়ে নখ খুঁটছে। অস্ফুটে বলল,—ডাক্তারদিদি তো এক্ষুণি অপারেশান করতে বলছে।

—বেড পাবি?

—দিদি ব্যবস্থা করে দেবেন, ফ্রি বেডে।

—কোন হাসপাতালে?

—বাঘাযতীন। ভাল হাসপাতাল গো বউদি। বেশ বড়। চারতলা বাড়ি।

সরকারি হাসপাতাল কতটা ভাল হবে জানা আছে মিতালির। তবে এই নিয়ে আর প্রশ্ন করল না। হাসপাতাল যেমনই হোক, সুবালার মেয়েলি অপারেশনটা সত্যিই জরুরি হয়ে পড়েছে। জরায়ুকে স্বস্থানে ধরে রাখার পেশীগুলো আলগা হয়ে গেছে, বেরিয়ে আসছে ইউটেরাস, এভাবে বেশিদিন চললে আলসার ক্যানসারে না দাঁড়িয়ে যায়।

তবু সুবালা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাতে একটু বুঝি অসহায়ই বোধ

করল মিতালি। পেছনে একটু খ্যাচখ্যাচ করতে হলেও মেয়েটা বেশ কাজের। রান্নাবান্না, ঘর ঝাড়পোঁছ, কাচাকুচি সবই করে একার হাতে। থুড়ি, ওয়াশিং মেশিন কেনার পর কাচাকুচি অবশ্য আর তেমন করতে হয় না সুবালাকে, তবু কাপড়-চোপড় ছাদে মেলো রে, নামিয়ে ইস্ত্রি করো রে, এসব তো আছেই। সবচেয়ে বড় কথা, নটা সাড়ে নটার মধ্যে তারা কর্তা-গিন্নি দুজনেই অফিস বেরিয়ে যায়, সন্ধে পর্যন্ত বাড়ি পাহারার দায়িত্বও তো সুবালার। টুবলু স্কুল থেকে ফেরার পর তাকে বিকেলের টিফিন করে দেওয়ার ঝক্কিও কম নয়! পরপর দুদিন এক খাবার মুখে রোচে না টুবলুর। সকাল সাতটার মধ্যে ট্রেন ধরে কালিকাপুর থেকে আসে সুবালা, রুটি-টুটি করে সেই সন্ধেবেলায় যায়, সে না থাকা মানে মিতালির জগৎ অন্ধকার।

মিতালি জিজ্ঞেস করল,—তা কদ্দিন তোকে রাখবে হাসপাতালে?

—বলছে তো দু-হপ্তা। সেলাই শুকোলে তবে ছাড়বে। আমি অবশ্য বলেছি যত তাড়াতাড়ি পারো আমায় রিলিজ দিয়ে দিও।

তাতেই বা মিতালির কী সুসারটা হবে? সদ্য একটা ভারী অপারেশন থেকে ওঠা সুবালাকে দিয়ে কোন কাজটা করানো যাবে? ট্রেনের ভিড় ঠেঙিয়ে কালিকাপুর থেকে আদৌ আসতে পারবে কিনা তাতেই তো যথেষ্ট সংশয় আছে। জোরজারও তো করা যায় না। অতটা অমানবিক হওয়া সম্ভব নয়। বদলি লোক দিতে বলবে একটা? থাক, সে যদি সুবালার মতো বিশ্বাসী না হয়! একটু আলু পেঁয়াজ সরানোর অভ্যেস ছাড়া সুবালার সেরকম কোনও হাত টান নেই। ভরসা করে গোটা বাড়ি ওর ওপর ছেড়ে রাখা যায়। নতুন লোক কোথায় কাকে ঢোকাবে, পুরো ফ্ল্যাটই হয়তো সাফ হয়ে যাবে একদম। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, নয় কদিন অফিস ছুটি নিয়ে মিতালিই সামলাবে ঘরকন্না।

আর একটা চিন্তাও পাক খেয়ে গেল মিতালির মাথায়। সুবালা রোজ মেয়ে নিয়ে কাজে আসে। মা হাসপাতাল গেলে টেঁপির কী হবে? সুবালার বর তো মেয়ের জন্মের বন্দোবস্ত করেই ভাগলবা, বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে রোগাভোগা মা। তা সেই মায়ের জিম্মায় নিশ্চয়ই টেঁপিকে রেখে যাবে না সুবালা? তাছাড়া সুবালার প্রবল বাসনা মেয়ে লেখাপড়া শিখুক, সেই

মোতাবেক তাকে পাড়ার করপোরেশন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে মিতালি, কালিকাপুরে থাকলে মেয়েটার তো স্কুল কামাইও হবে। ক্লাস টুতে পড়ছে টেঁপি, সামনে মাসে তার অ্যানুয়েল...।

অর্থাৎ টেঁপির দায়টাও চাপল মিতালির ঘাড়ে। মুখের ওপর রাখতে পারব না তো বলাও যায় না। অবশ্য টেঁপি এখন অনেকটা সাব্যস্ত হয়েছে, ঝাড়াঝুড়ির কাজটা করে দিতে পারবে। ছুটির দিনে লোক আসার কামাই নেই, হাতে-হাতে চা জলখাবার এগিয়ে দিতেও তো লোক লাগে। অনিমেষ আর টুবলু দুজনেই শাহেনশা, নড়ে বসা দূরে থাক, হুকুম ছোঁড়ায় ওস্তাদ। টেঁপি থাকলে কিছুটা উপকার তো হবেই।

সুবালা দাঁড়িয়েই আছে। কাচুমাচু মুখে বলল,—তাহলে শনিবারই ভর্তি হয়ে যাই বউদি?

—না না, শনিবারে নয়। মিতালি হাঁ হাঁ করে উঠল,—রোববার দুপুরে তোর দাদার বন্ধু আর বন্ধুর বউ খাবে, ওটা অন্তত সামলে দিয়ে যা। এরপর নয় আর কাউকে নেমন্তন্নই করব না। অন্তত যতদিন না তুমি সুস্থ হও।

মিতালির স্বর বুঝি সামান্য বেঁকে গিয়েছিল। সুবালা টের পেয়েছে। সংকুচিত ভাবে বলল,—তুমি খুব অসুবিধেয় পড়ে যাবে, না বউদি?

—অসুবিধে হলেই বা উপায় কী?

—আমি কি তাহলে ডাক্তারদিদিকে গিয়ে বলব, অপারেশনটা এখন না করে তোমরা যখন বেড়াতে টেড়াতে যাও তখনই...

মিতালি মনে মনে বলল, সেটা করলেই তো ভাল হত।

মুখে বলল,—না না, তুই করিয়েই নে। রোববারটা পার হয়ে সোমবার গিয়ে ভর্তি হ। কাল তো হাসপাতালে ব্লাড করাতে যাবি বলছিলি, ডাক্তারদিদিকে দিয়ে তখন সেভাবে লিখিয়ে নিস।

ঢক করে ঘাড় নাড়ল সুবালা। বলল,—দাদাকে বেশি করে বাজার করে দিতে বোলো, একসঙ্গে দু-তিন দিনের রান্নাও করে রেখে যাব।

—হুম।

মিতালি ঘরে চলে এল। টুবলু স্কুলে বেরিয়ে গেছে, অনিমেষ স্নানে, মিতালিকেও এবার অফিসের জন্য তৈরি হতে হবে। ঠাণ্ডা পড়েছে জবুর,

স্নানটা আজ ডুব মেরে দেওয়াই যায়।

আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ বার করল মিতালি। রেখেছে বিছানায়। আয়নায় দাঁড়িয়ে ঝটপট চুলটা বেঁধে ফেলল। কবজিতে ঘড়ি আটকাতে আটকাতে এসে বসেছে ডাইনিং টেবিলে।

সুবালা রান্নাঘর থেকে গলা ওঠাল,—এক মিনিট বউদি। মাছের ঝোলটা নামিয়ে নিয়েই দিচ্ছি।

মিতালিও গলা তুলল,—ডাল হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ বউদি। মুগডাল করলাম। কড়াইশুঁটি দিয়ে।

—আর ভাজাভুজি?

—দাদার জন্য বেগুন ভেজেছি। তুমি তো বেগুন খাবে না, আলু ভেজে দেব?

—থাক গে। যা দিবি তাড়াতাড়ি দে। ফ্রিজ থেকে টোম্যাটোর চাটনিটা বের করেছিস?

—এমা, একদম ভুলে গেছি।

—এত ভুলো মন কেন? জানিস তো সক্কালবেলা ওই চাটনিটুকুই আমি তৃপ্তি করে খাই।

অনিমেষ বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। যত ঠাণ্ডাই পড়ুক, সে কক্ষনো গরম জলে স্নান করে না, এখন কাঁপছে ঠকঠক। শীতের তাড়নায় বেসুরো গান বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। মিনিট খানেকের মধ্যে চুল-টুল আঁচড়ে, চোখে চশমা চড়াতে চড়াতে সেও টেবিলে হাজির।

হুটোপুটি করে দুজনেরই আহার সাজিয়ে দিচ্ছে সুবালা। দ্রুত হাতে ভাত মাখছে মিতালি, আঙুলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চাটনি তুলে ছোঁয়াচ্ছে জিভে। অনিমেষও খাচ্ছিল গপাগপ। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে হঠাৎ হাল্কা গলায় বলল,—সুবালার মেডিকেল লিভ স্যাংশন হল?

মিতালি জবাব দিল না। সে মরছে ভাবনায়, অনিমেষ খুশিতে উথলে উঠছে!

সুবালা টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়ে। বলল,—আর একটা কথা ছিল বউদি।

মিতালির চোখ সরু হল,—কী?

—কিছু টাকা দেবে?

—কী হবে?

—ডাক্তারদিদি বলছিল এক বোতল রক্ত কিনতে হবে। তারপর ইনজেকশন আছে, ওষুধপত্র আছে...

—তুই যে বললি ফ্রি বেড?

—ফ্রি বেডই তো। থাকার খরচা লাগবে না, অপারেশনের জন্যও কিছু দিতে হবে না...

—ওষুধ তো হাসপাতাল থেকেই দেওয়ার কথা।

—হ্যাহ্, গভর্নমেন্ট হসপিটাল দেবে ওষুধ ইনজেকশন! অনিমেষ টুক করে ফোড়ন কাটল,—ওদের স্টকে থাকে নাকি কিছু? যেটুকু থাকে তারও তো ঝাড়িতং হয়ে যায়।

মিতালির ভুরু জড়ো হল,—কত দিতে হবে?

—ডাক্তারদিদি বলছিল রক্ত ইনজেকশন ওষুধ মিলিয়ে হাজার দুয়েক মতন পড়তে পারে।

—মাসের শেষে এখন অত টাকা পাব কোথায়?

—দাও না। মাইনে থেকে কেটে নিও।

মিতালি বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল,—জমি কেনার জন্য আট হাজার নিয়েছিলি। মাসে মাসে দুশো করে শোধ করতে হিমসিম খাচ্ছিস। এরপর আরও তুই কাটাতে পারবি?

—ঠিক কাটাব। দেখো বিপদকালে টাকা দিচ্ছ...

অনিমেষ কায়দা করে বলল,—কাম অন মিতু। থিংক ইট অ্যাজ চ্যারিটি। গিভ হার দ্য মানি।

—হ্যাভ টু। মিতালিও ইংরিজির আড়াল নিল,—আফটার অল শী ইজ মাই নেসেসিটি। 'মাই' শব্দটার ওপর একটু বেশি জোর দিল মিতালি। সুবালার চোখে চোখ রেখে বলল,—টাকা আমি তোমার হাতে দেব না, প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ ইনজেকশন কিনে দেব। হবে তো?

—তাহলে তো তোমায় কষ্ট করে যেতে হবে বউদি। যাবে?

—যাব। যা একখানা রোগ বাধিয়েছ। তোর রক্তের কী গ্রুপ?

—তা তো জানি না। ডাক্তারদিদি বলছিল অপারেশনের আগের দিন স্যাম্পেল টেনে দেবে, সেটা নিয়ে গিয়ে এক বোতল কিনতে হবে।

—কে কিনতে যাবে?

—জামাইবাবু।

ফের মিতালির কপালে ভাঁজ,—তা তোর দিদি জামাইবাবু কিছু দিচ্ছে না কেন?

—কোথ্‌থেকে দেবে বউদি? তাদের বলে নিজেদেরই চলে না। জামাইবাবু কতদিন ধরে বসে আছে, হাতে কাজ নেই...

—থাকলেও দিত না। মিতালির গলায় বিদ্রূপ ফুটল,—দেওয়ার জন্য মন থাকা চাই। তোর দিদি জামাইবাবু দুটোই সেয়ানা। আজ না হয় কাজ নেই, যখন কাজ করত, তখনও কি একদিনও তোর মাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল? তোর জমি কেনার সময়েও তো পাঁচ পয়সা উপুড়হস্ত করেনি! অথচ ওই দিদিকে দেখলে তুই একেবারে বিগলিত হয়ে যাস। কাজকর্মে হুঁশ থাকে না, পা ছড়িয়ে বসে যাস গল্প করতে!

সুবালা রা কাড়ল না। শুকনো মুখে চলে গেল রান্নাঘরে।

অনিমেষ আড়চোখে সুবালার চলে যাওয়াটা দেখছিল। গলা নামিয়ে বলল,—এতটা রাফলি না বললেই পারতে। আফটার অল বিপদে পড়েছে...

—ঠিকই বলেছি। মিতালির স্বরও নীচুতে,—আহ্লাদের বেলায় দিদি, ঠেকায় পড়লে বউদি। সারাক্ষণ শুধু দাও দাও। জাতটাই এরকম।

—আহা। সুবালা তোমার জন্যে করেও তো।

—তার বদলে সুবিধেটাও কম পায় না। মাস গেলে নশো টাকা মাইনে বাদই দিলাম, মেয়ে নিয়ে আসছে, থাকছে, খাচ্ছে...কোন বাড়িতে এটা অ্যালাও করবে বলো? পাওয়ার লোভেই করে। পায় বলেই করে।

—যাক গে, করে তো। তাহলেই তো হোলো! অনিমেষ মিটিমিটি হাসছে,—তবে হ্যাঁ, একটা কথা কিন্তু বলে রাখি। তোমার খরচা হয়তো দুহাজারেই থামবে না, আরও কিছু খসতে পারে। সরকারি হসপিটালে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার কী পাবে জানোই তো! কাঁচকলা। নার্স-টার্সরা থোড়াই

দেখবে, উঠতে চলতে না পারলে আয়াও রাখতে হবে তোমাকেই। এই এক্সপেন্সটাও হিসেবে ধোরো।

মিতালি ঠোঁট উল্টোলো। কী আর করা যাবে! কপাল!

সোমবার হাসপাতালে ভর্তি হল সুবালা। পরদিন অপারেশন। সকালে।

মিতালিও ছুটি নিয়েছে। মঙ্গলবার নটা বাজতে না বাজতে পৌঁছে গেছে হাসপাতালে। গিয়ে দেখে দু পাশে দুটো বিনুনি বেঁধে ওটির জন্য তৈরি হয়ে পাংশু মুখে শুয়ে আছে সুবালা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, বোধহয় আপনজনদের খুঁজছে।

মিতালিকে পেয়ে সুবালার ধড়ে যেন প্রাণ এল। খপ করে হাত চেপে ধরেছে,—কী হবে বউদি?

মিতালির একটু মায়া হল। আহা রে, মেয়েটাকে এক্ষুণি অপারেশনের জন্য ঢোকাবে, আত্মীয়স্বজন একজনও কেউ এল না! সেই জামাইবাবুটিরই বা কী হল, যে কাল সন্ধেবেলা গিয়ে হাত পেতে সাড়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে এল?

সুবালাকে একটু সাহস জোগাতে চাইল মিতালি। নরম গলায় বলল,—কী আবার হবে। ভাল হয়ে যাবি।

—টেঁপিটাকে একবার আনতে পারবে।

—এসে কী করবে?

—একবার দেখে নিতাম। যদি মরে যাই

—ও কী অলুক্ষুণে কথা। এই অপারেশনে কেউ মরে না। আমি তোর ডাক্তারদিদির সঙ্গে কথা বলেছি এসে, উনি বললেন কোনও রিস্ক নেই। তোর তো পেটও কাটা হবে না। শুধু কটা সেলাই পড়বে, ব্যস।

সুবালা তবু যেন আশ্বস্ত হল না। আরও জোরে চেপে ধরেছে হাত,—বউদি, তুমি একটা কথা দাও।

—কী?

—মরে গেলে মেয়েটাকে তুমি দেখবে?

—ফের বাজে কথা!

—না বউদি, আগে কথা দাও।

—অ্যাই বোকা, আমি কি পাষন্ড? তোর কিছু হলে আমি কি টেঁপিকে ফেলে দিতে পারি?

মুহূর্তের জন্য সুবালার চোখ যেন ঝিকমিক করে উঠল। পরক্ষণে বুজে ফেলেছে দু-চোখের পাতা। একটু যেন শান্তও হল। বুঝি বা নিজেকে প্রস্তুত করছে আসন্ন অস্ত্রোপচারের জন্য। অথবা মন থেকে তাড়াতে চাইছে মৃত্যুভয়।

সাড়ে দশটা নাগাদ ওটিতে নিয়ে যাওয়া হল সুবালাকে। মিতালি অপেক্ষা করছিল বারান্দায়। পায়চারি করছিল। একটা তীব্র কটু গন্ধ ছড়িয়ে আছে হাসপাতালময়। মাঝে মাঝে নাকে আঁচল চাপাচ্ছিল মিতালি।

সুবালার গর্ভপথ মেরামত করতে সময় লাগল পাক্কা সওয়া এক ঘণ্টা। প্রথমে পুরো অজ্ঞান করা হয়নি সুবালাকে, শিরদাঁড়ায় ইনজেকশন দিয়ে চেষ্টা হয়েছিল অপারেশনের। তারপরেও ছটফট করছিল বলে কেটাডিন দিতে হয়েছে। ওটি থেকে যখন বেরোল, সুবালার তখন ঘোর আচ্ছন্ন দশা।

বাইরে এনে রুগীর জ্ঞান ফিরেছে দেখিয়ে দেওয়াটাই দস্তুর। সেই মতো চেষ্টা করছে ডাক্তার, নার্স, সুবালাকে ডাকছে, জিভ দেখাতে বলছে, কিন্তু সুবালা নিথর।

মিতালি বেশ ভয়ই পেয়ে গেল। সত্যি সত্যি খারাপ কিছু ঘটে গেল না তো?

স্ট্রেচারে শায়িত সুবালার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল মিতালি। জোরে জোরে ডাকল,—এই সুবালা? সুবালা? কী হল? সাড়া দে।

উত্তর নেই।

মিতালি হাত রাখল সুবালার মাথায়। ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কী রে, চোখ খোল্....সুবালা?

তখনই হঠাৎ চোখ নয়, ঠোঁট দুটো খুলেছে সুবালার। জড়ানো গলায় বলে উঠল,—আমার বউদি কোথায়? আমার বউদি?

আশ্চর্য! প্রায় অচেতন দশায় মেয়ে নয়, মা নয়, পালিয়ে যাওয়া বরটা নয়, আর কোনও আত্মীয় নয়, প্রথমেই মিতালিকে খুঁজছে সুবালা?

মিতালি বলল,—এইতো রে। আমি আছি।

সুবালা শুনতেই পেল না। ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করেই চলেছে,—বউদি...বউদি গো...অফিসের দেরি হয়ে গেল...বউদিকে ভাত দাও...চাটনি দাও...চাটনি ছাড়া বউদি খেতে পারে না গো...কুঁচিটা একটু নামিয়ে পরো বউদি,...গোড়ালি থেকে উঠে গেছে...টিফিনটা খেয়ো বউদি, ওটুকু না খেলে শরীর থাকবে কী করে...বউদি গো, ও বউদি...

মিতালি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল। মহিলা ডাক্তার বললেন,—হ্যালুসিনেশন। ওষুধের এফেক্ট। এখন ঘণ্টা দুই মতো এরকম চলবে। ডিলেরিয়াম বকবে ক্রমাগত।

হ্যালুসিনেশন? প্রলাপ। নাকি হৃদয়ের কোনো গহিন কূয়োয় আটকে থাকা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ? কিম্বা তার চেয়েও বেশি কিছু? ভালবাসা।

মিতালির গা শিরশির করে উঠল। হিসেবের নিক্তিতে মেপে সুবালার জন্য যেটুকু করেছে সে, তার বিনিময়ে এতটা পাওয়া যায়?

সুবালাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের কর্মীরা। ঝাপসা হয়ে এল মিতালির চোখ। সুবালাও। ♣

টীকা নিষ্প্রয়োজন

—ছায়াবীথি উপন্যাসটির জন্য আপনি এ বছর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের পত্রিকার তরফ থেকে আপনাকে অজস্র অভিনন্দন।

—ধন্যবাদ।

—পুরস্কার পেয়ে আপনার কেমন লাগছে?

—পুরস্কার তো এক ধরনের স্বীকৃতি। কাজের। আমার পরিশ্রমের। সুতরাং ভালই লাগছে। আরও ভাল কিছু লেখার প্রেরণা পাচ্ছি।

—ছায়াবীথিতে আপনি যে সরসী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন, এমন বলিষ্ঠ নারী কি আমাদের সমাজে দুর্লভ নয়?

—প্রশ্নটাতে আমার আপত্তি আছে। সরসী বলিষ্ঠ কেন হবে, সে তো একটা নরমাল মেয়ে।

—তাই কি? সরসীকে কি একটু পুরুষালি মনে হয় না?

—অবশ্যই না। পুরুষালি ব্যাপারটাই একটা বানানো কনসেপ্ট। আমি নারীপুরুষের কোনও বিভাজন রেখায় বিশ্বাস করি না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা সেম প্ল্যাটফর্মে থাকবে। সুখ-দুঃখ, কাজকর্ম, ঝড়ঝাপটা সব কিছু ইকুয়ালি শেয়ার করে নেবে। নইলে তাদের মানবিক গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ হবে কী করে।

—আচ্ছা একটা কথা। আপনার পুরুষচরিত্রগুলো কি তুলনামূলক ভাবে একটু দুর্বল নয়?

—এটা কিন্তু আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। আমি কিন্তু দুজনকে সমান মাপেই আঁকতে চাই।

সাক্ষাৎকারের মাঝেই লেখকপত্নীর প্রবেশ। কাঁধে অফিসব্যাগ, চোখেমুখে সারা দিনের ক্লান্তি।

—এই তো আমার বেটারহাফ এসে গেছে।...কী গো, এত দেরি হল যে?

—আর বোলো না, সাড়ে পাঁচটার সময়ে একগাদা লোন অ্যাপ্লিকেশন ধরিয়ে দিল। ব্যস্, বেরোতে বেরোতে সাতটা দশ। তখনও মিনিবাসে যা ভিড়, বাপ্স।

—সত্যি, বড্ড খাটুনি যাচ্ছে তোমার।...এই শোন, ভেতরে যাচ্ছ? তাহলে দু কাপ কফি বানিয়ে দাও না প্লিজ। না না, তিন কাপই বানাও। কফি খেলে তোমারও রিফ্রেশড লাগবে।...হ্যাঁ, আমরা যা বলছিলাম....। ♣

রোদচশমা

বার বার তিনবার। এবারও কেটে গেল লাইন। কেটে গেল? না কেটে দিল? সমর্পণ কি সত্যিই তবে সম্পর্কটা ছিঁড়ে ফেলতে চায়? সেলফোনটা হাতে নিয়ে ভোম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ঝিকমিক। ক্যান্টিনের ছেলেটা কখন চিকেন চপ রেখে গিয়েছে টেবিলে, ঝিকমিকের ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে-মাঝেই আনমনা চোখ চলে যাচ্ছে মোবাইলের পরদায়। অমনি বুকটা কেমন হু-হু করে উঠছে। নাঃ, শাল্মলীরা যা বলছিল সেটাই সত্যি। নির্ঘাৎ এখন মনজিনির নৌকায় ভিড়েছে সমর্পণ। আশ্চর্য, এইভাবে ঝিকমিককে ডিচ করল? এইভাবে? টানা আট মাস ধরে তারা স্টেডি চলছিল, একদিনও তাদের মধ্যে কোনও লড়াই-ঝগড়া হয়নি, অকাতরে সে কত কী উপহার দিয়েছে সমর্পণকে, সব কিছু হজম করে বেমালুম অ্যানাকোন্ডা বনে গেল? নাকি অজগর? পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে, এখন আর তাকাচ্ছেই না ঝিকমিকের দিকে? অত দামি একখানা ইতালিয়ান সানগ্লাস কিনে দিয়েছিল সমর্পণকে, টাকাটার জন্য বাবাকে কত টুপিটাপা দিতে হয়েছিল, তার এই প্রতিদান পেল ঝিকমিক? বিশ্বাসঘাতকতা, তোমার আর-এক নাম সমর্পণ!

ক্যান্টিনে আজ তেমন ভিড় নেই। একে শনিবারের বিকেল, তায় আজ ভারত বনাম পাকিস্তানের ওয়ান ডে। কার দায় পড়েছে সাড়ে চারটে অবধি কলেজে বসে থাকার? নেহাত ঝিকমিকের আজ পা সরছে না, নইলে সে'ও তো কখন হাওয়া হয়ে যেত!

বিষণ্ণ মুখে ঝিকমিক চপ ভাঙল। চামচ করে সবে মুখে পুরছে, কোত্থেকে হঠাৎ সামনে নিবেদন। উল্টোদিকে বসতে-বসতে বলল, কী রে, সেঁকো বিষ খাচ্ছিস নাকি?

ঝিকমিক উত্তর দিল না, মুখভঙ্গি করল সামান্য। এমনিতে নিবেদন ছেলেটা খারাপ নয়। তবে বড্ড বেশি গায়েপড়া। একটু বোকা-বোকাও। ঝিকমিকের উপর তার ভালই দুর্বলতা আছে। ইন্টুমিন্টু করার জন্য ছোঁক-ছোঁক করছে সারাক্ষণ। মাঝে-মধ্যে নিবেদনকে খারাপ লাগে না।

আবার কখনও-কখনও ওর ফেবিকল্ হালচালে ঝিকমিকের গা জ্বলে যায়।

তোর আজ অ্যাপো-ট্যাপো নেই? গোলগাল মুখের নিবেদনের চোখজোড়া পিটপিট করছে।

ঝিকমিক গোমড়া গলায় বলল, জেনে তুই কী করবি?

—দাঁত দেখাচ্ছ কেন বস? মনে হচ্ছে মুড ভালো নেই?

—বুঝছিসই যখন, পিন মারছিস কেন?

—তোমাকে ফিউজ দেখলে আমারও যে বুকটা পিনপিন করে বস! নিবেদনের স্বরে আচমকা মাখন, কী হয়েছে রে ঝিক, বল না?

ঝাঁঝালো চোখে একবার নিবেদনকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিল ঝিকমিক।

—আহা, চেপে রেখে লাভ আছে। বরং ঝেড়ে কাশলে মনটা হাল্কা হয়।

বেশি ঘ্যানঘ্যান করতে হল না। দু'-চারবার বলতেই ঝিকমিকের বুকের ভিতরের জমা বাষ্পটা বেরিয়ে এল। গরগর করে উগরে দিল সমর্পণের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপ। কীভাবে সে ঝিকমিককে ডজ করে-করে বেরিয়ে যাচ্ছে। রিভার্স সুইপ মেরে কীভাবে দূরে ঠেলে দিচ্ছে ঝিকমিককে, এখন

টিপকপালি, খুসকি চুল মনজিনির জন্য সমর্পণ কতটা ফিদা...কিছুই জানাতে বাকি রাখল না। শেষের দিকে তো গলাটা রীতিমতো ধরে এল ঝিকমিকের।

ফোঁচ-ফোঁচ নাকও টানল বারকয়েক।

নিবেদনও ভারী ব্যথিত হয়ে পড়েছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি জানতাম, আমি জানতাম।

—কী জানতি?

—এইরকম একটা কিছু পরিণতি হবে। সমর্পণের মতো একটা থার্ড গ্রেড ফ্লার্টে তুই কী করে মজলি? আমি তোকে কতবার সাবধান করেছি, পাত্তাই দিসনি।

ঝিকমিক একটুক্ষণ চুপ। নিথর। মনোবেদনাটা নামিয়ে দিয়ে বুকের হু-হু ভাব একটু কমেছে বটে, তবু চিনচিন একটা কষ্ট যেন রয়েই গিয়েছে।

নিবেদন ফস করে জিজ্ঞেস করল, তোরা কতদূর এগিয়েছিলি?

—মানে? ঝিকমিক থতমত।

—মানে...ইউ ডোন্ট মাইন্ড, তোদের সম্পর্কটা...মানে ঠিক কী স্টেজে...?

—কী হবে জেনে?

—না...জেনে কোনো লাভ নেই...জাস্ট

—কৌতূহল... নিবেদন সোজা হয়ে বসল, থাক গে যাক, পাস্ট ইজ পাস্ট। জীবনটাকে তুই আবার নতুনভাবে স্টার্ট কর।

—আমার আর কিছু ভালো লাগছে না রে। মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—বালাই ষাট, মরবি কেন? নিবেদন একগাল হাসল। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, ম্যায় হুঁ না! নিবেদনের এই কথাটুকুতেই যেন কোনও জাদু ছিল। চমকে তাকিয়েছে ঝিকমিক। এই প্রথম ছেলেটার চোখ দু'টোকে গোরুর চোখ বলে মনে হচ্ছে না! অর্ধেক চপ ভেঙে নিবেদনের দিকে বাড়িয়ে নিচু গলায় বলল, নে, শেয়ার কর। ঝড়ের মতো কেটে গেল ছ'টা মাস। পার্ট-টু পরীক্ষা শেষ, কলেজ লাইফের ইতি, এখন শুধু রেজাল্টের প্রতীক্ষা।

গত ছ'মাসে অনেকটাই বদলে গিয়েছে ঝিকমিক। সমর্পণের শোক জুড়িয়েছে অনেকটাই। এতটাই ঠাণ্ডা যে, রীতিমতো সর পড়েছে তাতে।

এখন নিবেদনই তার ছায়াসঙ্গী। দু'জনে একসঙ্গে ঘুরছে যত্রতত্র। নন্দন, অ্যাকাডেমি, লেকের পাড়, গঙ্গার ঘাট...। মাঝে তো একদিন বিনা কারণে ভিড় লঞ্চে চেপে বেলুড় চক্কর মেরে এল দু'জনে। সারাক্ষণই চলছে কপোত-কপোতীর মতো সুধা বিনিময়। নিবেদনই বকবক করে বেশি। তবে শুনতে মন্দ লাগে না ঝিকমিকের। মনে হয়, এই একটিমাত্র ছেলের চোখে তো অন্তত সে স্বর্গের অপ্সরী! বুঝি বা তার জন্য আকাশ থেকে মস্ত চাঁদটাকে পেড়ে আনতে পারে নিবেদন।

তবু যে কেন হঠাৎ-হঠাৎ উদাস হয়ে যায় মন! হয়তো কোনও আইসক্রিম বারে ঝিকমিকের আঙুল নিয়ে খেলা করছে নিবেদন, ঝুপ করে ঠিক তখনই যেন কোথা থেকে এসে হানা দেয় সমর্পণ। সশরীরে নয়, স্মৃতি হয়ে। আহা, সমর্পণটা কী দারুণ ম্যানলি ছিল! ছ'ফুট ছুঁই ছুঁই হাইট, চওড়া কাঁধ, বাউন্সি চুল...। চোখে চোখ রেখে যখন তাকিয়ে থাকত, বুকে যেন ক্যাটেরিনার দাপাদাপি। মোটরবাইক চালাত কী জোরে, বাপ্‌স! ঝিকমিক যেন উড়ছে, রকেটে করে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমর্পণ। এখন মোটরবাইকের সেই ব্যাকসিট মনজিনির দখলে। স্রেফ গায়ের রং ফরসা বলে ঝিকমিককে কনুই মেরে দিল ওই টিপকপালি!

—কোনও মানে হয়?

ঝিকমিকের এই সব ক্ষণিক ভাবান্তরগুলো কিন্তু নিবেদনের চোখ এড়ায় না। এই তো সেদিন বোটানিকাল গার্ডেনের অর্কিড হাউজের শুনশান নির্জনতায় ঝিকমিককে চুমু খাওয়ার উপক্রম করছিল, হঠাৎ দেখল ভারী অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে ঝিকমিক। তার চোখ দুটো যেন নিবেদনকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে, অন্য কোনও দেশে।

নিবেদনের মেজাজটা ঝুল খেয়ে গেল। বেজার মুখ করে বলল, অ্যাই, তার ব্যাপারখানা কী বল তো?

—উম?

—কী হয়েছে তোর? মাঝে-মাঝেই মেঘলা হয়ে যাস কেন?

ঝিকমিক আরও উদাস স্বরে বলল, কই, না তো!

—বললেই হল? নিবেদন ঝিকমিকের কাঁধে হাত রাখল। জেরার

ভঙ্গিতে বলল, তুই এখনও সমু রাসকেলটাকে ভুলতে পারিসনি, তাই না?

জোর গলায় অস্বীকার করতে পারল না ঝিকমিক। অস্ফুটে বলল, হয়তো।

—এরকম করলে তো চলবে না। তোকে ভুলতেই হবে।

—চেষ্টা তো করছি।

—ভোলার একটা প্রসিডিওর আছে। অনেক সিস্টেম্যাটিক্যালি এগোতে হবে।

—কীরকম?

তোদের মধ্যে যে লিঙ্কগুলো ছিল, সেগুলো একদম ছিঁড়ে ফ্যাল। তুই তো ওকে অনেক গিফ্‌ট দিয়েছিলি, তাই না?

ঝিকমিক ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, তা দিয়েছি।

—সবচেয়ে দামী জিনিস কী দিয়েছিস?

ঝিকমিক মনে-মনে ভাবল, আমার হৃদয়! মুখে বলল, একটা ইতালিয়ান সানগ্লাস। আঠারোশো টাকার মতো পড়েছিল।

গুড। স্ট্রেট সমুর কাছে গিয়ে সানগ্লাসটা আগে ফেরত আন। তারপর ওটা আমায় দিয়ে দে। সমুকে দেওয়া সবচেয়ে দামী উপহারখানা যদি আমি চোখে পরে ঘুরি, তবে দেখবি সমুর উপর মোহ আস্তে-আস্তে কেটে যাচ্ছে।

—যাঃ, তা হয় নাকি!

—হয়। হয়। দেখ না ট্রাই করে।

দু'এক সেকেন্ড ভাবল ঝিকমিক। বলল,

কিন্তু....দেওয়া জিনিস ফেরত চাইব?

—অফকোর্স! ও যদি তোকে মনটা দিয়েও ফেরত নিয়ে নিতে পারে, তুই সামান্য একটা সানগ্লাস ফেরত চাইতে পারবি না? নিবেদন আরও একটু ঘন হল ঝিকমিকের। অনুনয়ের স্বরে বলল, ওই সানগ্লাসটা তুই আমায় এনে দে ঝিক। নইলে আমাদের সম্পর্কটা যে দানা বাঁধবে না।

ঝিকমিক দ্বিধা মেশানো স্বরে বলল, দেখি!

—উহুঁ, দেখি নয়। ডু ইট ঝটপট। আমার কাছে খবর আছে, সমু দিল্লি কেটে পড়ছে। তার আগেই ফয়সালাটা করে ফ্যাল।

মনের সঙ্গে প্রচুর লড়াই চালিয়েও সমর্পণের কাছে যেতে পারল না ঝিকমিক। ওভাবে কি দেওয়া জিনিস ফেরত চাওয়া যায়? পরের জন্মে তা হলে কালীঘাটের কুকুর হতে হবে না! তবে নিবেদনকেই বা সে দুঃখ দেয় কী করে! তাকেও একখানা সানগ্লাস তো কিনে দিতেই হয়। দিল-ও! অবিকল একই রকম দেখতে। গায়ে একই ইতালিয়ান কোম্পানির লেবেল। শুধু একটাই যা তফাত। জিনিসটা নকল। সস্তার। ধর্মতলার ফুটপাথ থেকে কেনা।

তা সেই নকল রোদচশমাতেই নিবেদন বেজায় আহ্লাদিত। আদল-নকলের তফাত সে থোড়াই বোঝে। রঙিন কাচের আড়াল থেকে ঝিকমিকের আনমনা ভাবটাই বা তার আর চোখে পড়ে কই!

দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল আরও তিনটে বছর। নিবেদনের সঙ্গে ঝিকমিকের বিয়ে হয়েছে সদ্য। উহুঁ, ঠিক সদ্য নয়, মাসপাঁচেক তো হলই। সিমলা-মানালিতে হনিমুন সারা, এখন দু'জনেই মন দিয়েছে কাজকর্মে।

হঠাৎ এক বিকেলে সমর্পণের সঙ্গে দেখা। গড়িয়াহাটে শপিং করতে এসেছিল ঝিকমিক, একখানা বাহারি বেডশিট কিনে দোকান থেকে বেরোচ্ছে, সামনে সমর্পণ! পড়ন্ত রোদে চোখে সেই সানগ্লাস! ঝিকমিক পলকের জন্য হতচকিত। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছিল, সমর্পণই রাস্তা আটকেছে, হাই ঝিক্‌স! হাউ ইজ লাইফ?

অগত্যা ঝিকমিককে দাঁড়াতেই হয়। কথাও বলতে হয়। ঝিকমিক পলকা হাসল, মন্দ কী?

—শুনলাম তোমরা বিয়েটিয়ে করে ফেলেছ?

—হুঁ।

—সেই নিবেদনকেই বিয়ে করলে? আলুভাতে মার্কাটাকে?

—ভুলটা কী করেছি? আর যাই হোক, নিবেদন ফোর টোয়েন্টি নয়।

ঝিকমিক ভেবেছিল কথাটার প্রতিক্রিয়ায় নির্লজ্জের মতো হা-হা করে হেসে উঠবে সমর্পণ। কিন্তু তেমন ঘটল না। সমর্পণ যেন চুপসে গেল একটু। শুকনো মুখে বলল, তুমি এখনও আমার উপর চটে আছ, তাই না?

—না তো। পাস্ট ইজ পাস্ট, হুবহু নিবেদনের মতো করে কথাটা বলল

ঝিকমিক। তেরচা চোখে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী খবর? কবে বিয়ে করছ মনজিনিকে?

সমর্পণ দু'দিকে মাথা নাড়ল, করছি না।

—ও! তার মানে ওকেও ল্যাং মারলে!

—না, বিশ্বাস করো...কী যে হল...সম্পর্কটা টিকল না, বুঝলে? রোদচশমাটা খুলে হাতে নিয়েছে সমর্পণ। দোলাচ্ছে অল্প-অল্প। মৃদু গলায় বলল, ওর মধ্যে তোমার মতো চার্ম নেই।

—মসকা মারছ? ভাবছ, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়বে?

—না, না। বিলিভ মি, সমর্পণ যেন একটু অস্থির, তোমার কাছে মিথ্যে বলব না। মনজিনি ছাড়াও আরও দু'চারজন এসেছে আমার জীবনে। কিন্তু... কিন্তু...ইউ ওয়্যার ডিফারেন্ট ঝিক। আমি তোমাকে সত্যিই খুব মিস করি।

ঝিকমিকের গা-টা শিরশির করে উঠল। সমর্পণের ডায়লগবাজি বিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। তবু যে কেন দুঃখী-দুঃখী মুখখানা দেখে মায়া জেগেছে বুকে! নাকি এ মায়া নয়, অন্য কিছু?

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল সমর্পণ। ক্ষণিক দেখল আকাশটাকে, তারপর রোদচশমাটাকে ফের পরে নিয়ে বলল, "বাই দ্য ওয়ে, তুমি নিশ্চয়ই হ্যাপি হয়েছ ঝিক?"

ঝিক মনে-মনে ভাবল, কী করে হব? আসল রোদচশমাটা যে তোমার কাছেই রয়ে গেল!

গলায় নকল উচ্ছলতার হিল্লোল তুলে ঝিকমিক বলল, আমি ভীষণ সুখী, ভীষণ! ♣

আজ সুবর্ণজয়ন্তী

কাকভোরে ভেতর দালানে পা রাখতেই টেবিলখানা আজ ঠক করে চোখে লাগল সুহাসিনীর। ম্যাগো ম্যা কী দশা! অমন ফুটফুটে শ্বেতপাথরের টেবিল একেবারে কালচিটে মেরে গেছে গো! কেউ একটু গতর নাড়িয়ে মোছেও না!

ঘুম জড়ানো পায়ে টেবিলের কাছে গেলেন সুহাসিনী। হাত রাখলেন পাথরে। স্নেহে, মমতায়। কতকাল পর এ টেবিল এত ফাঁকা দেখছেন। সারাক্ষণই তো কারুর না কারুর দখলে। সুহাসিনী যখন শুতে গেলেন তখনও, যখন বিছানা ছাড়লেন তখনও। এই দেখো বড় তরফের ঝন্টু বউ-ছেলে নিয়ে মুড়িছোলা খাচ্ছে, ওমনি ছোট তরফের নীপু সপরিবারে টোস্ট ওমলেট হাতে বসে গেল। দীপুরা যদি কর্তাগিন্নীতে একপাশে মাংসভাত খেতে বসে, তো অন্য পাশে ভাতের গর্তে ট্যালটেলে মুসুর ডাল ঢালে রন্টু। তারা না উঠতেই মন্টুর ডিমের ঝোল ভাত। মোদ্দা কথা, শূন্য নেই কখনই। যেমনটি আছে এখন। খাওয়া না থাকলেই বা কী! কখনও রন্টুর বউ গোটা

টেবিল ছড়িয়ে রেশনের গমের কাঁকর বাছছে, তো কখনও আটা ঠেসছে নীপুর বউ। ঝন্টুর কাজের মেয়ে ছড়িয়ে দিল ধোওয়া কাপ-ডিশ। জল ঝরাচ্ছে। বেশি বয়সে ছেলে হয়েছে বলে মন্টুর বউয়ের আবার আদিখ্যেতা খুব, যখন তখন ছেলেকে নাড়ুগোপাল সাজিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে টেবিলে। মুতবি তো বাবা ওখানেই মোত, নামিস না লক্ষ্মীসোনা! তা সে নাড়ুগোপাল জল ছেড়েছে কি ছাড়েনি, ওমনি ধুন্ধুমার। দীপুর বউ ঝামটে এল, ঝন্টুর বউ ডানা ছড়াল, রন্টুর বউ ফণা তুলল, নীপুর বউ গলা মেলাল। কথায় কথায় কীর্তন জুড়ছে পাঁচ বউ, দোহারকি দিচ্ছে বরেরা। আহা, কী দৃশ্য!

ভাবতেই বিবমিষা। আলো অন্ধকারে ভূতুড়ে রকমের একা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড টেবিল ছেড়ে বিরক্ত মুখে বারোয়ারি বৈঠকখানা পার হলেন সুহাসিনী। এসে দাঁড়িয়েছেন বড় দালানে। সামনে নতুন এক সকাল ফুটছে। পরশু শ্রাবণ সংক্রান্তি, আকাশে এখনও ভারী মেঘ, আলো বড় কম। রাতের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, এখনও চারদিক ভেজা ভেজা, প্রশস্ত উঠোনের ছোট-বড় ফাটলে জল জমে আছে। গেটের ধারে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পামগাছ সিক্ত শরীরে পথ চেয়ে আছে সূর্যের। তা তিনি আজ বুঝি বেরোবেন না, মেঘবন্দি হয়েই থাকবেন সারাদিন। পাখিরা আড়মোড়া ভাঙছে, গলা সাধছে, এবার তাদের নীড় ছাড়ার পালা।

এত ভোরে সুহাসিনী ওঠেন না আজকাল, উঠতে পারেন না। ক্ষমতায় কুলোয় না। রাতভর জেগে জেগে শেষ প্রহরেই চোখ দুটো জড়িয়ে আসে যে। প্রথম রাতেও তন্দ্রা আসে অল্প অল্প, কিন্তু তখন চোখের পাতা এক করে কার বাপের সাধ্যি! বড় তরফের ঝন্টু, মন্টু, রন্টু আর ছোট তরফের দীপু, নীপু, পাঁচ শরিকের ঘরে লাগাতার তাণ্ডব চলছে। এ-ঘরে গাঁক গাঁক টিভি, তো ও ঘরে ঝাং ঝাং টেপ। একতলায় কোনও স্বামী-স্ত্রীতে বাধল, তো দোতলায় ছেলেপিলেয়। ওপরে রন্টুর ঘরে মিয়াবিবির কোন্দল তো বাঁধা রুটিন। ঝন্টুর দুই ছেলে গোটা সন্ধে টো টো করে পড়তে বসবে রাত দশটার পর। পড়া তো নয়, দুই ভাই যেন পাল্লা দিয়ে ডাকাত তাড়াচ্ছে। নীপুর বড় মেয়েটা গান শিখছে, তারও রাত না বাড়লে গলায় সুর আসে না। দীপু

আবার আর-এক কাঠি বাড়া, সবাই নিবলে তিনি জ্বলে ওঠেন। বোতল কুমারের মোচ্ছবই শুরু হয় মাঝরাতে। হুইস্কি লাও, সোডা লাও, চিৎকার কী! ভি সি আর না ফি সি আর কী যন্ত্র কিনেছে, তাই চালিয়ে বাঁজা বউয়ের সঙ্গে বসে ন্যাংটো মেয়ের লীলা দেখে। আর সে কথা সুহাসিনীকে শুনতে হয় কি না নীপুর মেয়ের কাছে! কী লজ্জা কী লজ্জা! মন্টুটাই যা একটু পদের। শান্তশিষ্ট, বাড়ির সাতে পাঁচে থাকে না, গলা নামিয়ে কথা বলে, কিন্তু তার আবার অন্য ব্যায়রাম। দেশোদ্ধার! রাতদুপুর অবধি পার্টির ছেলেরা ঘরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, জুতোর মশমশ, চটির ফ্যাটফ্যাট, সাইকেলের কিরিরিং কিরিরিং। এত কিছুর ফাঁক গলে নিদ্রাদেবী আসবেন কোন পথে!

অগত্যা সুহাসিনীর একটাই কাজ। প্রহর গোনা। এবং প্রহর গোনা। এবং প্রহর গোনা। দূরের শালিমার ইয়ার্ডে মালগাড়ি শান্টিংয়ের গুম গুম শব্দ বাজে হঠাৎ হঠাৎ, কুকুরের পাল এ বাড়ির মানুষদের থেকেও বিশ্রী গলায় ঝগড়া করে রাস্তায়, রাত কাঁপিয়ে দুপদাপ ছুটে যায় লরি, মাথার ওপর দীপুর ঘর থেকে ছিটকে আসে অশ্লীল শব্দের ফুলকি...যমযন্ত্রণা! এরপর যে সাতটার আগে সুহাসিনীর চোখ খুলবে না, এ আর বিচিত্র কী!

তা শেষ রাতের ওই মলিন ঘুমটুকুও পুরো হল না আজ। আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে থেকেই ড্রাম বাজছে। প্রকৃতিতে নয়, পাড়ায়। সঙ্গে পোঁপ্‌পো পোঁপ্‌পো পোঁ বিউগল্‌ ধ্বনি, গটমট জুতোর আওয়াজ। মিত্তিরবাড়ির কাবুল হেঁকে চলেছে, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট...

সুহাসিনী চোখ কচলালেন। যৎসামান্য ঘুমটুকুই যা সুখ, তাও ঠিকমতো না হলে মাথা কেমন টলমল করে আজকাল। পঁয়ষট্টিতেও সুগার-প্রেশার কোনও উপসর্গই নেই তাঁর। তবু করে। বয়সটা যেন হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে চেপে বসছে। কদিন আগেও দৃষ্টি বেশ পরিষ্কার ছিল, ষাট-সত্তর গজ দূরে ওই নারকেল গাছটায় টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে এলে স্পষ্ট দেখতে পেতেন. এখন গেটের মাথায় কী নাচছে, শালিখ না কাক, তাও যেন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। ছানি পড়বে? একটা ইন্দ্রিয় বুঝি গেল তবে।

মন্টুদের ঠিকে ঝি এসে গেছে ভোর ভোর। ঝাঁট দিচ্ছে। মন্টুদের ঘরের

ধুলোময়লা ঠেলে এনে নীপুর দোরগোড়ায় জড়ো করে দিল। হায়রে মা, নীপুর বউ এখনই বেরোলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন।

—গুড মর্নিং পিসিঠাম্মা।

রন্টুর ছেলে দোতলা থেকে চটাপট নেমে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন সুহাসিনী। ঝকঝকে দাঁত মেলে। নাতির কায়দায় বাও করলেন নাতিকে, মন্নিং। এত ভোরে সেজেগুজে চললি কোথায় রে?

—বারে, আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর না! প্রভাতফেরি আছে।

—ও। ইস্কুলে?

—উহুঁ, ক্লাবে। শুনতে পাচ্ছ না, কখন থেকে কাবুলদা হুইসিল দিচ্ছে!

—তাই বল। আমি ভাবছি সকাল থেকে কিসের আবার রাজযজ্ঞি শুরু হল!

টুকাইয়ের পরনে সাদা হাফপ্যাণ্ট, ধবধবে সাদা শার্ট, গলায় ফাঁসের মতো তেরঙা টাই। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠোনের জলকাদা পার হচ্ছে টুকাই, সাবধানে, অতি সাবধানে।

একতলায় নীপুদের দরজা খুলে গেল। নিজেদের দু'কামরার মহল থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসেছে নীপুর ছোট মেয়ে। টুকাইয়েরই সমবয়সি, সবে ক্লাস থ্রি।

উত্তেজিত মুখে চিল্লিয়ে উঠল মিস্টুলি,—এই, তুই স্কুলে যাবি না?

—আগে কাবুলদার ফাংশন শেষ হোক। টুকাইয়েরও সোচ্চার উত্তর।

—তার মানে স্কুলে যাচ্ছিস না?

—যাচ্ছি না তো যাচ্ছি না। তোর কি রে?

—আজ কিন্তু স্কুলে রোল কল হবে। আন্টি বলে দিয়েছে।

টুকাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেল—আমি কাল গার্জেনের চিঠি নিয়ে যাব। মা লিখে দেবে বলেছে।

—আন্টি যদি ধরে ফেলে?

—ধুস। তুইও তো মাসির বিয়েতে গিয়েছিলি, রাঙাজেঠি জ্বর হয়েছে

লিখে দিল, আন্টি ধরতে পেরেছে? বলতে বলতে টুকাই ফিরছে পায়ে পায়ে। কাছে এসে গলা নামাল, তুইও স্কুলে যাস না। কাবুলদা আজ হেব্‌বি প্যাকেট দিচ্ছে।

মিস্টুলি দু'পা এগোল, কী দেবে রে?

—অনেক কিছু। প্যাটিস, ফিশচপ, পেস্‌ট্রি, কোল্ডড্রিঙ্কস...

—এত?

—বারে, গোল্ডেন জুবিলি না! সুহাসিনীর দিকে আড়ে তাকিয়ে নিল টুকাই, কাবুলদা বেশি হাঁটাবেও না। ব্যাতাইতলার মোড় পর্যন্ত, ব্যস। আর স্কুল গোটা শিবপুর রাউন্ড দেওয়াবে, হাতে ধরাবে টিফিনকেক আর লাড্ডু। কোনটা ভাল?

মিস্টুলি দোনোমোনায় পড়ে গেছে। মজা লাগল সুহাসিনীর, হাসছেন মিটিমিটি। নাতি-নাতনিরাই যা এখন মনের আরাম।

দুম করে নীচের ঘরের জানালা খুলে গেল। নীপুর বউ হাঁক পাড়ছে, মিস্টুলি, ঘরে চলে এসো। হাঘুরেপনা করতে হবে না।

সিঁড়ির মুখ থেকে তক্ষুনি ঝঙ্কার উড়ে এল, কী হচ্ছে কী টুকাই? কতদিন না বারণ করেছি গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না!

—আমি বলিনি মা। মিস্টুলি আমায় ডাকল।

—জানি তো। নিজেরা লোভে লক লক, অপরকে বলে হাঘুরে!

—তোর ছেলেকে কিছু বলিনি মণিকা, নিজের মেয়েকে বলেছি। কুঠুরি থেকেই কথা ছুড়ছে নীপুর বউ, তোর গায়ে লাগল কেন?

—কথা ঘুরিও না রাঙাদি। কে কোন মনে কী বলে সব বুঝতে পারি।

—সে তো বুঝবিই। তুই হলি গিয়ে বটতলার উকিলের বেটি...

শুরু হল। দত্তবাড়ি জেগে গেছে। এবার বাপবাপান্ত শাপশাপান্ত চাপান-উতোর চলল।

সভয়ে সরে এলেন সুহাসিনী। ভেতরে দালানে। সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে এই তো লাভ। দিনভর গা ম্যাজম্যাজ করবে এখন, পুজোআর্চায় মন বসবে না, সুচিন্তা মাথায় আসবে না, একটা পেঁকো গন্ধ সারাক্ষণ ম-ম করবে

নাকে। টেবিলে চোখ পড়াটাই যত নষ্টের মূল। যার ঝিরকুটেপনা দেখে চোখ করকর করে, তার পানে চোখ যায় কেন!

চোখেরও বলিহারি, সেই ফিরে ফিরে টেবিলটাকেই দেখে! পায়াগুলোও গেছে! রঙ নেই, পালিশ নেই, ছ'খানা পায়ারই কী করুণ হাল! মাঝের একটা পায়া কেতরে আছে না? কাছে গিয়ে পরখ করলেন সুহাসিনী। যা ভেবেছেন তাই, জোড় খুলে লতলত করছে, কোনও ক্রমে মেঝে আর পাথর ছুঁয়ে আছে পায়া। ঝুঁকে আলগা চাপ দিলেন সুহাসিনী, ঠেললে যদি স্বস্থানে ফেরে।

মন্টু দাঁত ব্রাশ করতে করতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে,—উবু হয়ে কী দ্যাখো গো পিসি?

—পায়াটা তো গেছে রে। একটু গজাল-পেরেক এনে ঠুকে দিতে পারিস না? একটা মিস্ত্রিও তো ডেকে আনতে পারিস।

—ও টেবিলের কি আর কিছু আছে পিসি! একপায়া সারালে আর-একপায়া যাবে।

—সব কটা সারাবি। একসঙ্গে সারাবি।

—তাহলে তো একদিন এস্টিমেটে বসতে হয়। তোমার অন্য ভাইপোদেরও বলে দ্যাখো, সবাই যা বলবে তাই হবে।

দায় এড়ানো কথা। জানে পাঁচশরিক কখনও একত্র হবে না। দুই শরিকেই বা কী করেছিল, সুহাসিনীর দুই দাদা! প্রাসাদের মতো বাড়ি খসে ভেঙে পড়ছে, বড়দা দেখায় ছোড়দাকে আঙুল, ছোড়দা দেখায় বড়দাকে। যে যার মতো কলি ফেরায় নিজের অন্দরের, বহিরঙ্গে কী রূপ দেখেও দেখে না। তাদেরই তো ছেলেপিলে সব, পৃথক আর কী হবে! হিংসেয় জ্বলে মরে, বিধাতার পরিহাসটুকু বোঝে না। অত বিবাদ, হেঁশেল ভিন্ন, কথা বন্ধ, তবু যেই না ছোট ভাই চিতেয় উঠল, অমনি পিছু নিল বড় ভাই। তিনটে মাস কাটতে না কাটতে। বছর না ঘুরতে বড় গিন্নিও হাঁটা দিয়েছে পরপারে। আর পোড় খেয়ে, মার খেয়ে, ছোট গিন্নির ঠাঁই শেষে মেয়েদের দোরে। এখানে এলে তার তো এখন তুইথুলি মুইথুলি দশা। দীপু বলে, নীচে নীপুর

ঘর বড়, ওখানে থাক। নীপু বলে, ওপরে আলো হাওয়া বেশি, সেখানে যাও। বেচারা ছোট বউ, ননদকে যে একটি দিনের তরে সইতে পারল না, এখন এ বাড়ি এলে তার ঘরই তার আশ্রয়। ভাগ্যে একখানা কামরা সুহাসিনীকে লেখাপড়া করে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা, বালবিধবা মেয়ের নামে টাকা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে, তাই না এমন ভাইপোদের অন্নদাস হতে হল না কখনও!

টেবিলটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুহাসিনী। হৃদয় নিংড়ে একটা লম্বা শ্বাস গড়িয়ে এল। নিজের জন্য নয়, ছোট বউদির জন্য নয়, বেচারা টেবিলখানার জন্য। কী ছিলি রে তুই, কী হয়েছিস!

এই বুঝি তবে জগতের নিয়ম! এজমালি হয়ে গেলে সাত রাজার ধন এক মানিকও ফেলনা হয়ে যায়। হায় রে।

সাত রাজার ধনই বটে। এমন টেবিল এ অঞ্চলের আর কেউ আর দ্বিতীয়টি দেখেনি আগে। শুধু তারা কেন, তাদের পরিচিত কেউ দেখেছে বলেও শোনা যায় না। যেমন আকার, তেমনই বাহার। প্রকাণ্ড দালানে পড়ে থাকে বলে এর বিশালত্ব মালুম হয় না, আড়ে দৈর্ঘে কমপক্ষে একখানা ছোটখাটো ঘরের সমান। ছ'ছ'খানা কারুকাজ করা দামি কাঠের ঠ্যাং, ঝকঝকে সাদা পাথরের গা ঘেঁষে লতাপাতার অপরূপ নক্‌শা, ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়, ডিম-শেপও নয়, টেবিলখানার এ এক আশ্চর্য আকৃতি।

এ টেবিলের সঠিক ঠিকুজিকুষ্ঠিও কারুর জানা নেই। তবে এই শ্বেতপাথরের টেবিলখানা ঘিরে একদা অনেক গল্পকথা চালু ছিল চারদিকে। গোটা তল্লাটে দত্তবাড়ির মার্বেল টেবিল যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। কেউ বলে এর বয়স একশো, কেউ বলে তিনশো, আবার কেউ-বা বলে পাঁচশো। কোনও পরিস্থিতিতেই অনুমানটা সত্তর আশির নীচে নামে না, তাতে নাকি এই টেবিলের মর্যাদাহানি হয়। চূড়ান্ত নব্যপন্থীদের মতে কলকাতার শেষ বড়লাট যখন এখান থেকে দিল্লিতে রাজ্যপাট উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই নাকি অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলেন টেবিলখানা। শেষমেশ ডিজাইনটা গিন্নির পছন্দ না হওয়ায় পেল্লাই ভারী গন্ধমাদন তিনি আর সঙ্গে নিয়ে যাননি, বেচে

দিয়ে যান এক পার্শি ব্যবসায়ীকে। সেই পার্শি বণিক, পেস্টনজি না সোরাবজি কী যেন নাম, তিনিও বছর দুয়েকের বেশি ব্যবহার করেননি টেবিল। ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে দেশের পশ্চিম মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, তখনই ঢুকিয়ে দিয়ে যান একে নিলামঘরে, সেখান থেকেই দত্তবাড়িতে পা রেখেছে এই টেবিল।

তা গল্পের শেষটুকুনি নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই, কিন্তু প্রথমটা প্রায় কেউই বিশ্বাস করে না। পাড়ার রোয়াকে, বৃদ্ধদের আড্ডায়, এর ওর বৈঠকখানায় কদিন আগেও সব থেকে চালু গল্পটা ছিল আর-একটু অন্য রকম। টেবিলটা সাহেব, পার্শি, নিলামঘর হয়েই দত্তবাড়িতে ঢুকেছিল বটে, তবে ও টেবিল নাকি সাহেবদেরও নয়। দিল্লির বাদশা ফারুখশিয়ার নাকি একবার এক জবরদস্ত অসুখে পড়েছিলেন, যাই-যাই দশা। এক সাহেব ডাক্তার, ইংরেজই হবে, সে নাকি প্রায় ভেলকি দেখিয়ে যমের দরজা থেকে বাদশাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই সূত্রেই প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন সাহেব, এই টেবিলও তার মধ্যে একটি। তারপর ডাক্তারের বংশধরদের হাত ঘুরেঘুরে কলকাতার নীলামঘরই হয় তার অস্থায়ী আস্তানা।

এই উপাখ্যানটি অবশ্য অধিকাংশ লোকের মনপসন্দ। হয়তো নবাব বাদশার গন্ধ আছে বলেই। তবে ফারুখশিয়ারই ওই লা-জবাব মেজখানির প্রথম মালিক কিনা তাই নিয়েও বিস্তর মতবিরোধ আছে। কেউ বলে ফারুখশিয়ারের পূর্বপুরুষ রাজপুতদের কাছ থেকে ভেট পেয়েছিল ওটা। আবার কেউবা বলে কোনো এক ভীল রাজার জঙ্গলমহল থেকে এই মহার্ঘ বস্তুটিকে লুঠে এনেছিল রাজপুতরা। সেই অরণ্যচারী কোত্থেকে এটি পেয়েছিল, নিজে বানিয়েছিল কি না, এমন এক শৌখিন টেবিলে তার কী প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ে অবশ্য আর তর্কাতর্কি জমত না বিশেষ, তার আগেই লোকজনের হাই উঠত।

এসব কাহিনি উপকাহিনি সুহাসিনীরও অজানা নয়, বরং আরও বেশিই জানেন। বাইরে প্রচরিত সব গল্পেরই মূল উৎস তো এই দত্তবাড়িই, তারাই না এসব কাহিনি ফেঁদে টেবিলটাকে ঘিরে এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি

করেছিল। এদের মধ্যে সেরা গপ্পোবাজ ছিলেন সুহাসিনীর বাবা। মাত্র দু'বছর শ্বশুরঘর করে সতেরো বছর বাপের বাড়ি ফিরে আসা বিধবা মেয়ের মন ভোলাতে হঠাৎ হঠাৎ আজব গপ্পো ফাঁদতেন তিনি। একবার বলেছিলেন এ টেবিল নাকি হস্তিনাপুরের রাজসভায় ছিল, এর ওপরেই নাকি পাশা খেলেছিলেন শকুনি আর যুধিষ্ঠির।

ওই আষাঢ়ে কাহিনিও কি পল্লবিত হয়েছিল তল্লাটে? সুহাসিনীর জানা নেই। তবে এও ঠিক, বাবার মুখে গল্প শুনে শুনে একসময়ে তাঁর সত্যি ধারণা জন্মেছিল এই টেবিল বুঝি অজর অমর অক্ষয়।

আজ, এই শেষ বয়সে এসে, সুহাসিনীর মনে বড় ধন্দ জাগে। অজর অমরই যদি হবে, কাঠের পায়া তবে খসে খসে পড়ে কেন? পাথরের নয় লয়ক্ষয় নেই, অনন্তকাল টিকলেও টিকতে পারে, কিন্তু কাঠ? হাতফেরতা হওয়ার কালে পায়াকাঠামো কি বদল হয়েছে বারবার? হতেও পারে। সুহাসিনীর বিয়ের বছরেই তো মেরামত হয়েছিল একবার, নয় কি? সেবারই না...।

বাপ রে, সে কী রই রই কাণ্ড! সেও ছিল এক শ্রাবণ মাস, অঘ্রানে সুহাসিনীর বিয়ে স্থির হল পুজোর আগে সারাই হবে টেবিল। ঠাকুর্দা সাহেব কোম্পানিতে এত্তেলা পাঠালেন, হ্যাট-কোট পরা সাহেব মিস্ত্রি নিয়ে হাজির। দশ-বারো জন মজুর হেঁইয়ো মারি জওয়ানদারি করে বৈঠকখানা থেকে দালানে বার করছে টেবিল, চাগাড় দিয়ে তুলল কষ্টেসৃষ্টে, শেষে দরজা পেরোতে গিয়েই বিপত্তি। দুই মজুর চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল, সামাল দিতে না পেরে বাকিরা ফেলেই দিল টেবিলখানা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে দু'কোণ ভেঙে টুকরো। ঠাকুর্দার কী আফশোস, সাহেবদের খবর না দিয়ে নিজেরই নাকি মিস্ত্রি লাগানো উচিত ছিল!

সেই থেকেই ও টেবিল পড়ে আছে ভেতরদালানেই। খুঁতো হয়ে। তার গল্প ইতিহাস নিয়েও আর তেমন মাথা ঘামায় না এ-বাড়ির কেউ, ভাঙা টুকরো দুটোর জন্য হা-হুতাশ তো কবেই উবে গেছে। দেড়েমুশে ভোগ করছে সবাই, এই না সুখ।

কী অত্যাচার! কী অবহেলা! কী অনাদর!

তারস্বরে মাইক বাজছে। ভোরের কুচকাওয়াজের পর থেকেই। কখনও হিন্দি, কখনও বাংলা, কখনও দেশাত্মবোধক, কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত। দেশপ্রেমের বান ডেকেছে চারদিকে।

সুহাসিনী সকালের পুজোয় বসেছেন। পুজো মানে তেমন কিছু উপাচার সাজিয়ে বসা নয়, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে দু'বেলা দু'দণ্ড নিরালা হওয়া। আজ আসন পাততে একটু দেরিই হয়ে গেল। স্নানে যাবেন, মন্টুর বউ বলল আজ নাকি শুভদিন। কিসের শুভদিন শ্রীহরিই জানেন, ঘরে ঘরে তো কলহের কামাই নেই! নীপু, রন্টু সেই থেকে গজরাচ্ছিল, সবে থামল। খানিক আগে কী মুখখারাপটাই না করল দীপু, কানে আঙুল দিতে হয়। তারে মেলা পাঞ্জাবিতে কে না কে ব্লেড মেরে রেখেছে! ঝন্টুর বড় ব্যাটার কারসাজি হলেও হতে পারে, গোঁফ গজাতে না গজাতেই যা ত্যাঁদোড় হয়ে উঠেছে ছোকরা। তারপরও মন্টুর বউয়ের মুখে শুভদিন কথাটা শুনে সুহাসিনীর বুক যে কেন কুনকুনিয়ে ওঠে! স্নানে না গিয়ে ঘর গোছাতে বসলেন সাতসকালে। কীই বা আছে ঘরে, একটা ছোট পালঙ্ক, আয়না বসানো ঢাউস কাঠের আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, দুটো মিটসেফ, আর একখানা সাবেকি আলনা। তাই ঝাড়তেই ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পার। আর একটু আগে হত, যদি না রাজ্যের লোকের আমোদ দেখতে সতেরোবার ছুটতেন বাইরে।

হ্যাঁ, আমোদ একটা হচ্ছে বটে। দিনটা তো প্রতিবারই আসে, প্রতিবারই যায়, সুহাসিনী তেমনভাবে টের পান কই! এবার যেন জাঁকজমক চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বলে কথা। লরির পর লরি চলেছে ঢিকির ঢিকির, লরির পিঠে দুলে দুলে গান গাইছে ছেলেমেয়েরা। ব্যান্ড-পার্টিই গেল কত, সাতটা আটটা দশটা...গুনেগুনে শেষ হয় না।

গুমগুম কিল পড়ছে দরজায়, ধ্যানে বিঘ্ন ঘটল সুহাসিনীর। হাঁক পাড়লেন, কে রে?

—আমি। শামু।

হঠাৎ ঝন্টুর ছোট পুত্তুর কেন? সুহাসিনী গলা খাঁকারি দিলেন, কী চাই?

—দরজা খোল না। এক্সাইটিং নিউজ।

সেভেনে উঠল ছোঁড়া, খুব ইংরেজি ফটর ফটর করে। ধীরে সুস্থে দরজা খুললেন সুহাসিনী, কী নিউজ শুনি?

শামুর পরনে এখনও স্কুলড্রেস। হাঁপাচ্ছে। বলল, তুমি রান্না বসাওনি তো পিসিঠাম্মা?

—আ-মোলো যা, এখনও বলে আমি দাঁতে কুটোটি কাটিনি! সুহাসিনী চোখ ঘোরালেন, কেন?

—রান্না বসিও না। আজ তোমার নেমন্তন্ন।

—কোন চুলোয়?

—আজ একটাই চুলো জ্বলবে।

কথাটা সুহাসিনীর বোধগম্য হল না, ফ্যাল ফ্যাল তাকাচ্ছেন।

শামু কায়দা করে ঘাঁড় ঝাঁকাল, আজ সবাই মিলে ফিস্ট হবে। বাবা, বড়কাকা, মেজকাকা সব একসঙ্গে বসে ডিসিশন নিয়েছে। মা তোমায় বলতে বলল। তোমার জন্য আজ স্পেশাল ভেজিটেরিয়ান ডিশ।

সুহাসিনী দপ করে চটে গেলেন, বচ্ছরকার দিনে আমায় নিয়ে মজা হচ্ছে?

—মজা নয় পিসিঠাম্মা, ফ্যাক্ট। বড়কাকা তো একটু আগে খুব চেঁচাচ্ছিল, বাবা গিয়ে প্রোপোজালটা দিতেই গলে জল। ছোটকাকা, রাঙাকাকা সব্বাই জয়েন করছে।

—আর তোর কাকিমারা?

—মিলে গেছে। শামু চোখ টিপল, হাতে হাত ধরে সব রান্না করবে আজ। লম্বা লাইন করে।

সুহাসিনীর তবু বিশ্বাস হয় না। শামুটা অম্লানবদনে ফক্কুড়ি মেরে যেতে পারে। এক্ষুনি হয়তো কোনও বউকে জিজ্ঞেস করতে গেলে ছ্যারছ্যার চারটি

কথা শুনতে হবে সুহাসিনীকে।

তখনই মন্টুর মহলের দিকে চোখ গেল। ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে ছেলে কোলে বেরিয়েছে মন্টু। গলা ওঠালেন সুহাসিনী, অ মন্টু, এদিকে শোন। শামু যা বলছে তা কি সত্যি?

মন্টু হাসিমুখে এগিয়ে এল, কী ব্যাপারে বলো তো?

—আজ নাকি তোরা সবাই এ বাড়িতে ফিস্ট করছিস?

—সবাই বলছো কেন, তুমিও আছ। চাঁদা তুলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া আর কি। ভাবছিলাম, আজকের দিনটা অভিনব উপায়ে সেলিব্রেট করব...দাদা প্রস্তাবটা দিল...

সুহাসিনী প্রায় গলে গেলেন, আমায় কত দিতে হবে?

মন্টু হো হো হেসে উঠল, তোমার কিছু লাগবে না। তুমি আজ গোল্ডেন জুবিলির চিফ গেস্ট।

—কেন, দিই না কিছু।

—উহুঁ, সবাই মিলে আমরা ডিসাইড করেছি। দাদা, মেজদা, রন্টু, নীপু...

—তোরা সব্বাই একত্র হয়েছিলি! আহ্লাদে চোখ পিটপিট করছেন সুহাসিনী, টেবিলের কথাখানা তুলেছিলি বাপ?

মন্টুর বুঝতে বুঝি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপরই হেসে উঠেছে আবার। আরও উচ্চৈঃস্বরে, তুমি কী গো পিসি! আজকের দিনে কেউ অমন সেন্সেটিভ কথা তোলে?

—একবার বললে পারতিস।

—বলবখন। সময়মতো। তাল বুঝে। বলতে বলতে ঘড়ি দেখছে মন্টু, দামুটা এখনও ফিরছে না কেন? আমাকে আবার বেরোতে হবে...

—কোথায় গেছে দামু?

—বাজি কিনতে। আমিই পাঠালাম। স্বাধীনতার গোল্ডেন জুবিলিতে বাড়িতে ফ্ল্যাগ তোলা হবে, একটু পটাকা ফাটবে না তা কি হয়! এটা সেরেই আমাকে একবার হাওড়া ময়দান ছুটতে হবে। বক্তৃতা আছে। সেখান থেকে

একবার বাকসাড়া ঘুরে...চার পাঁচটা আইটেম রান্না হবে, দেড়টা দুটোর আগে ফিরলেই হল, কি বলো পিসি?...এই শামু, তোর দাদাকে দ্যাখ না, কোথায় গেঁজে গেল!

শামু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। পায়ে পায়ে উঠোনে নামল মন্টু। দোমহলা বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচাচ্ছে, দাদা, মেজদা, রন্টু, নীপু, কী হল রে তোদের? তাড়াতাড়ি নাম।...মেয়েরা, এসো।

সবার আগে একতলা থেকে বেরিয়ে এল নীপু, নীপুর বউ। সঙ্গে বুলবুলি, সে আজ সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ি পরেছে। দোতলা থেকে বাজারের থলি হাতে নেমে আসছে দীপু আর মন্টু, রন্টুর বউ তাদের পিছন পিছন। রন্টু আর দীপুর বউ হাসতে হাসতে সিঁড়ি ভাঙছে, বাকি দুই বউও বেরিয়ে এল মন্টুর ঘর থেকে।

সুহাসিনীর চোখে পলক পড়ছিল না। পিলপিল করে হাসিমুখে জড়ো হচ্ছে পাঁচ শরিক, এও কি সম্ভব? গেটে একটা ইয়া বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তার ডগায় পতপত নেচে উঠল তেরঙা ঝাণ্ডা। পটকা ফাটছে, শাঁখ বাজছে, উলু দিচ্ছে বউরা...। সুহাসিনী ভোরের দুঃখ ভুলে গেলেন।

পতাকার এত গুণ! নাকি জুবিলির!

নাহ্, সত্যিই আজ শুভদিন।

জব্বর মেনু হয়েছে আজ। বাসমতি চালের ভাত, সোনামুগের ডাল, দিশি ভেটকির ফ্রাই, ইলিশের ভাপা, মুরগির কারি, আমসত্ত্বর চাটনি। শেষ পাতে দইও আছে। ছেলেপিলেদের খাওয়া সারা, কর্তারা এবার বসল। শ্বেতপাথরের টেবিলে। পাঁচ বউ পরিবেশন করছে ঘুরে ঘুরে। সুহাসিনী প্রধান অতিথি হলেও হাত গুটিয়ে বসে নেই, মোড়ায় বসে তদারকি করছেন খাওয়াদাওয়ার।

বেলা বাড়ার পর মেঘ সরে গেছে অনেকটা। সূর্যের হাসিখুশি মুখ দেখা যায় মাঝে মাঝে। রোদ কম, ঝাঁঝও কম। বাষ্পবোঝাই বাতাস বইছে থেকে থেকে, ঘাম জমছে অল্প অল্প, তাপ কম বলে ঘামটুকু মন্দ লাগে না।

উঁচু সিলিং-এ ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় আরাম হচ্ছে বেশ।

ফিশফ্রাই-এ কামড় দিয়ে নীপু বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে গেলে পারতে পিসি।

—মরণ! সুহাসিনী মুখ টিপে হাসলেন, আমাকে কোনও দিন তোদের ওই টেবিলে বসতে দেখেছিস?

—আজ বসতে। সারা জীবনে তো মাটিতে বসেই খেয়ে গেলে।

—আমার মাটিই ভাল। আমি ওসব ছোঁয়াছুঁয়ি ম্লেচ্ছপনার মধ্যে নেই। বাপ-দাদার আমলেই টেবিলে বসলুম না...

ঝন্টু বলল, পিসির খাবার তোমরা আলাদা করে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ দাদা। দীপুর বউ উত্তর দিল,—পিসির রান্না আলাদা গ্যাসে হয়েছে। আমিষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

রন্টু মিটিমিটি হাসছে, পিসি আজ কী কী সাঁটাচ্ছে?

নীপুর বউ মুখে আঁচল চাপা দিল, ছানার ডালনা, আলু কাঁচকলার কোপ্তা, নারকেলের পুর দিয়ে পটলের দোলমা,...

—ও গ্রান্ড! করেছ কী পিসি? তোমারই তো আজ কপাল গো।

সুহাসিনীর অন্তরটা তরল হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়ার লোভে নয়, তার প্রতি সকলের এই নজরটুকু দেখে। হোক না ক্ষণিক, তবু এতো সত্যি বটে। মুহূর্তের জন্য মনে হল এই সুখী সময়ে টেবিলটার কথা তোলেন একবার। তার আগেই ঝন্টু বলল, পিসি, লাস্ট তুমি কবে এমন মেনু খেয়েছ গো?

দীপু অস্ফুটে বলল, তুই খাওয়ার আগে।

ঝন্টু ভুরু কুঁচকে তাকাল, কী বললি?

দীপু খ্যাক খ্যাক হাসল, বলছি, তুই যবে লাস্ট এত ভাল মেনু খেয়েছিস, তার আগে।

—তুই কিন্তু আমায় টন্ট করলি দীপু।

নীপু ফস করে ফুট কেটে উঠল, ওমা, তুমি টন্টও বোঝ?

রন্টু বলল, অমনভাবে কথা বলছিস কেন রে? আমরা কি ভুখ্‌খার পার্টি, খেতে পাই না? নাকি কনট্রিবিউশন কম দিয়েছি?

দীপু বলল, কনট্রিবিউশন দেখাস্ না রন্টু। তোরা তিনজন, দাদার ফ্যামিলি চারজন, তোদেরও যা কনট্রিবিউশন, আমাদের দুজনেরও তাই।

রান্নাঘরের দরজা থেকে রন্টুর বউ নাক গলাল, তার জন্যই তো আপনার পাতে বড় পেটিটা পড়েছে মেজদা। মেজদি কি ওটা এমনি এমনি আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিল?

নীপু মন্টুকে বলল, কী ভাষা রে তোর বউয়ের! লঘুগুরু জ্ঞান মুছে গেল!

মন্টু কড়া গলায় বলল, নিজের দাদাকে বল কথাটা। একশো টাকা চাঁদা দিয়ে সে কিছু আমাদের কিনে নেয়নি।

—না, তোমরাই কিনেছ। ঝামটে উঠল দীপুর বউ, তাকিয়ে তাকিয়ে কার পাতে কী পড়ল তাই দেখা হচ্ছে! জন্মে কোনও দিন চল্লিশ টাকা কিলোর চাল খেয়েছ? আমাদের কল্যাণে তো জুটল। এখন হাত শুঁকে শুঁকে বছর চালাও।

ঝন্টুর বউ খেঁকিয়ে উঠল, চোপ। এমন চাল আমার ঘরের ঝি-চাকরে খায়।

—হ্যাঁ। নীপুর বউ ভেংচে উঠেছে, আমরা তো চাঁদে থাকি, কার উনুনে কি বসে দেখতে পাই না! মেঝে থেকে মুড়ি কুড়িয়ে টিফিন বাক্সে ভরে কে?

সুহাসিনী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সংবিৎ ফিরতে চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই, কী হচ্ছে কী! থামো থামো, এমন একটা দিন কেউ ঝগড়া করে নষ্ট করে!

ঝন্টু গর্জে উঠল, দিন মারিও না পিসি। ওই মন্টুটার জন্য আজ হারামিদের সঙ্গে এক পাতে বসতে হল।

নীপু হুল ফোটাল, তোমার যেন নোলা কম, হ্যাহ্!

—তবে রে শালা। থালা ঠেলে উঠে পড়েছে ঝন্টু। ছুটে গিয়ে ঘেঁটি চেপে ধরেছে নীপু। দীপু দাঁড়িয়ে উঠে এক লাথিতে চেয়ার ফেলে দিল, দৌড়ে এসে হেঁচকা টান দিল ঝন্টুকে, পলকে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফালা ফালা।

তিন মিনিটে দালান রণক্ষেত্র হয়ে গেল।

ফাঁকা হয়ে গেছে টেবিল। শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে থাকা লোকজনও। যার যার থালা-বাটি-গ্লাস নেমে গেছে কলতলায়, পাঁচ অংশে ভাগ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সারা টেবিল জুড়ে এখন শুধু আধখাওয়া মাংসের টুকরো, মাছের কাঁটা, চাটনির মণ্ড, ডেলা ডেলা ঝাল ঝোল মাখা ভাত। লাল পিঁপড়ে উঠছে সার বেঁধে, প্রায় ছেয়ে ফেলেছে টেবিলটা। আঁশ আঁশ দুর্গন্ধে ভারী-হয়ে আছে দালানের বাতাস।

বাথরুম থেকে বালতি টেনে আনলেন সুহাসিনী, জল ভরা। খালি পেট মোচড় দিচ্ছে, ন্যাতা ভিজিয়ে মুছতে শুরু করলেন টেবিলটাকে। প্রাণপণে নাকে কাপড় চেপে রেখেছেন, তবু গুলিয়ে ওঠে গা। তারমধ্যেই নজরে পড়ছে টেবিলময় চুলের মতো সরু সরু দাগ। অসংখ্য। পাথরও কি ফাটতে শুরু করল!

দামু বুলবুলি উঁকি দিচ্ছে বারোয়ারি বৈঠকখানা থেকে। কৌতূহল চাপতে না পেরে দালানে বেরিয়ে এল টুকাই মিস্টুলি শামু। যে পিসিঠাম্মা জন্মে কোনও দিন এঁটো টেবিলে হাত ছোঁয়ায় না, সে কিনা পাথরে ন্যাতা বোলাচ্ছে! এ যে বড় আজব দৃশ্য!

দরদর ঘামছেন সুহাসিনী। একা হাতে আর পারছেন না। অতিকায় টেবিল ক্রমশ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠল।

ক্লান্ত স্বরে সুহাসিনী ডাকলেন, দেখিস কি বাছারা? আয়, তোরা অন্তত হাত লাগা। ♣

কে ঠকে! কে ঠকায়!

ক্যামাক স্ট্রিটের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শপিং কম্‌প্লেক্স থেকে বেরিয়ে গাড়ির নরম গদিতে শরীর ছেড়ে দিল জয়িতা। সদ্য কেনা শাড়িখানা বার করল প্যাকেট খুলে। ক্রেপসিল্‌কের ওপর বাদলা কাজ, রাতের আকাশে যেন তারা ফুটে আছে অগুন্তি। আহা, এমন চোখটানা রং কি আর মেলে সচরাচর! শুধু একটাই যা মন খুঁতখুঁত, আঁচলের কাছে এক জায়গায় সুতো উঁচু হয়ে আছে সামান্য। আলগোছে ভাঁজ খুলে জয়িতা আর একবার আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল জায়গাটাকে। নাহ্‌ দোকানদার বোধহয় ঠিকই বলেছে। খুঁত নয়, ডবল ধাগা। নামি দোকান, ফিক্সড-প্রাইস, কড়কড়ে একুশশো টাকা দাম নিল, এইটুকুর জন্য ওরা কি আর ঠকাবে? গুডউইলে দাগ পড়ে যাবে না?

ট্রাফিক সিগনালে থমকেছে গাড়ি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানলায় এক কিশোর,—ফুল নেবেন মেমসাহেব? রজনিগন্ধা? একদম ফেরেশ আছে।

জয়িতা চমকে ঘাড় ঘোরাল। খড়িওঠা খসখসে কালো মুখ, পরনে অতীব নোংরা ঢোলা টি-শার্ট, হাতে ফুলের গোছা ছেলেটি প্রায় মুণ্ডু গলিয়ে দিয়েছে জানালা দিয়ে। বদ মতলব নেই তো?

ঝটপট ভ্যানিটি ব্যাগখানা ঊরুর তলায় চালান করে দিল জয়িতা। শাড়িখানাও পাকিয়ে পুরে ফেলেছে প্যাকেটে।

ছেলেটা ফের বলল—নিন না মেমসাহেব। মাত্র দশ টাকা ডজন।

জয়িতা নাক কুঁচকোল,—কোথাকার ফুল? পার্কস্ট্রিটের কবরখানার?

—না না মেমসাহেব। শ্মশান কবরখানার ফুল আমরা বেচি না। এ জগন্নাথ ঘাটের ফুল।

—মিথ্যে কথা বলিস না।...তিন টাকায় দিবি?

—পারব না মেমসাহেব। সাত টাকা করে কেনা। হাত দিয়ে দেখুন, একদম টাটকা মাল।

—অ্যাঁঅ্যাহ্, তুঁতের জলে ডোবানো...বারো হাত ঘোরা...চার টাকা হলে দে।

—অন্তত কেনা দামটা দিন। সাত টাকা।

—বললাম তো চারটাকার বেশি দেব না।

—হয় না মেমসাহেব। অন্তত আর একটা টাকা বাড়ান।

—উহুঁ, চার। পারলে দে, নয়তো ভাগ্।

—আর একটা টাকা দিন না মেমসাহেব। নিন না, নিন না।

—আমার যা বলার বলে দিয়েছি। এক পয়সাও বেশি দেব না। কবরখানার বাসি ফুল গছাচ্ছিস্...

ছেলেটা বিরস মুখে মাথা বার করে নিল জানালা থেকে। দৌড়েছে আর একটা গাড়ির জানলায়। একই রকম ঘ্যানঘেনে সুরে অনুনয় জুড়েছে আবার। আরোহী এক হৃষ্টপুষ্ট কেজো ভদ্রলোক, তিনি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

জয়িতার ভুরুতে ভাঁজ। ডাকবে ছেলেটাকে? নেবে? ফুলে ঘরের শোভা বাড়ে, দু'ডজন তো নেওয়াই যায়। ফুলগুলো তো কবরের নাও হতে পারে। হয়তো ছেলেটি সত্যি কথাই বলছে। আটের জায়গায় দশ পড়বে, দু-ডজনে দু-টাকা কি খুব বেশি ঠকা?

ভাবতে ভাবতেই লাল আলো সবুজ। স্টার্ট নিয়েছে গাড়ি। যানবাহনের জঙ্গলে হারিয়ে গেল ফুল-বেচা কিশোর। ♣

দোলাচল

বাড়ি ফেরার পথে মনস্থির করে ফেলল অঞ্জন। অনেক হয়েছে, আর নয়, আজই কথাটা বলে ফেলতে হবে শান্তাকে। বলতেই হবে। কতদিন আর এভাবে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা যায়! এবার একটা এসপার-ওসপার দরকার।

ছুটন্ত মিনিবাস এখন ভিড়ে ভিড়। একটু আগেও অঞ্জন যখন স্ট্যান্ড থেকে উঠেছিল, তখন বেশ ফাঁকা ছিল বাস, বসার জায়গাও ছিল কিছু, পার্কস্ট্রিট পেরোতে না পেরোতে মানুষ উপচে পড়ছে, কটু ঘামের গন্ধে বিজবিজ চারদিক। ক'দিন ধরে গরমও পড়েছে খুব, জানলার ধারে বসেও যেন ঠিক আরাম হচ্ছিল না অঞ্জনের। কসরৎ করে পকেট থেকে রুমাল টেনে এনে মুখ মুছল অঞ্জন। এখনও রুমালে সুবাসটা লেগে আছে। কস্তুরীর সুবাস। হয়তো বা চোখের জলও। অঞ্জন কাছে থাকলে কস্তুরী নিজের রুমাল ব্যবহার করে না, অঞ্জনেরটাই তার চাই।

চোখ বুজে কস্তুরীকে চোখে আনল অঞ্জন। মেয়েটা এখনও বড্ড

ছেলেমানুষ। বাচ্চা মেয়ের মতো কারণে-অকারণে হাসি, কথায় কথায় অভিমান, একটুতেই খুশি, দ্যাখ না দ্যাখ চোখ টলটল। কে বলবে মেয়েটার ভেতরে অত চাপা কষ্ট আছে? কোন এক মোদো মাতালের সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল, এক বছরের মধ্যে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে, ডিভোর্স নিয়েছে, মনের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, চাকরি-বাকরি করছে...!

নাকি কষ্টটা আছে, অঞ্জনকে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে থাকে কস্তুরী? নিশ্চয়ই তাই। অঞ্জনই তো তাকে প্রথম ভালবাসতে শেখাল, নতুন করে স্বপ্ন দেখাল, জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল আবার। অঞ্জন এখন কস্তুরীর সব থেকে বড় আশ্রয়।

তবু আজ কস্তুরী দুম করে বলল,—এভাবে আর কতদিন কাটাব আমরা? এরকম ভেসে ভেসে?

অঞ্জন কাছে টেনেছিল কস্তুরীকে,—কেন? হঠাৎ আজ একথা মনে হল কেন?

—অফিসে সব জানাজানি হয়ে গেছে। মাধবীদি আজ জিজ্ঞেস করছিল, তোদের এই সম্পর্কের পরিণতি কী?

—তুমি কী বললে?

—কী বলব? আমি তো কিছুই জানিনা। কস্তুরী আঙুলে পাকাচ্ছিল অঞ্জনের রুমালটাকে, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল,—ডিভোর্সী মেয়ে আমি, আমায় নিয়ে কত লোক কত কথা বলে...মাধবীদি বলছিল, অঞ্জন রায় বউ-বাচ্চা ছেড়ে তোকে কোনও দিন বিয়ে করবে না। দেখিস্, খেলাবে।

অঞ্জন গুম হয়ে গিয়েছিল,—তোমারও কি তাই বিশ্বাস? তোমারও কি মনে হয় আমি তোমায় খেলাচ্ছি?

—আমি কি তাই বলেছি? অফিসে সবাই যা বলাবলি করে...

—বলুক যে যা খুশি। সকলকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে দেব আমরা। অঞ্জন একটুখানি দম নিয়ে বলেছিল,—তুমি তো জানো, তোমাকে আমি কী ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি...। আর কটা দিন সময় দাও আমায়, প্লিজ।

রানীকুঠি এসে গেছে, হাঁকাহাঁকি করছে কন্ডাক্টর। পকেটে রুমাল গুজে

অঞ্জন উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে এগোল গেটের দিকে। সামনেই মার হাত ধরে একটা বাচ্চা ছেলে, গুঁতো-গুঁতিতে ছটফট করছে বেচারা। একদম বুবাই-এর বয়সি। অঞ্জন টপকে যেতে গিয়েও কী ভেবে ছেলেটার হাত ধরে ফেলল, সাবধানে নামিয়ে দিল বাস থেকে। ছেলেটার মা ধন্যবাদ গোছের কিছু বলল যেন, অঞ্জনের কানে গেল না। অন্যমনস্ক মুখে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বুবাই-এর জন্য আজ কী একটা কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল না শান্তা? রঙপেন্সিল? স্টিকার? চার্টপেপার? মনে পড়ছে না। থাক, শান্তা নিজেই কিনে নেবে। শান্তা যদি বুবাইকে না ছাড়ে, যদি জোর করে নিয়ে চলে যায়, তখন তো ছেলের জিনিস তাকেই কিনতে হবে। এখন থেকেই বরং অভ্যেসটা হোক।

ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল অঞ্জনের! সাড়ে চার বছরের বুবাই তার বড় আদরের। শান্তাকে নয় ছেড়ে দিতে পারবে, কিন্তু বুবাই? ওদিকে আবার ছেলে না দিলে শান্তাই বা থাকে কী নিয়ে? সমস্যা। সমস্যা। একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা যায়। বুবাই নয় কিছুদিন মার কাছে রইল, কিছুদিন বাবার...। শান্তা কি রাজী হবে?

যাকগে যাক, তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। অঞ্জন মন্থর পায়ে হাঁটা শুরু করল। হঠাৎ কোথ্‌থেকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করছে শরীরে। অফিস ছুটির পর প্রতিদিন কস্তুরী আর সে গিয়ে বসে থাকে গঙ্গার ধারে। নদীর স্নিগ্ধ বাতাস আর কস্তুরীর টাটকা নিঃশ্বাস সঞ্জীবনী হয়ে সপ্রাণ করে দেয় তাকে। আজও তো ছিল, খানিক আগেও! তবু কেন এত শ্রান্তি? তবে কি কস্তুরীর কথা শান্তাকে বলতে হবে বলে মনে মনে টেনশন হচ্ছে অঞ্জনের?

বাড়ির দরজায় এসে বেল টিপল অঞ্জন। অন্য দিনের মতো জোরে জোরে নয়, বেশ আস্তে। যেন কোনও অপরিচিত বাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

শান্তা দরজা খুলেছে,—এসেছ? দ্যাখো, দিদি তোমার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

দিদি মানে অঞ্জনেরই দিদি। কাছেই থাকে, বাঁশদ্রোণীতে। অঞ্জনের

বিয়ের পর ভাইকে কাছাকাছি রাখবে বলে নিজে বাড়ি দেখে দিয়েছিল দিদি। আগে রোজই আসত, বছর দুয়েক হল ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর চাপে উপস্থিতি একটু কমেছে।

অঞ্জন ঢুকতেই দিদি বলল,—এত দেরি করলি কেন?

—কাজ ছিল। ওভারটাইম।

—তাই বল্। তা এই যে রোজ রোজ ওভারটাইম করছিস, এক্সট্রা টাকাপয়সাগুলো জমাচ্ছিস তো?

—যেটুকু পারি জমাই।

—হাঁ, জমা। কদ্দিন আর ভাড়াবাড়িতে থাকবি? এবার একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট বুক করার চেষ্টা কর।

শান্তা রান্নাঘরে ঢুকে গেছে, চায়ের জল বসাচ্ছে বোধহয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল,—ওই কথাটাই তোমার ভাইকে ভাল করে বোঝাও তো দিদি। এইটুকু-টুকু দু'খানা ঘরে থাকি, তাও নিজের নয়...জল নিয়ে নিত্য অশান্তি হচ্ছে, দরকার হলে দেওয়ালে একটা পেরেক পর্যন্ত পোঁতা যায় না...

অঞ্জন মনে মনে বলল, অশান্তি তোমার যাবে না শান্তা। ফ্ল্যাট হয়তো কোনও দিন হবে, কিন্তু সে ফ্ল্যাট তোমার হবে না।

মুখে বলল,—আমি ভাবি না কে বলল? কত প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলেছি জানো?

—খুউব ভাল। করতে হলে এই বয়সেই করে ফ্যাল। আমাদের তো আর হয়ে উঠল না, তোর নিজস্ব একটা কিছু হলে আমারও ভাল লাগবে।

দিদির স্বরে হাল্কা বিষাদ। দুঃখবিলাস! নিজের অত বড় শ্বশুরবাড়ি, তবু আপনি-কোপনি হয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি বলে হাহাকার!

অনর্থক কথা বাড়াল না অঞ্জন। ঘরের কোণে ছোট ছোট রঙিন পিচবোর্ডের টুকরো জোড়া লাগিয়ে ছবি বানাচ্ছে বুবাই। পশু পাখি মাছ ফুল পাতা। ছেলেটা বড় শান্ত, নিজের ছোট্ট জগতে তন্ময় হয়ে থাকে দিনরাত। অঞ্জন এগিয়ে গিয়ে ছেলের কোঁকড়া চুলে আলগা হাত বোলালো। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে, চা শেষ করে, ঢুকে গেল বাথরুমে।

বাথরুমটা বেশ ছোট। মলিন। স্যাঁতসেঁতে। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে

বাড়িওলা শাওয়ার লাগিয়ে দেবে বলেছিল। দেয়নি। চৌবাচ্চা ব্যাপারটাকে বড়ো স্থূল গেঁয়ো মনে হয় অঞ্জনের, তবু কী আর করা! শান্তার মতো রসকষহীন নারীকে সে যখন এতকাল সহ্য করেছে, তখন এই চৌবাচ্চাকেও না হয় আর কিছুদিন...। শান্তার মতো ঘরে বসে বসে ধুমসো হওয়া মেয়ে নয় কস্তুরী...। দুজনের চাকরি করা সংসারে স্বচ্ছন্দে আধুনিক ফ্ল্যাট বানানো যাবে। মগে করে গায়ে হড়াস হড়াস জল ঢালল অঞ্জন। কস্তুরীর রুচি আছে, ভারী শৌখিন ভাবে সাজাবে ফ্ল্যাটখানাকে। কিন্তু শান্তাকে কথাটা বলা যায় কেমন করে? ঝপ করে বলে দেবে? আকস্মিক শকে বিবর্ণ হয়ে যাবে কি আটপৌরে শান্তা? গায়ে সাবান ডলল অঞ্জন, চেপে চেপে সারাদিনের জমে ওঠা ক্লেদ তুলছে দেহ থেকে। রইয়ে-সইয়েও বলা যায়, যাকে কিনা বলে আস্তে আস্তে ভাঙো। একথা সেকথার মাঝে অল্প ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে, তারপর পুটুস করে একসময়ে...!

তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে আবার একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল অঞ্জন। বেচারা শান্তা!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অঞ্জন দেখল দিদি চলে যাচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে শেষ আলাপ সারছে শান্তা। অঞ্জন একটু নিশ্চিন্তই হল। যাক, এবার শান্তাকে একলা পাওয়া যাবে। শোওয়ার ঘর থেকে চুল-টুল আঁচড়ে সোফায় এসে বসল অঞ্জন। অনেকক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। নীলচে সাদা ধোঁয়া ঘন থেকে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

বুবাই টিভিতে মগ্ন। কার্টুন ফিল্‌ম। চলমান ছবি দেখে কখনও হেসে উঠছে নিজের মনে, কখনও বা চোখ বড় বড়।

অঞ্জন ছেলেকে ডাকল,—কী রে বুবাই, তুই আজ আমার সঙ্গে একটাও কথা বললি না যে?

—বারে, তুমি যে পিসির সঙ্গে কথা বলছিলে!

—এখনও কথা বলছিস না যে?

—বারে, টিভি দেখছি যে!

অঞ্জন বলতে চাইল, আমাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো বুবাই? স্বর ফুটল না। ছেলের নিমগ্ন ঘোর কাটিয়ে দেওয়া বড় বেশি নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে।

শান্তা পাশে এসে বসেছে। ছেলেকে বলল,—তুমি কিন্তু আজ সন্ধে থেকে একটুও পড়াশুনা করলে না বুবাই।

বুবাই-এর চোখ আবার টিভিতে,—বারে, তুমি তো বিকেলে ওয়ান টু থ্রি ফোর লেখালে।

—আর রাইমস কে মুখস্থ করবে?

—সব রাইমস আমি জানি।

—বল তো দেখি।

—উঁ উঁ উঁ...। বুবাই শরীর মোচড়াচ্ছে।

অঞ্জন ইঙ্গিতময় সুরে বলে উঠল,—ছেলে নিয়ে তোমায় অত চিন্তা করতে হবে না। বুবাই খুব ইন্‌টেলিজেন্ট, দেখো ও ঠিক শাইন করবে।

—যত ইনটেলিজেন্ট হোক, ঘষামাজা না করলে কিছু হয় না।

—সব হয়ে যাবে।

—তোমার তো খালি ওই এক কথা। বুবাইকে সামনের বছর হাই স্কুলে দিতে হবে, সে খেয়াল আছে?

—দিও।

—কোন স্কুলে চেষ্টা করা যায় বলো তো?

—তুমি কোন স্কুলে দিতে চাও?

—আমার তো বাবা সেন্ট পিটারসই বেশি পছন্দ।

শখ কী বাপস্! ওই স্কুলে ভর্তি করাতে কম করে হাজার দশেক টাকার ধাক্কা, তাও যদি ধরে-করে চান্স পাওয়া যায়। শান্তা অত টাকা পাবে কোথ্‌থেকে? অ্যালিমনি চাইবে কিছু? আইন মোতাবেক খোরপোশ তো কিছু দিতেই হবে অঞ্জনকে। দিয়েই দেবে না হয়। বুবাইকে বড় করার দায় যে অঞ্জনেরও আছে এ কথা সে অস্বীকার করেই বা কী করে!

এখন কি কথাটা বলে ফেলবে শান্তাকে? বলাই যায়, এখনই বোধহয় প্রকৃষ্ট সময়। অঞ্জন মনে মনে শুরুটা ভেঁজে নিল,—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল শান্তা।

—কী কথা?

—কথাটা একটু সিরিয়াস। তোমাকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে।

পলকের জন্য ভুরুতে ভাঁজ পড়ল শান্তার, পলকে মিলিয়ে গেল। সহজ স্বরে বলল,—সত্যি সত্যি কোথাও ফ্ল্যাট বুক করেছ?

—না।

—অফিসের কোনও প্রবলেম?

—না। অঞ্জন সামান্য অসহিষ্ণু,—অন্য কথা।

—তাহলে পরে বোলো। আমি আগে বুবাই-এর খাবারটা গরম করে আনি। উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকাল শান্তা,—তুমি রুটি খাবে, না ভাত?

অঞ্জন হতাশ। চোখ বুজে ফেলল,—রুটিই করো।

কাজের পর কাজ চলছে শান্তার। বুবাইকে খাওয়ানো রীতিমতো ধৈর্যের কাজ, অনেক সাধ্যসাধনা করে নরমে-গরমে সেই পাট চোকাল শান্তা, খান আষ্টেক রুটি করল, ফ্রিজের হিমায়িত খাবার বার করে গরম করছে, কাল সকালে কাজের লোকের বাটনার জন্য মেপেজুপে মশলা বের করে রাখল গ্যাস স্টোভের পাশে, গরমে দুধ কেটে যায় বলে আবার জ্বাল দিল দুধ, নৈশাহার সাজাচ্ছে ডাইনিং-টেবিলে। অঞ্জনের সিরিয়াস কথা শোনার সময় কই শান্তার!

নাহ্, খেতে বসেও কথাটা পাড়া গেল না। রোজ রোজ বাজার থেকে পটল আনছে বলে উষ্মা প্রকাশ করতে শুরু করল শান্তা, কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বাজারদরের ফিরিস্তি শোনাতে হল অঞ্জনকে। ঝুপ করে প্রসঙ্গ পাল্টে শান্তা ইলেকট্রিক বিলে চলে গেল, সেখান থেকে রেশনে। এই সপ্তাহে রেশনে নাকি ডবল চিনি দিচ্ছে, রোববারের ভরসায় থাকলে সব চিনি হাপিস হয়ে যাবে, সুতরাং কালই সকালে অঞ্জনকে...

অঞ্জন ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ছিল। কথাটা কি তবে কিছুতেই বলা যাবে না?

বুবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শোওয়ার ঘরে এসে ছেলের পাশে আধশোওয়া হল অঞ্জন। চোখের সামনে কস্তুরী আসছে আবার। কস্তুরীকে ভালবেসে ফেলেছে সে, বাসতেই পারে, বউ-বাচ্চা আছে বলে কি অঞ্জনের আরেক জনকে ভালবাসার অধিকার নেই? একজনকে ভাল লাগছে, আরেকজনকে

লাগছে না, যাকে ভাল লাগছে তার সঙ্গে ঘর করার চিন্তা করা কি পাপ? অন্যায়? সমাজ চোখ রাঙাবে? সমাজকে কেয়ার করে না অঞ্জন। কস্তুরী মিশে গেছে তার অস্তিত্বে, কস্তুরী বিনা বাঁচা এখন অঞ্জনের পক্ষে অসম্ভব।

শান্তা ঘরে এল। অঞ্জনের জন্য গ্লাসে জল ঢাকা দিয়ে রেখে আয়নায় চুল বাঁধতে বসেছে। আড়চোখে অঞ্জন দেখছিল শান্তাকে। কস্তুরীর পাশে শান্তাকে মোটেই ভাবা যায় না। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে শান্তার! খসখসে অনুজ্জ্বল চামড়া, টিকটিকির লেজের মতো চুল, গালে মেচেতার দাগ, বুক-পিঠ প্রায় এক। কাঠি কাঠি। তুলনায় কস্তুরী তো রাজহংসী। শুধু বুবাই-এর মা বলে কি ওই শান্তাকে সহ্য করা উচিত?

মন থেকে সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলল অঞ্জন। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল,—শান্তা, শোন এদিকে একটু।

চিরুনি হাতে খাটের পাশে এল শান্তা,—কী?

—ওই যে তখন বলেছিলাম! তোমার সঙ্গে সত্যিই আমার সিরিয়াস কথা আছে।

—আমারও।

অঞ্জন ভুরু কুঁচকোল,—তোমার আবার কী কথা?

—দিদি সন্ধেবেলা কেন এসেছিল জান? জামাইবাবুর কোম্পানির হাল বেশ খারাপ। যাকে তাকে নাকি ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের অর্ডার ধরিয়ে দিচ্ছে!

—সে কী? প্রশ্নটা করতে না চেয়েও করে ফেলল অঞ্জন,—আমায় তো তখন দিদি কিছু বলল না?

—বলবে তো বটেই। আজ বলেনি, সবে তখন তুমি খেটেখুটে এসেছ...। মাত্র দু-তিন লাখ করে নাকি দেবে। কী করে ওদের চলবে বলো তো?

—টাকা তো পাবে। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করতে পারে।

—হুঁ।...তুমি কী কথা বলবে বলছিলে?

—বলছি। বিছানায় এসো।

কথাটায় কি অন্য কোনও আহ্বান আছে বলে ধরে নিল শান্তা? লক্ষ্মী

মেয়ের মতো চুপচাপ চলে এসেছে। বুবাইকে একপাশে ঠেলে দিয়ে মাঝখানে শুয়ে পড়ল। শুয়েই উঠে পড়েছে। সায়ার দড়ি আলগা করল, ব্লাউজের বোতামও। এই গরমে শিথিল হয়েই শোয় শান্তা।

অঞ্জন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল,—তোমাকে কথাটা কী ভাবে বলি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি...আমি...

—কী তুমি? শান্তা একটু ঘুরল।

—ধরো...ধরো...আমি যদি অন্য কাউকে ভালবাসি? ম্‌ম্‌মানে... ম্‌ম্‌মানে...। কথাটা চোখ বুজে বলে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কে জানে কেন তোতলা হয়ে গেল অঞ্জন। কেন হল?

শান্তা মুহূর্তের জন্য স্থির। মুহূর্তে হেসে উঠেছে,—ইশ, সে মুরোদ তোমার থাকলে তো? বলতে বলতে আরও ঝুঁকেছে। অঞ্জনের খোলা পিঠে হাত রেখে বলল,—এই, তোমার এখানে কী হয়েছে গো?

অঞ্জন আরও বোকা হয়ে গেল,—কী হয়েছে?

—ইশ, একেবারে চাপড়া চাপড়া হয়ে গেছে! শান্তা হাত বোলাচ্ছে পিঠের মাঝখানটায়,—গরমের থেকে হয়েছে। জ্বালা করে না তোমার? আগে বলোনি কেন, একটু বরফ ঘষে দিতাম! এখন একটু মলম লাগিয়ে দেব?

আঙুল নড়ছে পিঠে? নাকি যাদুকাঠি? কুহকিনীর মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দেহ। হৃৎপিণ্ড অসাড়। মায়াবী ছোঁয়ায় এইভাবেই কি স্বরযন্ত্র রুদ্ধ হয়ে যায়?

অঞ্জন টের পাচ্ছিল, ভালবাসি বলার থেকেও ভালবাসি না বলাটা অনেক অনেক বেশি কঠিন।

কেন যে কঠিন! ♣

আমি মাধবী

আমি পুণ্যশ্লোক রাজা যযাতির মেয়ে মাধবী। মাতৃপরিচয়? কী হবে জেনে? মাতো শুধুই গর্ভধারণের আধার, তাঁর পরিচয় কোন কাজে লাগে? আমি জন্মেছি অমিতবীর্য রাজা যযাতির ঔরসে, এই আমার একমাত্র পরিচয়। 'কুমারী' মেয়ের এ ছাড়া আর কোনও পরিচয় থাকতে নেই যে।

পরিচয় কেন, আমার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বও আছে কি?

মনে পড়ে এক বসন্তের সকালে, আমি তখন সদ্য যুবতী, রাজপুরীর বাগানে প্রিয় সখীদের সঙ্গে ফুল কুড়োচ্ছি, রাজসভায় ডাক পড়ল আমার। গিয়ে দেখি ভারী গম্ভীর মুখে সিংহাসনে বসে আছেন বাবা, কিছুটা বুঝি বা চিন্তিতও। সামনে ঋষির বেশে এক দিব্যকান্তি যুবক, পাশে তার এক মহাবলশালী পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষটিকে আমি চিনি। ইনি আমার পিতৃসখা গরুড়। নত হয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। ঋষিকেও।

আমার আগমনে সভায় ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। রাজার ভুরুর কুঞ্চন যেন শিথিল সামান্য। মন্দ্র স্বরে বললেন,—শোনো মাধবী, সখা গরুড় ঋষি গালবকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। ঋষি গালব আমার কাছ থেকে এমন কিছু চান যা এঁরা দেশে দেশে ঘুরেও পাননি।

আমি বিস্মিত হলাম। এজন্য আমাকে ডেকে আনার কী দরকার?

বাবা আর আমার দিকে তাকালেনও না। অকম্পিত স্বরে ঋষিকে বললেন,—মুনিবর, এই মুহূর্তে আপনার প্রার্থনা পূরণ করার সঙ্গতি আমার নেই। কিন্তু বিষ্ণুসখা কিংবা আপনার মতো ব্রহ্মর্ষিকে নিরাশ করা আমার অন্যায় হবে। আপনি এক কাজ করুন, আপনার প্রার্থিত আটশো অশ্বের বদলে আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান। আমার কন্যাটি অতি সুশীলা, রূপবতী। আশা করি একে পেলে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

ঘোড়ার বদলে আমি? বাবার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। প্রশ্ন করাও যাবে না কিছু, সে অধিকারও আমার নেই। বিহ্বল চোখ জন্মদাতার মুখ থেকে ঋষি গালবের দিকে পড়ল। আজ থেকে আমি এঁরই অধীনা? ভাবতে অবশ্য মন্দ লাগছে না। ক্ষত্রিয় বীর নয় নাই হল, এমন বিদ্বান সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমার মতো মেয়েরা তো মনে মনে এমন একজনকেই স্বপ্ন দেখে থাকে।

অন্দরমহলে খানিক কান্নাকাটি হল। দাসিরা কাঁদল, সখীরা কাঁদল, মা কাঁদলেন, বিমাতা কাঁদলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক বস্ত্রে ঋষি গালবের সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ছাড়লাম আমি।

পিতৃসখা গরুড় অন্য পথে চলে গেলেন। নীরবে হাঁটছেন গালব, পিছনে দুরু দুরু বুকে আমি। মনে মনে প্রস্তুত করছি নিজেকে। বিলাস বৈভব সব ভুলে এবার থেকে তপোবনে কাটাতে হবে বাকি জীবন, নিজেকে ওই মানুষটার যোগ্য করে তুলতে হবে। পারব তো? নিশ্চয়ই পারব। আমি গালবের প্রেমে পড়েছি, মেয়েরা কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে পেলে তার জন্য সব করতে পারে।

হাঁটছি তো হাঁটছি। রাজধানী পার হয়ে লোকালয় এল। তারপর ছোট্ট অগভীর বন। বনের শেষে কুলকুল নদী। পথশ্রমে ক্লান্ত ঋষি নদীর কিনারে এক শিংশপা গাছের নীচে বসেছেন। একটু দূরত্ব রেখে সসঙ্কোচে আমিও।

পথের নীরবতা বৃক্ষছায়ায় অসহ্য লাগছিল। অথচ নিজে থেকে কথা বলার সাহসও হচ্ছে না। এক সময়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম,—ঋষিবর, আমি কি আপনার সেবা করব?

গালব হাসলেন সামান্য। মাথা নেড়ে বললেন,—না। দরকার নেই।

একটু পরেই উঠব আমরা।

কী মধুর কণ্ঠস্বর! আমি বিগলিত গলায় বললাম,—আমার কি নদীর ওপারে যাব?

—হ্যাঁ।

—আপনার আশ্রম কি এখান থেকে বহু দূর?

—হুঁ।

কথা বলছেন গালব, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে নেই, বহতা নদীতে স্থির।

ঈষৎ লাস্য আনলাম গলায়,—আপনি এত গম্ভীর কেন ঋষি? আমাকে কি আপনার পছন্দ নয়?

গালব যেন একটু বিরক্ত হলেন। ক্ষণেক আমাকে দেখেই আবার তাঁর চোখ নদীতে। রুক্ষ স্বরে বললেন,—শোনো যযাতির মেয়ে, এটা রঙ্গ রসিকতার সময় নয়। তুমি কি জানো, কী কারণে তোমায় নিয়ে এসেছি?

আরেকটু চপল হলাম, জানি। আটশো ঘোড়ার বদলে আপনি আমায় গ্রহণ করেছেন।

—ভুল। আটশো ঘোড়ার বদলে নয়, আটশো ঘোড়ার জন্য তোমাকে আনা হয়েছে।

—মানে?

—ও, তার মানে রাজা যযাতি তোমায় সব খুলে বলেননি!

পলকের জন্য গালব অন্যমনস্ক। উঠে পড়লেন, পায়ে পায়ে গেলেন নদীর ধারে, আঁজলা ভরে মুখে চোখে জল ছেটালেন। ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে শুনে নাও যযাতির মেয়ে। আমি তোমাকে গ্রহণ করার জন্য আনিনি। অন্তত এই মুহূর্তে। আমার জন্য তোমায় একটা কাজ করতে হবে। কঠিন কাজ।

আমার বুক থর থর। অস্ফুটে বললাম,—আজ্ঞা করুন।

—আমার গুরু বিশ্বামিত্র আমার কাছে আটশোটি দুর্লভ ঘোড়া গুরুদক্ষিণা চেয়েছেন। এমন ঘোড়া যাদের গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, কিন্তু একটি কান শ্যামবর্ণ। অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে এমন ঘোড়া আছে

শুনেছি। তবে খবর পেয়েছি তিনি তা এমনি এমনি দেবেন না। বিনিময়ে হর্যশ্ব এমন এক নারী চান যে তাঁকে রাজচক্রবর্তী পুত্র উপহার দিতে পারে।...আমি এখন তাঁর কাছেই যাব। যদি তিনি তোমাকে পছন্দ করেন, তবে তাঁর হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমার ঘোড়া সংগ্রহ করব।

আমি স্তম্ভিত। বাকরুদ্ধ। এ কী বলছেন গালব? মেয়ে হতে পারি কিন্তু মানুষ তো বটে। ইনি আমাকে ভাড়া খাটাতে চান? ছি ছি।

সম্বিত ফিরতেই সোজাসুজি তাকালাম, আমার বাবা এসব জানেন?

—অবশ্যই। তিনিই তো আমাকে পরামর্শটা দিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে চোখে জল এসে গেল। আমার জন্মদাতাই জেনেশুনে...!

কোনওক্রমে বললাম,—তার মানে এখন আমায় অযোধ্যায় জীবন কাটাতে হবে?

—হুঁ। অন্তত যতদিন না তুমি পুত্র প্রসব করো ততদিন।

—তারপর?

গালবের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটল। কোমল স্বরে বললেন,—তারপর আমি তোমাকে ফেরত নিয়ে আসতে পারি।

—সত্যি আনবেন?

—আনতেই হবে। তোমার দায়িত্ব যখন আমার...

আশ্চর্য নারীর মন! কথাটা শুনেই কোথ্থেকে যেন আশার দীপ্তি জ্বলে উঠল বুকে। কে এক কুহকিনী কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিপদে সাহায্য করা নারীর ধর্ম। ঘেন্নাপিত্তি ভুলে, চোখ-কান বুজে ক'টা দিন কাটিয়ে দে, তারপর তো গালব তোরই।

ধন্য আশা কুহকিনী। ধন্য পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ!

আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা। নদী পাহাড় অরণ্য জনপথ পার হয়ে পৌঁছলাম অযোধ্যায়।

রাজা হর্যশ্বের সভায় আমাকে নিয়ে গেলেন গালব। প্রস্তাবটি রাখলেন রাজার কাছে।

হর্যশ্ব আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। যেমন ভাবে কোনও

বিক্রয়যোগ্য পশুকে দেখে কোনও বণিক, অনেকটা তেমনই ভাবে। মুখে হাসি ফুটল,—নাঃ, বলতেই হয় এ মেয়ে ভারী সুলক্ষণা। মনে হচ্ছে আমি যা চাই, এ তা আমায় দিতে পারবে।...কিন্তু আপনার শুল্ক তো আমি পুরোপুরি মেটাতে পারব না মুনিবর। ও রকম ঘোড়া আমার আছে বটে, তবে মাত্র দুশো। এতে কি আপনার চলবে?

এ যে রীতিমত দরাদরি! আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তবু দাঁড়িয়ে আছি। শুধু গালবের মুখ চেয়ে।

গালবের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। আমার কথা ভেবে নয়, অন্য চিন্তায়। একান্তে ডাকলেন আমাকে। অস্থির স্বরে বলে উঠলেন,—এখন আমার কী হবে যযাতির মেয়ে? গুরুদক্ষিণা মেটাতে না পারলে আমি যে পাতকী হব! ইহলোকেও সুখ পাব না, মরার পরেও স্বর্গলাভের কোনও আশা থাকবে না! নাঃ তোমাকে দিয়ে আমার কোনও কাজই হল না। আমার সারা জীবনের শ্রম তপস্যা সব নিষ্ফল হয়ে গেল।

কথাক'টি তিরের মতো আমার মর্মমূল ভেদ করল। ক্ষণিকের জন্য পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু মায়া জমছিল। ওই মানুষটির জন্য। হাতের কাছে রমনীরত্ন থাকা সত্ত্বেও কী অসহায়! ইহলোক আর পরলোকের ভাবনায় কী কাতর!

মনোকষ্ট চেপে রেখে বলেই ফেললাম,—এর তো সহজ সমাধান আছে ঋষি। আপনি দুশো ঘোড়ার বদলেই এঁর কাছে আমাকে রেখে যান। ছেলে হতে তো বছর খানেক সময় লাগবেই, এর মধ্যে আপনি খোঁজখবর করুন আর কোন্ কোন্ রাজার কাছে এমন ঘোড়া পাওয়া যায়। ভাড়া খাটাই যখন আমার মতো মেয়েমানুষের নিয়তি, তখন নয় আর ক'টা রাজার সঙ্গেও শোব। আপনারও প্রাপ্য ঘোড়া মিলে যাবে।

প্রস্তাবটায় শ্লেষ ছিল আমার। ভেবেছিলাম বিদ্রূপের অভিঘাতে আহত হবেন ঋষি, হাঁ-হাঁ করে উঠবেন। শুনেছিলাম সাত-পা একসঙ্গে হাঁটলে সঙ্গী নাকি বন্ধু হয়। সে যদি জঙ্গলের পশু হয়, তবুও। ঋষি গালবের সঙ্গে এই ক'দিনে লক্ষ পা হেঁটেছি আমি, এককণা দুর্বলতাও কি আমার জন্য জমেনি তাঁর মনে? বন্ধুর মনোবেদনা বুঝতে পারবেন না, ঋষি কি এতই প্রজ্ঞাহীন?

নাঃ, গালবের মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। বরং উদ্ভাসিত হয়েছেন।

পরক্ষণেই ম্লান আবার। কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন,—উপায়টা মন্দ বলো নি। তবে এতেও সমস্যা আছে।

—আছে বুঝি?

—নেই? গালবের বিস্ময় যেন বাঁধ মানলনা,—তুমি তো রাজবংশের মেয়ে, জানো না, রাজারা কুমারী মেয়ে পছন্দ করেন? এক রাজার সঙ্গে বছরভর কাটানোর পর অন্য কোনো রাজা তোমায় নেবেন?

ধন্য পুরুষ। ভাড়া খাটার মেয়েছেলেও চাই, টাটকা কুমারীও চাই! একই অঙ্গে!

সামান্য ছলনার আশ্রয় নিলাম এবার। হেসে বললাম,—এই কথা? এ তো কোনও সমস্যাই নয়। অতি শৈশবে এক ব্রহ্মবাদী ঋষিকে আমি সেবায় তুষ্ট করেছিলাম। তিনি আমাকে একটা অদ্ভুত বর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিবার সন্তান প্রসবের পর তুমি আবার কুমারী হয়ে যাবে।

—যাহ্, এমন আবার হয় নাকি?

—হয়। আপনাদের মতো পুরুষরা বর দিলে সবই হয়। সবই তো আপনাদেরই ইচ্ছানির্ভর। চাওয়া নির্ভর।

মনে মনে বললাম, শত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও আপনি কী অজ্ঞ ঋষি! এত জানেন আর এটুকু বোঝেন না, শরীর তো দূরের কথা, হৃদয়ে একজনের জন্য প্রণয় জাগলেই নারী আর কুমারী থাকে না!

ঋষি গালব আনন্দের আতিশয্যে আমার হাত জড়িয়ে ধরেছেন,—তুমি আমায় বাঁচালে যযাতির মেয়ে। কী বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব!

—থাক। শুধু কথা দিন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে গেলে আমাকে আপনি....

—সে আর বলতে। আমি কি বুঝি না এমনভাবে জীবন কাটাতে মেয়েদের কত কষ্ট হয়!

গালব চলে গেলেন। আমার ঠাঁই হল রাজা হর্যশ্বের অন্তঃপুরে।

শুরু হল আমার নদীর জীবন। বয়ে চলেছি, বয়েই চলেছি।

দিন যায়। কী ভাবে যে যায় সে শুধু আমিই জানি। একে একে তিন রাজার শয্যাসঙ্গিনী হলাম আমি। হর্যশ্বের পরে কাশীরাজ দিবোদাস, তারপর ভোজরাজ উশীনর। এঁরা প্রত্যেকেই মহৎ, কিন্তু পৃথক ধরনের মানুষ।

হর্যশ্বের দানধ্যানের সুনাম আছে, দিবোদাস বীর, ঊশীনর সত্যের পূজারী। শুধু একটা বিষয়েই তিনজনের ভীষণ মিল। মাত্র দুশোটি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি নারীকে ভোগ করতে কারও মনে এতটুকু দ্বিধা নেই। কে জানে, হয়তো এর মধ্যেও ধর্মের কোনও গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে।

সে যাই হোক, এঁদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে এঁদের প্রত্যেকের গৃহেই আমি গর্ভবতী হয়েছি, তিনজনকেই উপহার দিয়েছি একটি করে পুত্র। হর্যশ্বের ঘরে বসুমনা, দিবোদাসের প্রাসাদে প্রতর্দন, ঊশীনরের রাজপুরীতে শিবি। প্রতিটি জন্মের সংবাদই যথাসময়ে পৌঁছেছে আমার বাবার কানে। আশ্চর্য, তিনিও দৌহিত্র লাভ করে নাকি মোহিত!

তিন সন্তানকেই দুধ-মা'র কাছে ছেড়ে রেখে এসেছি আমি। প্রথম বার যখন অযোধ্যা থেকে গালব আমায় নিতে এলেন, বসুমনার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। অতটুকু দুধের শিশু ফেলে কোন প্রাণে যাই! হর্যশ্বকে বললাম, ছেলে এখন আমার কাছে থাক। একটু বড় হয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তিনি সম্মত হলেন না। তাঁর ছেলে অন্যের ঘরে প্রতিপালিত হবে? অসম্ভব। পশুপাখির জগতে শিশু মায়ের, মানুষের জগতে নয়।

আমার বুকের দুধ যন্ত্রণার পুঁজ হয়ে জমে গেল। শুকিয়ে মরে গেল। তিন-তিন বার।

ঊশীনরের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গালবকে বললাম,—এখনও তো আপনার দুশো ঘোড়া সংগ্রহ বাকি। এবার কোথায়?

গালবকে সেদিন একটু যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। হতাশ স্বরে বললেন,—আমার চেষ্টা বোধহয় সফল হবে না। সমস্ত শ্রম আমার ব্যর্থ হয়ে গেল।

গালবের শ্রম! হাসি পেল। তবু প্রশ্ন করলাম,—কেন? কী হল?

—মহা সমস্যায় পড়ে গেছি। কালই গরুড় আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি এক নতুন সংবাদ দিয়ে গেলেন।...এই যে সব দুর্লভ অশ্ব, এ সবই নাকি আগে মহর্ষি ঋচিকের ছিল। তিনি এদের পেয়েছিলেন বরুণালয়ে। তাঁর কন্যা সত্যবতীর বিয়ের সময়ে মহর্ষি ঋচিক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এরকম এক হাজারটি ঘোড়া যৌতুক দিয়েছিলেন। মহারাজ গাধি ঘোড়াগুলোকে নিজের কাছে রাখেননি, সবই তিনি ব্রাহ্মণদের দান করে দেন। সেই ব্রাহ্মণরা যখন ঘোড়া নিয়ে ফিরছিলেন তখন হর্যশ্ব দিবোদাস আর ঊশীনর তাঁদের

কাছ থেকে দুশোটি করে ঘোড়া কিনে নিয়েছিলেন। বাকি চারশো পথে চুরি হয়ে যায়। অর্থাৎ এরকম ঘোড়া আর আমার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গরুড় অবশ্য বলছিলেন তুমি এই ছ'শো ঘোড়াই গুরুদেব বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দিয়ে দাও। তোমার অসুবিধের কথা খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।

পলকের জন্য অন্তরে যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। উজ্জ্বল মুখে বললাম,

—বিষ্ণুসখা গরুড় যা বলছেন তাই করুন তবে।

—তা কি হয় যযাতির মেয়ে? গুরুদক্ষিণা পুরো না দিলে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কী করে? বলতে বলতে গালব অপাঙ্গে আমার দিকে তাকালেন, —একটা বুদ্ধি অবশ্য মাথায় এসেছে, জানি না তাতে লাভ হবে কিনা।

—কী? আমার গলা কেঁপে গেল।

—যদি অবশিষ্ট ঘোড়ার বদলে গুরুদেব তোমায় রাখেন...না না, এ বোধহয় হয় না। গুরুদেব হয়তো এতে আহত হতে পারেন। তিনি তো ঘোড়াই চেয়েছেন, স্ত্রীলোকে কি তিনি সন্তুষ্ট হবেন?

তিন তিনজন রাজর্ষির শয্যা আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। মনে মনে বললাম, খুব হবেন। ঋষি হলেও তিনি পুরুষ তো বটে।

গালব আমার হাত ধরলেন,—আরেকবার আমার জন্য কষ্ট করবে যযাতির মেয়ে? এই শেষবার?

চোখে জল এসে গেল। সামলে নিয়ে বললাম,—চলুন।

—তবে তাই চলো। যদি তিনি করুণাবরবশ হয়ে...

নির্দয় পুরুষ অপরের করুণা চায়! সে করুণার প্রকৃতিই বা কীরকম? না ঘোড়ার বদলে সুন্দরী ভোগ করে অপর জনটি তৃপ্ত হবেন কি হবেন না!

আমার ধারণাই মিলে গেল। এক ঝলক আমাকে দেখামাত্রই ঋষি বিশ্বামিত্রের কামজ্বর এসে গেল। গদগদ গলায় বললেন,—তুই কী আহাম্মক রে গালব! এমন একটা মেয়েছেলে তোর হাতে আছে, অথচ তাকে আগে আমার কাছে আনিসনি! থাকি তো বনে বাদাড়ে, ঘোড়া আমার কী কম্মে লাগবে? নেহাত গুরুদক্ষিণা দেব, গুরুদক্ষিণা দেব বলে বায়না জুড়েছিলি, তাই তোকে পরীক্ষা করার জন্যে...। এহেহেহে, এই কটা বছর মেয়েটাকে পেলে...যাক গে যাক, এখনই বা মন্দ কী!

ব্যস্। এবার আর রাজপ্রাসাদ নয়, মুনির তপোবন। এবারও সেই একই

পরিণতি। তিন রাজার মতো আমায় ছিঁড়েখুঁড়ে একশা করলেন ঋষিবর। ফলত আরেকটি ছেলে। অষ্টক। ছেলে জন্মাতেই ঋষির কামজ্বর উধাও। বুঝি বা পরমব্রহ্মের কথা মনে পড়ে গেল। তুচ্ছ মানবীতে কতদিন আর আটকে থাকতে পারেন সাধুসন্ন্যাসীরা!

আবার গালবের কাছে প্রত্যাবর্তন। এতদিনে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে আমার। মনেরও, শরীরেরও। বড় ক্লান্ত বোধ করি, বড় অবসন্ন। নাঃ, গালবকে দেখে হৃদয়ে এখন আর এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে না। প্রণয়ের ক্ষুধা মরে গেছে, প্রথম প্রেম এখন দূরের স্মৃতি। তবু মনে একটা ক্ষীণ স্বস্তি, যাক আর ভেসে বেড়াতে হবে না। রাজকন্যা হই আর যাই হই, মেয়েদের যে কোনও আলাদা সত্তা থাকতে নেই এ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছি। আমাদের আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কী? এখন বাকি জীবনটা গালবের সঙ্গে চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।

গালবের পিছু পিছু হাঁটছি আবার। নদী গিরি প্রান্তর অরণ্য লোকালয় পার হয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি। এক দুপুরে এক স্রোতস্বিনী পার হলাম আমরা। তিলেক বিশ্রামের জন্য বসেছি এক শিংশপা গাছের নীচে। জায়গাটা ভারী চেনা চেনা। এখানেই প্রথম দিন আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম না? হ্যাঁ তো।

গালবও বুঝি চিনেছেন জায়গাটাকে। ঘুরে ঘুরে দেখছেন চার দিক। নদীকেও। চৈত্রমাসের ঘূর্ণি উঠছে ছোট ছোট। কোথ্‌থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল। ডাকছে, ডেকেই চলেছে।

নির্বাক মানুষটা হঠাৎ সবাক হলেন,—কী ভাবো যযাতির মেয়ে?

ঘাড় নাড়লাম,—কিছু না।

গাম্ভীর্য সরে মৃদু হাসি উঁকি দিল,—ক'টা বছর তোমার ওপর দিয়ে খুব ঝড় বয়ে গেল, তাই না?

অর্থহীন কথা। উত্তর দিলাম না।

—তোমার এই আত্মত্যাগ বিফল যাবে না, দেখো। তোমার চার সন্তানেরই নাম ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়বে। বসুমনা হবে দাতা, প্রতর্দন হবে বীর, শিবি ধার্মিক হবে, আর আমার গুরুর সন্তান অষ্টক হবে যজ্ঞকারী। কী, খুশি?

পলকের জন্য চারটে কচি কচি মুখ বুকে ভেসে উঠেছে। কেমন আছে ছেলেগুলো? কী করছে? মাকে কি খোঁজে তারা? মার জন্য কাঁদে? নাকি

ভুলেই গেছে এই অভাগিনী মাকে? বুকফাটা কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল সহসা। গালব আশীর্বাদ করছেন আমার ছেলেদের, আমাকে নয়! মেয়েদের এতটুকু গৌরব দিতেও এত কার্পণ্য? হায় রে পুরুষ!

নীরস স্বরে বললাম,—আমার খুশিতে আপনার কী দরকার? আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট।

কোকিলের ডাক আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। গালব কাছে সরে এলেন, একদম পাশটিতে। কাঁধে হাত রেখেছেন, পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে। এক সময়ে ওই স্পর্শের জন্য উন্মুখ ছিল হৃদয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনও রোমাঞ্চ অনুভব করলাম না। অথচ এই দৃষ্টি আমার চেনা। ওই স্পর্শের ভাষাও।

শুকনো গলায় বললাম,—সংযত হোন ঋষি।

—কেন?

—এখানে নয়। এভাবে নয়।

—কেন, এই জায়গাটা কী দোষ করল? গালব সবলে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন আমাকে। কানেকানে ফিসফিস করে বললেন,—এ তো অতি মনোরম স্থান। নদী গাছ প্রকৃতি...তুমি আর আমি...মনে নেই এখানেই একদিন তুমি আমার সেবা করতে চেয়েছিলে? আজ তোমার জীবনে সেই সৌভাগ্য এসেছে। শুভলগ্ন বয়ে যেতে দিও না।

হঠাৎ কেমন গা গুলিয়ে উঠল। এত বিবমিষা আগে কখনও জাগেনি তিন রাজার সঙ্গে শুয়েও নয়, বিশ্বামিত্রের অঙ্কশায়িনী হয়েও নয়।

রূঢ়ভাবে বললাম,—এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আর তো কারও কাছে আমাকে পাঠানোর নেই! চলুন, আপনার আশ্রমে যাই, সেখানে নয় সারা জীবন ধরে আমাকে যত খুশি...

—সারা জীবন ধরে? আমার আশ্রমে? তোমাকে নিয়ে? গালব ছিটকে সরে গেলেন,—তুমি কি জানো না, তোমাকে আশ্রমে আর নিয়ে যাওয়া যায় না? আশ্রম অতি পবিত্র স্থান, অন্যপূর্বা নারীকে নিয়ে সেখানে বাস করাট অধর্ম। আমি কোনও ভাবেই তোমাকে আমার সহধর্মিনী করতে পারি না।

পলকের জন্য স্তম্ভিত আমি, পলকেই স্থিত আবার।

বাঃ বাঃ, এই তো যোগ্য উত্তর। এরকমটাই তো আশা করা উচিত ছিল।

তবু কেমন জেদ চেপে গেল। বললাম,—আমি অন্যপূর্বা নই। সন্তান

প্রসব করা হয়ে গেছে, এখন আমি আবার কুমারী।

—তুমি কুমারী! গালব অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, ওসব গালগল্প তুমি আমাকেও বিশ্বাস করতে বল?

রাগে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেল। চিৎকার করে উঠলাম,—যদি জানেনই গালগপ্প, একের পর এক পুরুষের কাছে আমায় কুমারী সাজিয়ে পাঠালেন কী বলে? এতে অধর্ম হয়নি?

—তুমি নেহাতই বোকা যযাতির মেয়ে। এও বোঝে না, মহৎ কারণে ছোটখাটো ছলনার আশ্রয় নিলে কোনও পাপ হয় না। গালব আবার আমায় আলিঙ্গন করলেন, বাজে তর্ক কোরোনা। এসো আমরা মিলিত হই। চিন্তা নেই, তোমার বাবার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—কক্ষনও না। আপনি ছোঁবেন না আমাকে। সরে যান।

না, এরপর গালব আর আমাকে ছোঁননি। বোধহয় তাঁর মানে লেগেছিল। বাবার হাতে নামহীন যযাতির মেয়েকে তুলে চিরতরে বিদায় নিলেন ঋষি গালব।

এখানেই আমার কাহিনি শেষ হয়ে যেতে পারত। বাদবাকি জীবন রাজা যযাতির অন্তঃপুরেই, সুখে না হোক, শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারতাম। রাজকন্যাদের তো আর পেটের ভাতের অভাব হয় না।

কিন্তু বিধি বাম। মহাপুণ্যবান রাজা যযাতি দু'বেলা কানের কাছে এসে হুশহাশ নিশ্বাস ফেলেন, ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে রয়েছে বলে তাঁর নাকি রাতে ঘুম হয় না! আরও দুঃখ, মেয়েটা পতিহীন থাকলে মরার পরে স্বর্গে তার নাকি ঠাঁই হবে না! অতএব মেয়েকে পাত্রস্থ করতেই হবে। ওদিকে মনে আবার সঙ্কোচও আছে, চারটে বাচ্চা হওয়া মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে অন্য রাজারা হাসাহাসি না করে!

অনেক ভেবেচিন্তে পাঁচ ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন রাজা। শেষ পর্যন্ত নিজেরা নিজেরা একটা উপায়ও বার করে ফেললেন। আমাকে ডেকে হুকুম জারি করা হল, প্রস্তুত হও। তোমার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আঁতকে উঠে আপত্তি জানাতে গেলাম, কেউ কর্ণপাত করল না। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগতীর্থে নাকি সভা ডাকা হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই

হবে। তা রাজপ্রাসাদ থাকতে ওখানে কেন? না প্রয়াগতীর্থ অতি পুণ্যস্থান, ওখানে স্বয়ম্বরা হলে আমার সব দোষ কেটে যাবে। বাবা যেটা মুখে বললেন না সেটা হল, দোজবর হোক, তেজবর হোক, একটা বোকাসোকা ভালমানুষ রাজা কপালে জুটে গেলে এবারকার জীবনটা তো আমার তরে গেল।

আজ সেই শুভদিন। প্রয়াগতীর্থের এক আশ্রমে আনা হয়েছে আমাকে। এখানেই বসেছে স্বয়ম্বর সভা। বাবা নিজে আসেননি, রাজকাজে ব্যস্ত। হতেও পারে, নাও হতে পারে, সত্যি-মিথ্যে আমি জানিনা। আয়োজনে অবশ্য কোনও ত্রুটি নেই। আমার দুই দাদা যদু আর পুরু নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে আশ্রম সাজিয়েছে, রাজকীয় মঞ্চ বানিয়েছে, ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে দশ দিক। লোকলস্কর সেপাই শান্ত্রী ছুটে বেড়াচ্ছে অবিরাম, আগত রাজাদের আপ্যায়নে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।

অবাক কাণ্ড! চার ছেলের মাকে বিয়ে করতে রাজাও কিছু এসেছেন বটে! এমনকি নাগ যক্ষ গন্ধর্বরাও উপস্থিত। এত লোক আমাকে পেতে আগ্রহী? কেন? রাজার মেয়ে বলে? নাকি পুত্রদায়িনী সুলক্ষণা মেয়েমানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি তাই?

একটু আগে সখীরা আমায় বধূসাজে সাজিয়ে দিল। ঋষিকন্যারা বরমালা গেঁথে ধরিয়ে দিয়েছে হাতে, এবার সভায় গিয়ে পছন্দসই কাউকে পরাতে হবে সে মালা।

কাকে পরাব এই মালা? কোন হর্যশ্ব দিবোদাস উশীনর অথবা বিশ্বামিত্রকে? অথবা কোন গালবকে? এদের একজনকেও না বাছার স্বাধীনতা আজ আমার আছে, কিন্তু তারপর? বাবার কাছে থাকা, সেও তো এক পুরুষের আশ্রয়েই থাকা। বাবা মারা গেলে ভাইদের আশ্রয়, তারাও তো পুরুষ। অপেক্ষা করব ছেলেরা কবে বড় হয়ে মাকে নিয়ে যাবে? হায়, ততদিনে তারাও তো এক একটা আস্ত পুরুষমানুষ হয়ে যাবে!

কোনও পথ নেই? কোনও পথ নেই?

জঙ্গলে চলে যাব? বাঘ ভাল্লুক শিয়াল কুকুরদের জগত কি মানুষের সমাজের চেয়ে হীন কিছু হবে?

ভাবছি আমি। ভাবছি, ভাবছি...

মালা আমার হাতেই শুকিয়ে গেল। ♣

গোপন মায়া

মানিকের মা কাজে এল না আজ। অপেক্ষা করে করে দশটা নাগাদ নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল রঞ্জন। তাড়া অবশ্য নেই, রান্না আরো পরে চাপালেও চলে, কিন্তু ছুটির সকালে একা ফ্ল্যাটে সে এখন করবেই বা কী? টিভি দেখবে বসে বসে? একঘেয়ে, ভীষণ একঘেয়ে। বই পড়বে? ক্লান্তিকর। গান শুনবে? ইচ্ছে করছে না। গড়াগড়ি খাবে বিছানায়? তাও ভালো লাগছে না। আবার উল্টোবে খবরের কাগজ? ধুৎ। তারচেয়ে বরং এই রান্না রান্না খেলাটা কি মন্দের ভালো নয়?

রঞ্জন একটা মেনু এঁচে নিল মনে মনে। মেন আইটেম ডিমের ঝোল আর ভাত। সঙ্গে মুগডাল আলুভর্তা। ডালে সম্বর দেওয়া নিয়ে অবশ্য একটু সমস্যা হয়। পনেরো বছর একা বাস করেও কায়দাটা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। হয় জিরে বেশি পুড়ে যায়, নয় শুকনো লঙ্কা ভাজা হয় না ঠিক ঠিক। আর হলুদ-আদার আন্দাজ তো কখনোই নিখুঁত থাকে না। যাক গে যাক, সে নিজেই তো খাবে, আজ আর একবার চেষ্টা চালানোই যায়।

ভাবতে ভাবতে হাত চলছে। রাতের থালাবাটিগুলো মেজে ফেলল রঞ্জন। সকালের চা-জলখাবারের কাপপ্লেটও। রান্নাঘরের ওয়াল-ক্যাবিনেট খুলে জরিপ করল মশলাপাতির হাল। আছে। গুঁড়ো-হলুদ, গুঁড়ো-লঙ্কা, গরমমশলা, সবই মজুত। শুধু পেঁয়াজ আদা রসুন মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই হাঙ্গামা শেষ।

কড়াইতে ডিম-আলু সেদ্ধ বসিয়ে রঞ্জন পেঁয়াজ নিয়ে পড়ল। খোসা ছাড়াল মন দিয়ে। কুঁচোচ্ছে। ওফ্ কী ঝাঁঝ! বেদনার পরাকাষ্ঠা! হাতের পিঠে বারবার চোখ মুছছে রঞ্জন। নাক টানছে।

কলিংবেল বেজে উঠল। রঞ্জনের ভুরুতে কুঞ্চন। মানিকের মা নিশ্চয়ই আর এত বেলায় আসবে না! তবে কে? দীপংকর? ব্যাটা সল্টলেকে ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে হানা দেয় মাঝেমধ্যে। গৌরবও হতে পারে। কিংবা আজিজুল। ব্যাচেলার বনে যাওয়া বন্ধুর এই ফাঁকা ফ্ল্যাটের মতো তোফা আড্ডার ঠেক কটাই বা আছে! প্রাণের সুখে গুলতানি মারো, কাপের পর কাপ চা বানাও আর ওড়াও, কিংবা বোতল খুলে বসে পড়ো, এখানে তো তেমন কেউ নেই যে তোমায় ঠেলা মেরে ভাগাবে।

চিন্তাটায় যেন একটা চোরা বিষাদও আছে। ছোট শ্বাস ফেলে দরজা খুলতে গেল রঞ্জন।

পাল্লা টেনেই রঞ্জন হতচকিত। চৌকাঠের ওপারে এক ঝকঝকে তরুণী। পরণে কালোর ওপর জংলা ছাপ। লং-স্কার্ট, টুকটুকে লাল টপ, কাঁধে বাহারি ব্যাগ। মুখটা যেন খুব চেনাচেনা! কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

প্রশ্ন করার আগে মেয়েটিই সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনিই নিশ্চয়ই রঞ্জন মজুমদার?

হতভম্ব রঞ্জন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ....

--আমি মিমি। আই মিন মধুরিমা। আমার মায়ের নাম স্বাগতা। আশা করি এর বেশি পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই?

রঞ্জন পলকে বিদুৎস্পৃষ্ট। কী শুনল সে? ভুল নয় তো? মিমি...মিমি এসেছে তার কাছে? যে-মেয়েকে একটিবার দেখার জন্য একসময়ে সে মাথা

খুঁড়েছে, হতাশ হয়ে হালও ছেড়ে দিয়েছে কবে যেন, সে আজ স্বয়ং রঞ্জনের দরজায় হাজির! এও কি সম্ভব? নাকি দিবাস্বপ্ন দেখছে রঞ্জন?

অস্ফুটে রঞ্জন বলল, ও...। এসো, ভেতরে এসো।

—সরি। এখানেই ঠিক আছে। আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছিলাম।

অবিকল স্বাগতার গলা। বাচনভঙ্গিও হুবহু স্বাগতার। সেই গনগনে তেজ। সেই একই রকম কাঠিন্য।

রঞ্জনের বুকটা চিনচিন করে উঠল। তবু জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। খানিকটা নাটুকে ভঙ্গিতেই বলে ফেলল, আমার দরজা থেকেই ফিরে যাবে তুমি? একবারটি ভেতরে পা রাখবে না?

প্রার্থনায় কি খুব বেশি আকুতি ছিল? মিমি যেন ক্ষণিক দোটানায়। স্থির চোখে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করল একটু। কবজি উল্টে ঘড়ি দেখল, বুঝি গড়ে নিল ভাবনার সূক্ষ্ম অবকাশ। তারপর গুমগুমে গলায় বলল, অলরাইট। চলুন। তবে আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না।

—এসো তো।

দু-কামরার ফ্ল্যাটের ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসটুকু বড্ড অগোছালো হয়ে আছে আজ। বেতের সোফায় যেমন-তেমন ছড়ানো ইংরিজি-বাংলা খবরের কাগজ। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেঁড়া খাম, খালি সিগারেটের প্যাকেট। দু-দুখানা অ্যাশট্রে, দুটোই টইটুম্বুর। টিভির ওপর জলের বোতল। শোকেসের মাথায় ম্যাগাজিনের স্তূপ। ফাঁকা হুইস্কির বোতল শোভা পাচ্ছে টেলিফোনের পাশে। দেখে শিশুও বুঝবে এ এক ছন্নছাড়ার সংসার।

খবরের কাগজগুলো ঝটপট সরাতে গিয়ে রঞ্জনের খেয়াল হল আনাজ কাটার ছুরিটাও হাতে ধরা আছে এখনো। মেয়েটাও যেন তেরচা চোখে দেখছে অস্ত্রখানা। অপ্রস্তুত স্বরে রঞ্জন বলল, পেঁয়াজ কাটছিলাম। রেখে আসতে ভুলে গেছি।

মিমি হাসল না। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

খপ করে বোতলটা তুলে নিয়ে রঞ্জন ত্বরিত পায়ে রান্নাঘরে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। বুকে খানিকটা বাতাস ভরে স্থিত করল নিজেকে। বোতল নামাল

সিংকে, ছুরি যথাস্থানে। পায়ে পায়ে ফিরল ঘরে। সোফা ঝাড়ছে। মৃদুস্বরে বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।....জল খাবে?

—নো থ্যাংকস।

মিমি বসেছে আড়ষ্টভাবে। দেওয়ালে রঞ্জনের কাঁধে আড়াই বছরের মিমি, সেদিকে ঝলক তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কপালে চওড়া চওড়া ভাঁজ ফেলে বলল, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন?

রঞ্জন যেন ঠিক শুনতে পেল না। মিমিকে দেখছে নিষ্পলক। কত বড় হয়ে গেছে তার মেয়েটা! সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফোলা-ফোলা গাল, গাবলুগুবলু মিমির সঙ্গে এই মিমির মিল পাওয়া ভার। সামান্য লম্বাটে মুখ, সরু কপাল, পাতলা-পাতলা নাক, ঈষৎ-চাপা ঠোঁট, আয়ত চোখ আর কাঁধছোঁয়া চুলে শ্যামলারঙা মিমি এখন অন্যরকম। কার মতন হয়েছে মিমি? স্বাগতা? উঁহু, স্বাগতার মুখ তো গোল। রঙও অনেক ফর্সা স্বাগতার। বরং মিমির এই মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মায়ের আদলই মেলে বেশি। মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেও মেয়ের চেহারাটাকে মনোমত বদলাতে পারেনি স্বাগতা, যাদের সে অসম্ভব অপছন্দ করত তাদেরই একজন রয়ে গেল মিমির অবয়বে।

মিমির কপালের ভাঁজ ক্রমশ ঘনতর। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আমি কিন্তু কোনো সারপ্রাইজ দেওয়ার উদ্দেশে এখানে আসিনি। ইনফ্যাক্ট, আমার মা-ও জানে না....জানলে অবশ্যই আমার আসাটা অ্যালাও করত না।

রঞ্জনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তাহলে এলে কেন?

—ওই যে বললাম.... একটা ইম্পরট্যান্ট কাজে। আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল।

—কী বল ত?

—আপনি একসময়ে একটা ইনশিওরেন্স করিয়েছিলেন। আমার নামে। আঠারো বছরের পলিসি। মিমি এতক্ষণে সরাসরি তাকিয়েছে,—মনে পড়ে কি?

মিমি কোনদিকে কথা ঠেলতে চাইছে বুঝতে পারছিল না রঞ্জন। সত্যি বলতে কী, এখনো তার বোধবুদ্ধি সেভাবে ক্রিয়া করছে না। মিমির

আকস্মিক উপস্থিতিতে এখনো যেন ধাতস্থ হয়নি মগজে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে বলল, হ্যাঁ, একটা করেছিলাম বটে। আমার মেয়ে যাতে বড় হয়ে লাম্পসাম একটা অ্যামাউন্ট পায়...। তার হায়ার এডুকেশনের জন্য....কিংবা...।

—পলিসিটা ম্যাচিওর করেছে।

—বাহ্, ভাল তো।

—না, ভাল নয়। এ টাকা আমার চাই না।

বাক্যটা এমন তীক্ষ্ণভাবে ছুড়ল মিমি, ক্ষণিকের জন্য রঞ্জন যেন শরাহত। অতি কষ্টে হজম করল আঘাতটা। জিজ্ঞেস করল, কেন নেবে না, জানতে পারি কি?

—কেন নেব তার কোনো আনসার আপনার কাছে আছে কি?

নাহ্, এ মেয়ে রঞ্জনকে ক্ষতবিক্ষত করতেই এসেছে আজ। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলল রঞ্জন। ধরিয়েও ফেলল একটা ফস করে। টের পেল জ্বলন্ত সিগারেট আঙুলের ফাঁকে কাঁপছে টিপটিপ। একটা ক্রোধও যেন কোত্থেকে ধেয়ে আসে মস্তিষ্কে। স্বাগতা শুধু মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যত্ন করে তাকে শিখিয়েছে কীভাবে রঞ্জনকে অবজ্ঞা করতে হয়। অবজ্ঞা? না ঘৃণা?

চোখের কোণ দিয়ে রঞ্জনকে দেখছে মিমি। বোধহয় তূণ হাতড়াচ্ছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে আবার কোনো তির হানার। মাথায় একরাশ ধোঁয়া পাঠিয়ে রঞ্জন খানিকটা লাগামে আনল নিজেকে। গোছালো। তবু ঝাঁঝ একটু এসেই গেল গলায়, আমার কাছে অনেক উত্তরই আছে মিমি। তুমি কি সেগুলো শুনতে চাও?

মিমি ঘাড় ফেরাল দেওয়ালের দিকে। কঠিন চোয়ালে উপেক্ষা।

রঞ্জন মরিয়াভাবে বলল, কোয়েশ্চেন করলে রিপ্লাইয়ের জন্যও তৈরি থাকতে হয় মিমি। নইলে কিন্তু যাকে প্রশ্ন করছ তার প্রতি অবিচার করা হয়।

মিমি তবু নীরব। ঠোঁট কামড়াচ্ছে। বিরক্তি চাপছে কি?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নেবাল রঞ্জন। চেপে চেপে। নাহ্, সে বোধহয় একটু বেশিই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে। পনেরো বছর পর মেয়েকে

ছেলেমানুষি নয়? আর সে বলবেই বা কী? স্বাগতার সঙ্গে কেন তার সম্পর্ক বিষিয়ে গিয়েছিল? কেন তারা পরস্পরকে দুটো বুনো জন্তুর মতো আঁচড়েছে কামড়েছে? সে তো তার আর স্বাগতার ব্যাপার, মেয়েকে এসব শোনাবে কেন? স্বাগতা যদি মেয়ের কানে বিষ ঢেলেও থাকে, তিন লাইন কৈফিয়ত গেয়ে সেই বিষ কি নামাতে পারবে রঞ্জন? ডিভোর্সের পর সে যে কতবার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, এমনকী স্বাগতা ফের বিয়ে করার পরও বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, এসব কথাই বা আজ মিমিকে বলে কি এমন মোক্ষলাভ হবে? মেয়ে যে তার প্রতি কতটা বিরূপ, যে তো তার অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট, ফালতু ফালতু সাফাই গেয়ে কেন মুখ নষ্ট করবে রঞ্জন? বরং মেয়ে যে এত বছর পর তার কাছে এল, এই সুখটুকুকেই তো সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে এখন। বাদানুবাদে না গিয়ে।

রঞ্জন সোজা হয়ে বসল। গলা ঝেড়ে বলল, ওকে। ইটস অলরাইট।... কিন্তু তুমি যে টাকাটা নেবে না, তোমার মা জানে তো?

—জেনে যাবে।

—ও।... এখনো মাকে বলোনি তাহলে?

—দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। ইটস বিটুইন আমি আর মা। আমি না চাইলে মা কক্ষনো এই টাকা নিতে আমায় ফোর্স করবে না।

রঞ্জন মনে মনে বলল, বটেই তো। রঞ্জনের মুখে আর-এক পোঁচ কালি বোলানোর সুযোগ স্বাগতা থোড়াই ছাড়বে। হয়তো মেয়ের পিঠ চাপড়ে বলবে, বহুত আচ্ছা। অসভ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন বদমাইশটার মুখের ওপর পলিসিটা ছুড়ে মেরে আয়।

তা এসব ভাবনা অবশ্য রঞ্জনকে সেভাবে বিচলিত করে না আজকাল। ধুস, কষ্ট পাওয়ার সেই কুৎসিত ধাপগুলো তো সে কবেই পেরিয়ে এসেছে। এখন তো সে প্রায় গন্ডারেরই সগোত্র। তাও আবার শিংভাঙা।

ম্লান হেসে রঞ্জন বলল, ঠিক আছে। এতই যখন আপত্তি, নিও না টাকা। আমার তো তোমার ওপর কোনো জোর নেই।

—নেই-ই তো। মিমির স্বর রুক্ষতর, আমারও আপনার ওপর কোনো

জোর নেই। আর নেই বলেই ও টাকা টাচ করা আমার উচিত হবে না।

—ব্যস ব্যস ব্যস, ম্যাটার ইজ সেটলড। দুহাত তুলে মিমিকে থামাল রঞ্জন। অনুনয়ের সুরে বলল, এবার একটু রিল্যাক্স করো। বলো কী নেবে? চা? না কফি? আমি কিন্তু দুটোই ভাল বানাই।

—সরি। আমি এখানে আপ্যায়িত হতে আসিনি।

—আহা, উত্তেজিত হচ্ছো কেন? বি লজিক্যাল। রঞ্জন মাথাটাকে একদম বরফ করে ফেলল। মিমির বুনো ঘোড়ার মতো হাবভাব দেখে এবার যেন একটু মজাই লাগছে তার। হাসি হাসি মুখে বলল, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো না, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?

—করি না-ই তো।

—অর্থাৎ আমরা পরস্পরের অনাত্মীয়। রাইট?

—অবশ্যই।

—আমরা কি পরস্পরের শত্রু? তাও তো নয়। ঠিক?

মিমি থতমত। চোখ পিটপিট করছে।

—তাহলে কী দাঁড়াল। অনাত্মীয় এবং শত্রু নয় এমন একজন আমার বাড়ি এসেছে। সে তাহলে আমার গেস্ট। অতিথিকে আপ্যায়ন করা কি গৃহস্বামীর কর্তব্য নয়? অন্তত প্রথম দিন?

মিমি চোখ কুঁচকে তাকিয়ে। বুঝি-বা পড়তে চাইছে রঞ্জনকে। দেখতে দেখতেই নাক কুঁচকে গেল হঠাৎ। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। বিড়বিড় করে বলল, কিসের একটা পোড়া-গন্ধ আসছে না?

—হ্যাঁ, তাই তো। রঞ্জনও চমকেছে।—গ্যাসে ডিম-আলু বসিয়েছিলাম। গেল বোধহয়।

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। যা ভেবেছে তাই, জল ফুটে মরে গেছে কখন, শুকনো কড়া পুড়ছে চড়চড়। তাদের বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মতো। আপনমনে হাসল রঞ্জন। ঝটিতি নেবাল গ্যাস। সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কড়া নামাল সিংকে। দীর্ঘশ্বাস চেপে ফিরছিল ড্রয়িংস্পেসে, থমকাল হঠাৎ।

মিমি সোফায় নেই!

মিমি দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে!

মিমি গভীর মনোযোগে দেখছে টাঙানো ছবিটা!

কিছু কি মনে পড়ছে মিমির? শৈশবের কোনো স্মৃতি? একটু কি মেদুর হল মিমির মন?

রঞ্জন গলা খাঁকারি দিল, ছবিটা এখানেই তোলা। তোমার বড়মামার ক্যামেরায়। এই ফ্ল্যাটটা তখন সদ্য কেনা হয়েছে।

বিদ্যুৎলতার মতো সোফায় ফিরে গেল মিমি। যেন রঞ্জনের কথাগুলো কানেই যায়নি এমন একটা ভান করে বলল, আপনার ডিম-আলুর কী খবর? অবশিষ্ট আছে কিছু?

—নাহ্। জ্বলে-পুড়ে খাক।

—মা আপনার সম্পর্কে ঠিকই বলে।

—কী বলে?

—সে আপনি শুনে কী করবেন?

—কী বলে আমি জানি। আমি সংসার করার অযোগ্য। তাই তো?

—ভুল বলে কি? মিমি টেরিয়ে তাকাল, রোজ কি এরকমই রান্নাবান্না হয়?

মেয়ের সামনে নিজেকে একজন দুঃখী-অসহায় মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে বাধছিল রঞ্জনের। তাছাড়া সে তো এখন সত্যিই তেমন একটা খারাপ নেই, বরং এক ধরনের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মিছিমিছি বাচ্চা মেয়েটার সহানুভূতি কাড়ার অপচেষ্টা সে করবেই বা কেন!

রঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠল, রোজ এরকম হাল হলে কবেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যেতাম। আমার রাঁধার সময় কোথায়! লোক একজন আছে, সে যা বানিয়ে দেয় তাই সোনামুখ করে খেয়ে নিই। সে ডুব মারলে তবেই এই আপনা-হাত জগন্নাথ।

—আজ তো রান্নার বারোটা। আজ কী হবে?

—ইচ্ছে হলে আবার বসাব। কিংবা মুড়ি চিবাবো। অথবা টোস্ট-ওমলেট। বাইরে থেকেও খেয়ে আসতে পারি। ফোন করে খাবার আনিয়েও নেওয়া যায়। আর কোনোকিছুরই মুড না থাকলে এবেলা স্রেফ হরিমটর।

—বুঝলাম। মিমি একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর ঔদাসীন্যের

প্রলেপমাখা গলায় বলল, তা এরকম একা একা থাকার দরকারটা কী?

—এই বয়সে দোকা জোটাব কোত্থেকে? জানো, নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে আমি হাফ সেঞ্চুরি করব?

—অনেক আগেই তো বন্দোবস্তটা করতে পারতেন।

—তা হয়তো পারতাম। রঞ্জনের মুখে একটা ছদ্ম-করুণ ভাব এবার, কিন্তু একজনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম যে।

মিমির চোখ সরু, কে সে?

রঞ্জন মনে মনে বলল, তুই-তুই-তুই।

মুখে রহস্যের হাসি টেনে বলল, এতটা পারসোনাল কথা তোমায় বলে ফেলব, এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

—সরি। মিমি পলকে গোমড়া। চোয়াল শক্ত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার জানার প্রয়োজনও নেই।

কী কাণ্ড, চটে গেল কেন? মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি দেখে রঞ্জনের চোখ চিকচিক। নরম গলায় বলল, কুল। কুল। ফ্রিজে একটা কোল্ডড্রিংকস আছে, দেবো?

মিমির জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের ঢাউস বোতলখানা বের করে আনল রঞ্জন। দুখানা গ্লাসও। তরল ঢেলে একটা গ্লাস মিমিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, চুমুক দাও।

গ্লাসটা ধরল মিমি, তবে খাচ্ছে না, ভাবছে কী যেন।

রঞ্জন মেয়ের মুখোমুখি বসল, এবার আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—কী?

—তুমি তো বললে মাকে জানিয়ে আসোনি, তাহলে এ বাড়ির ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?

—পেয়েছি। যেখান থেকে হোক।

—তবু শুনি।

মিমি ঠোঁট বেঁকাল, আপনাকে এতোসব কথা বলব এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

রঞ্জন হেসে ফেলল। চোখ নাচিয়ে বলল, আমি অবশ্য সোর্সটা আন্দাজ করতে পেরেছি। বিমার পলিসিতে এ বাড়িরই অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল।

মিমি গোঁজ। ছোট্ট করে চুমুক দিল কোল্ডড্রিংকসে। বুঝি-বা অস্বস্তি গোপন করতে।

—এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। রঞ্জনের হাসি চওড়া হল, পলিসিটা ছিল তোমার মা-র জিম্মায়। সামহাউ তুমি সেটি দেখে ম্যাচিওরিটির ডেটটা জানতে পেরেছ। কিন্তু ইনশিওরেন্স কোম্পানি তো টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত চিঠি এ বাড়ির ঠিকানাতেই পাঠাবে, সেই চিঠি পেয়ে আমি তোমার মা-র কাছ থেকে অরিজিনাল পলিসিটা চাইব, বিমা-অফিসে জমা করব, তারপর চেক আসবে, তারও পরে তোমার টাকা পাওয়ার প্রশ্ন। এবং তার যথেষ্ট দেরি আছে।....তুমি সাত তাড়াতাড়ি নেব না নেব না করে ওপরপড়া হয়ে ছুটে এসেছ কেন?

মিমি দু-সেকেন্ড চুপ। তারপর গলায় ভারিক্কি ভাব এনেছে।

—আমি পরে কোনো এমব্যারাসিং সিচুয়েশনে পড়তে চাই না।

—হুম।...তা পলিসিটা একেবারে হাতে করে নিয়ে চলে এলেই তো পারতে।

—পরে পোস্টে পাঠিয়ে দেবো। কিংবা কুরিয়ারে। আজ ডিসিশনটা জানিয়ে গেলাম।

—ও।...কিন্তু আমার একটা খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল যে।

—কিসের খুঁতখুঁতুনি?

—পলিসিটা আমি করেছিলাম আমার দুবছরের মেয়ের নামে। আমার ছোট্ট মিমিকে ওটা উপহার দিয়েছিলাম। গিফট ফেরত নেব?

—সে আপনার ব্যাপার। মিমির গলা যেন দুলে গেল সহসা। পরক্ষণে ঠোঁট কামড়েছে, ইচ্ছে হলে টাকাটা কোনো অনাথাশ্রমেও দান করে দিতে পারেন।

—সে তো মিমি নিজেও দিতে পারে।

—সরি। আপনার টাকায় নাম কেনার বাসনা মিমির নেই।

কী অবলীলায় বাবাকে অপমান করে চলেছে মেয়ে। রঞ্জনের বুকের

মধ্য দিয়ে শুকনো বাতাস বহে গেল। দুলে উঠছে পুরনো পুরনো ছবি। স্বাগতার বাপের বাড়িতে মিমিকে ফোন করেছে রঞ্জন, তোতাপাখির মতো মিমি দূরভাষে আওড়াচ্ছে, তুমি দুষ্টু, তুমি খারাপ, তুমি কক্ষনো আমায় ফোন করবে না...। মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে স্বাগতার বাড়ি ছুটে গেছে রঞ্জন, দরজা খুলে স্বাগতা রক্তচক্ষু, ফের তুমি জ্বালাতে এসেছ? ডাকব মেয়েকে, শুনবে সে তোমার কাছে যেতে চায় কিনা...! মায়ের হাত চেপে আছে মিমি, কটকট বলছে, তুমি পচা, তুমি ভাল নও, একদম আমার কাছে আসবে না...। কোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারপরও হয়তো জোর করে মেয়েকে দেখতে চাইতে পারত রঞ্জন, কিন্তু কাকে দেখবে সে? স্বাগতা আবার বিয়ে করার পর অনেকে বলেছিল, এবার তুই কোর্ট থেকে মেয়ের কাস্টডি চেয়ে নে। রঞ্জনের সাহসে কুলোয়নি। মেয়ে যদি আবার মুখের ওপর না বলে দেয়! আবার যদি শেখানো বুলি উগরে দেয়!

এখনো কি শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে মিমি? মনে হয় না। ছোটবেলা থেকে কোনো ধারণা মগজে গেঁথে দিতে পারলে তা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হয়। স্বাগতা সফল। মেয়ে এখন সত্যিই মন থেকে ঘৃণা করে বাবাকে।

শুকনো বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে একরাশ জলভরা মেঘ ঢুকে পড়ল বুকে। হায় রে, মিমি তো রঞ্জনকে বাবা বলে মানেই না। লোকমুখে রঞ্জন শুনেছে স্বাগতার বরকেই বাপি বলে ডাকে মিমি। ওই সংসারে মিমি এখন পুরোপুরি থিতু, রঞ্জন তার কাছে এক অস্বস্তিকর অস্তিত্ব মাত্র।

ভেতরের সাইক্লোনটিকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাগে আনল রঞ্জন। গলা ঝেড়ে বলল, ঠিক হ্যায়। সে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন। এবার তোমার কথা একটু বলো।

খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল মিমি, আমার আবার কী কথা?

—তুমি তো বি এসসি পার্ট ওয়ান দিয়েছ, তাই না? বটানি অনার্স?

—অনেক খবর রাখেন তো!

—কানে এসে যায়। বি এসসির পর কী ইচ্ছে? এম এসসি করবে তো?

—হয়তো।

—তারপর রিসার্চ? অ্যাকাডেমিক লাইনেই থাকতে চাও?

—ঠিক নেই। রেজাল্টের ওপর ডিপেন্ড করছে। বলেই মিমি সচকিত, আপনি জেনে কী করবেন?

—এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

—মিনিংলেস কিউরিসিটি। বলেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি, থ্যাংকস ফর দ্য কোল্ডড্রিংকস। ঘরে ডাকার জন্যও ধন্যবাদ। চলি।

—চলি বলতে নেই মিমি। বলো আসি।

মিমি ঘাড় কাত করে শুনল কথাটা। তারপর পায়ে পায়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে।

রঞ্জনের বুকটা হুহু করে উঠল। পেছন থেকে ডেকে উঠেছে, মিমি?

—কিছু বললেন?

—একটা রিকোয়েস্ট করব? রঞ্জনের গলা কেঁপে গেল, রাখবে?

—কী?

—পলিসিটা পোস্ট-ফোস্টে নয় না-ই পাঠালে। কোথায় কীভাবে হারিয়ে যায়...। তুমি কুরিয়ার হয়ে এসে দিয়ে যেও।

মিমি চোখে চোখ রাখল। তাকিয়েই আছে। রঞ্জনের চোখে কী খোঁজে মিমি? কিছু কি পেল দেখতে?

রঞ্জন ফের বলল, আসবে তো?

উত্তর না দিয়ে মিমি দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে। নামছে। এক-পা এক-পা করে।

রঞ্জন দ্রুত বেরিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকল। দেখছে মেয়ের চলে যাওয়া। হঠাৎই রঞ্জন বিমূঢ়। দেড়তলার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে রুমাল বের করল। মুখ নয়, ঘাম নয়, চোখ মুছছে। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইশারায় ঝট করে একবার তাকাল ওপরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে নেমে গেল বাকি সিঁড়িটুকু।

রঞ্জনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। ইস, নিজের মেয়েকে বুঝতে এতটা সময় লেগে গেল! ♣

সমালোচক

ট্রেনে উঠেই স্নিফার ডগের মতো কামরাটাকে শুঁকছিল অঞ্জন। চোখ ঘুরছে বনবন। একটা পছন্দসই সিট খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষুণি। দমদম এসে গেলে হুড়্দুম ভিড় হয়ে যাবে কামরায়, দখলটা নিতে হবে তার আগেই।

ঠিক তখনই চেনা গলায় ডাক,—অ্যাই অঞ্জন, এদিকে আয়...এখানটায়।

অঞ্জন ঘুরে তাকাল। রজত তার স্কুলের বন্ধু। সেলস লাইনে ঘসটাচ্ছে। এখন চষে বেড়ায় গোটা নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। নিত্যযাত্রী হওয়ার সুবাদে ইদানীং মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যাচ্ছে রজতের সঙ্গে। বেড়ে জায়গাটা আজ ম্যানেজ করেছে ব্যাটা! হাওয়া ফুরফুর জানলার ধার! শেয়ালদা থেকে ট্রেনে ওঠার সুবিধেটুকু ব্যাটা উশুল করে নিচ্ছে পুরোমাত্রায়।

অঞ্জন দেঁতো হেসে রজতের সামনে এল। সিটে তিনজন আছে, চেপেচুপে বসে পড়ল রজতের পাশটিতে। আলগা ভাবে বলল,—তুই আজ এই ট্রেনে? কাছে পিঠে যাবি বুঝি?

—হ্যাঁ রে। আজ কল্যাণী। পেছনে নামলে সুবিধে হয়, তাই আর এগোলাম না। কোলের ব্রিফকেসখানা খুলে খবরের কাগজ বার করল

রজত,—তুই আজ এই কামরায় যে বড়? তোর ঠেক তো আরও সামনে! ভেন্ডারের আগেরটায়!

—বেরোতে আজ লেট হয়ে গেল। তার ওপর শালা বাসটাও এল ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে। অফিসটাইমেও শালাদের খাঁই মিটতে চায় না....যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে প্যাসেঞ্জার তুলবে। ট্রেনটাই মিস করে যেতাম। কোনও রকমে ছুটতে ছুটতে এই লাস্ট কম্পার্টমেন্টটা...

—তার মানে আজ তোর তাসখেলা গন?

—অগত্যা।

বুকপকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছল অঞ্জন। ঝলক দেখে নিল পাশের সহযাত্রিনীটিকে। মাঝবয়সি। রাগি রাগি দিদিমণি টাইপ চেহারা। ভুরু বেশ কুঁচকে আছে, বসতে অসুবিধে হচ্ছে বোধহয়। কেন যে লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থাকতে এরা এখানে এসে গুঁতোয়! ইচ্ছে করে বডিটাকে সিটের আর একটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিল অঞ্জন। ডানহাতখানা ছড়িয়েছে রজতের কাঁধের পিছনে। চোখ জানলায়। শহরতলির শোভা দেখছে।

দমদম আসতেই সেকেন্ডের মধ্যে ভরে গেল কামরা। সিটের মাঝের প্যাসেজগুলোতেও সেঁধিয়ে গেছে লোকজন। বাজপাখির চোখে দেখছে কোথায় একটু পাছা ঠেকানো যায়।

তার মধ্যেই দিব্যি খবরের কাগজ গিলে যাচ্ছে রজত। নির্বিকার মুখে। ট্রেন নড়ে উঠতেই কনুই দিয়ে খোঁচা মারল একটা,—অ্যাই, নিউজটা দেখেছিস?

—কী রে?

—এক গভর্নমেন্ট অফিসার ধরা পড়েছে। সেন্ট্রালের। ব্যাটা ঘুষ নিচ্ছিল, হাতেনাতে পাকড়াও।

—কোথায়? কলকাতায়?

—খোদ ক্যাপিটালে। হাই র‍্যাংকের ইঞ্জিনিয়ার। ঠিকাদারকে কনট্র্যাক্ট পাইয়ে দেবে বলে তিন লাখ চেয়েছিল। ঠিকাদারটাও তেমনি খচ্চর, ব্রিফকেসে নোটও এনেছে, এদিকে সি-বি-আইকেও নেড়ে দিয়ে এসেছে। ব্যস, অন দা স্পট ক্যাঁক। টাকার বদলে এখন লপ্‌সি খা আর ঘানি ঘোরা।

—ছাড় তো। থোড়াই শাস্তি হবে। ঠিক জাল কেটে বেরিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, হাইফাই ইঞ্জিনিয়ারের হাই অ্যামাউন্ট খসবে, এই যা।

—আরে না। সি-বি-আইকে ম্যানেজ করা অত সহজ নয়। আচ্ছা আচ্ছা মিনিস্টারদের ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেয়।

—রাখ তো, সি-বি-আই ফি-বি-আই সব জানা আছে। কেউ স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু নয়। অঞ্জন ঠোঁট বেঁকাল,—আমাদের অফিসের অনিমেষবাবুর ভায়রার কেসটা তো দেখলাম।

—কী কেস?

—সেম কেচ্ছা। ঘুষ। খবরটা সব কাগজে বেরিয়েছিল। ফ্রন্টপেজ নিউজ। একটা পেপারে তো ছবিও ছাপা হয়েছিল। হাতে হাতকড়ি বাঁধা রাজ্য-সরকারি অফিসার!

—মনে হচ্ছে যেন দেখেছি। কবে বেরিয়েছিল বল্ তো?

—তা প্রায় হবে বছর চার পাঁচ।

—ঘটনাটা বল্।

—সে এক কেলোর কেলো। লোকটা হেব্‌বি চালাক ভাবত নিজেকে, বুক ফুলিয়ে নোট খেত। রীতিমতো পার্টিদের ওপর টরচার করত বলতে পারিস। তো এক পার্টি দিল ভিজিলেন্স লেলিয়ে। ভিজিলেন্সের হাতে লোকটা লিটেরালি কট রেড হ্যান্ডেড।

—কী রকম?

—নোটের বান্ডিলে কী সব যেন কেমিকাল মাখিয়ে দিয়েছিল ভিজিলেন্স। ইন ডিসগাইস ওৎ পেতে বসে ছিল স্পটে। যেই না বাবু নোটের তাড়া হাতে নিয়েছে, ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা ঘ্যাঁক করে চেপে ধরেছে হাত। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে যেই না হাতটি চুবিয়ে দিয়েছে জলে, সঙ্গে সঙ্গে জল লাল। ব্যাপারটা বুঝলি তো?

—হুম্। কেমিকাল রিঅ্যাকশান।

—অ্যাট দা সেম টাইম নোটের ওপরেও বাবুর হাতের ছাপটি পারমানেন্ট হয়ে গেল। আর পালাবার পথ নেই। জানিস তো, ব্যাটা খুব ভুগেছে। তিন তিন বার জামিনের পিটিশন রিজেক্ট করে দিয়েছিল কোর্ট।

টানা চার সপ্তাহ পুলিশ কাস্টডিতে ছিল ভায়রাবাবুটি। পুলিশ কাস্টডি মানে বুঝেছিস তো? চুটিয়ে হাতের সুখ করেছে পুলিশ।

—সে কী রে? পুলিশ পেটাল? গভর্নমেন্ট অফিসারকে? ঘুষ খাওয়ার অপরাধে? হোয়াট এ জোক!

—কারণও ছিল। অ্যারেস্ট হওয়ার পর ভিজিলেন্সকে নাকি খুব শাসিয়েছিল ব্যাটা। পুলিশ কাস্টডিতে বসেও কপচাত খুব। এই মন্ত্রীর সঙ্গে আমার দহরম-মহরম আছে, ওই মিনিস্টারের পি-এ আমার এক বোতলের ইয়ার, একবার ছাড়া পাই তারপর আপনাদের খবর নিচ্ছি.....! ওই বুকনি শুনে লোকে পুজো করবে? আরও আছে। ভিজিলেন্সের লোক কোমরে দড়ি বেঁধে ভায়রাবাবুকে নিয়ে গেছিল তার ঘ্যামচ্যাক ফ্ল্যাটে। সেখানে বাথরুমেও নাকি কালার টিভি!....ভাব তুই সিচুয়েশনটা! পাড়াপড়শি হাসাহাসি করছে, আত্মীয়স্বজন ছ্যা-ছ্যা করছে....লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলের কী চরম বেইজ্জতি। আমাদের অনিমেষবাবু তো দু হাত তুলে নেচেছিলেন। বলতেন, অঘটন আজও ঘটে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অনিমেষবাবুদের নাকি খুব হ্যাটা করত ওই ভায়রাভাই। ইনফ্যাক্ট, পয়সার গরমে কোনও রিলেটিভকেই নাকি পাত্তা দিত না বিশেষ। মানে ভেড়া-ছাগল মনে করত। একটা ইন্সিডেন্টে লপচপানি খতম, মাথা একেবারে গোবরে। অঞ্জন থামল একটু। থেমেই রইল। তারপর ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল,—তা সেই ভায়রাবাবুটির এখন কী হাল আন্দাজ কর তো?

রজত সামান্য ভেবে নিয়ে বলল,—কোর্টে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ করা যায় নি! উকিল লাগিয়ে হয়কে নয় করে দিয়েছে!

—তোর মাথা। কেস কোর্টেই ওঠে নি। চার্জশিট একটা ফ্রেম হয়েছিল বটে, তবে এখনও এভরিথিং ইজ আন্ডার ধামা। কায়দাকানুন করে হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়েছিল, তারপর থেকে দু হাতে রজতমুদ্রা ছড়িয়েছে। এবং খোদ মন্ত্রীর নির্দেশে সম্প্রতি তার সাসপেনশনও উইথড্রন। তিনি আবার বহাল হয়েছেন চাকরিতে। আবার গুলি ফোলাচ্ছেন, তেল ঢালছেন, এবার শুরু হয়েছে হম্বিতম্বি। তবে এবার খানিকটা রেখে-ঢেকে। কোথায় কোথায় বেলপাতা খাইয়েছে নিশ্চয়ই গেস করতে পারছিস?

—হুম্। করাপশন। চরম দুর্নীতি। দেশটা চোর-ডাকাতে ভরে গেছে। ফ্রম টপ টু বটম। রজত খবরের কাগজটা মুড়ে রাখল,—আমিও সেদিন একজনের গল্প শুনছিলাম। সে এক পিকিউলিয়ার ঘুষখোর। ক্যাশ খায় না, কাইন্ডস চায়। আবার জিনিসগুলোও তার ঘরে যায়, তা নয়। অফিসেই লোক ফিট করা আছে, তার থ্রু দিয়েই সব বিক্রি করে বিক্রির টাকাটা নেয়। আর একজন তো শুনেছি পার্টিদের কাছ থেকে পাওয়া ডায়ারিও গোছা করে ঝেড়ে দেয় বাজারে। এমনকি সিগারেটের প্যাকেটও বেচে।

—ছ্যাঁচড়া ছ্যাঁচড়া, গভর্নমেন্টের লোকগুলো সব রাম-ছ্যাঁচড়া।

—শুধু গভর্নমেন্টর লোকদের কেন দোষ দিচ্ছেন ভাই? প্রাইভেটের লোকেরা বুঝি সাধুসন্ত? সামনে দাঁড়ানো আধবুড়ো লোকটা ফস করে নাক গলিয়েছে কথায়,—সেখানে হচ্ছে না? ঘুষ চলছে না?

—তা তো বলি নি দাদা। অঞ্জন হাসল একটু,—দু নম্বরি তো সর্বত্রই। গভর্নমেন্ট সেক্টরে একটু বেশি, এই যা।

—বেশি কম বুঝি না। যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই হাত্তাবাজি চলছে। মোটা অংকের কটা বিজনেস লোন কাটমানি ছাড়া মেলে ভাই? কোন প্রাইভেট অফিসে অর্ডার ধরতে গেলে পয়সা ছড়াতে হয় না? বিল আদায় করতে গেলেও তো গান্ধিজির মুখ দেখাতে হয়। ঠিক কিনা?

—তা ঠিক। রজত মাথা দোলাচ্ছে,—এই যে আমি ডিস্ট্রিবিউটারদের ঘরে ঘরে ঘুরি, তাদের তুষ্ট রাখার জন্য আমাকেও কি মাঝেমাঝে গাঁটের কড়ি খরচা করতে হয় না? তো। বড় কোম্পানি তো নই, সেই সুযোগটা নেয়। স্কুইজ করে। পারসোনাল গিফ্‌ট নেয়, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হয়। এও তো কাইন্ড অফ ঘুষ।

—বটেই তো। যার যেখানে যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটুকু দেখিয়েই এক্সট্রা কামাই করছে। গভর্নমেন্ট সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, রাজনীতির জগত, সমাজসেবার দুনিয়া সর্বত্রই শুধু টাকার খেল।

—আর সাফার করছি আমরা। সাধারণ মানুষরা। শুধু বেআইনি টাকার লেনদেনটা বন্ধ করা গেলে কী বিপুল সামাজিক অপচয় রুখে দেওয়া যায় ভাবতে পারেন? যদি কন্ট্রাকটারকে কাটমানি দিতে না হয়, তাহলে সে

হয়তো রাস্তাটা একটু ভাল বানাবে। ব্যবসায়িকে যদি ঘুষ দিতে না হয়, তাহলে হয়তো জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমবে....

—এটা কি একটু বেশি আশা করা যাচ্ছে না ভাই? যারা নাফা ছাড়া কিছু বোঝে না, তারা তো ওটাকেও কামাই-এর মধ্যেই ঢুকিয়ে নেবে। নয় কি?

—কী জানি, আমার তো মনে হয়...

গরম গরম আলোচনার মাঝেই একের পর এক স্টেশন পেরোচ্ছে ট্রেন। একদম শেষে বলে এ কামরা থেকে নামছে অনেক, উঠছেও নেহাত কম নয়। রাগি মুখ দিদিমণি নেমে গেল ইছাপুরে, তার জায়গায় জমিয়ে বসল দন্ডায়মান তার্কিক। লোকটা অল্প-অল্প ঠেলছে অঞ্জনকে, আয়েশ করে বসার জন্য। অঞ্জনও বসে আছে চেপে, এক কণা জায়গা ছাড়তে সে রাজি নয়।

কামরায় আনাগোনা করছে হকাররা। মানুষের জঙ্গল ভেদ করে। তাদের বিচিত্র চিৎকারে কোলাহল আরও সরগরম। শ্যামনগর থেকে উঠল এক ছোকরা চা-অলা, ভিড় ঠেলে ঠেলে সেও এসেছে এপাশে। হাতে ঝোলানো খুদে উনুনের ওপর কেটলি, প্লাস্টিকের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে চা, খাচ্ছে কেউ-কেউ।

রজত জিজ্ঞেস করল,—কী রে, গলা ভেজাবি নাকি?

উত্তর না দিয়ে অঞ্জন বলল,—লক্ষ কর বদমাইশিটা। এখানেও কেমন টাকার খেলা চলছে!

—মানে?

—রেল কোম্পানি ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ ধোঁয়া ছড়ালেই খপ করে ধরবে। আমরা খাচ্ছিও না। কিন্তু ট্রেনে তো দাহ্যবস্তু ক্যারি করাও বেআইনি, অথচ চা-অলাটা দিব্যি আগুন নিয়ে ঘুরছে কী করে? নির্ঘাৎ রেলের লোকদের টাকা দিয়ে....

—যাক গে যাক, গরিব মানুষ, নয় দু চার পয়সা কামালই।

—না, না, এটা নীতির প্রশ্ন। যেদিন থেকে ট্রেনে সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে ওই চা খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি আমি।

—খা।

রজত চা নিল। দেখাদেখি পাশের তার্কিকও। ছোট্ট চুমুক দিয়ে লোকটা বলল,—চুনোপুটিদের ছেড়ে রাঘব-বোয়ালদের আগে দেখুন ভাই।.... আজকের খেলার পেজের নিউজটা পড়েছেন ভাল করে?

অঞ্জনের চোখ টেরচা,—কেন? কী আছে?

—বেটিং কেলেঙ্কারি। যেসব ক্রিকেটারদের আমরা মাথায় তুলে নাচি, দেখেছেন তাদের কাণ্ডকারখানা? পয়সা খেয়ে কেমন অবলীলায় তারা দেশকে ডুবিয়ে দিয়ে আসছে।

—আপনি আজহারউদ্দিন আর অজয় জাদেজার কেসটা বলছেন?

—মনোজ প্রভাকর তো আপাতত দুটো নামই করেছে।

—প্রভাকর নয়, হ্যান্সি ক্রোনিয়ে।

—ওই হল।...যেই করুক, ধরে নেবেন না ওই দুজনই শুধু দায়ী, বাকিরা ধোয়া তুলসীপাতা। কে কখন সত্যি সত্যি শূন্য করছে, আর কে পয়সা খেয়ে জিরো করছে, তা কি আমরা বুঝতে পারছি? আমাদের টুপি পরিয়ে আখের গোছাচ্ছে না ছেলেগুলো?

—সে আর বলতে। অঞ্জন তৎক্ষণাৎ সায় দিল,—ইনোসেন্স দেশপ্রেম এসব শব্দগুলোই কেমন ভেক হয়ে গেছে। কোনও স্ফিয়ারে মরালিটি নেই, কাউকে আপনি আইডল ভাবতে পারবেন না। জানেন তো, শচীনের বিয়েতেও একগাদা জুয়াড়ি নেমন্তন্ন পেয়েছিল?

—আহা, শচীনকে এর মধ্যে আনছিস কেন? শচীন অত্যন্ত জেনুইন ছেলে।

—কে জেনুইন, কে ঝুটা, হু ক্যান সে? কপিলদেবকেও তো আমরা সাচ্চা বলে জানতাম। তার দিকে আঙুল ওঠেনি? যতই কেঁদেকেটে কপিল সাফাই দিক, ফাঁক তো কোথাও আছে নিশ্চয়ই? অভিযোগ তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! টাকাপয়সার হিসেবও তো ঠিকমতো দিতে পারছে না শুনছি!

—সত্যি, খেলার জগতেরও কী নোংরামি!

আবার জমে উঠেছে তর্ক। চলছে বাদানুবাদ। চলছে মতামত জাহির।

চুলচেরা বিচার! দেখতে দেখতে কল্যাণী এসে গেল।

জাতীয় নায়কদের কাটাছেঁড়া করতে করতেই উঠে পড়ল অঞ্জন। প্রতিবাদ জানাতে জানাতে রজতও। হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতেই ট্রেন থেকে নেমেছে দুজনে। এগোচ্ছে প্ল্যাটফর্মের পেছন পানে।

হঠাৎই সামনে কালো কোট। অঞ্জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল,—টিকিট?

বুকটা ধড়াস করে উঠল অঞ্জনের। প্রাণপণ চেষ্টায় গলা অকম্পিত রেখে বলল,—মান্থলি।

—কাইন্ডলি দেখাবেন একটু?

অঞ্জনের হৃৎকম্প বেড়ে গেল। বুকে নেহাই পড়ছে ঠকঠক। অসহায় চোখে দেখল, রজত এগিয়ে গেছে খানিকটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে এদিকে!

কালো-কোট গন্ধ পেয়ে গেছে। একটু কড়া গলাতেই বলল,—প্লিজ, তাড়াতাড়ি করবেন।

দুর্বল হাতে পিছনের পকেট থেকে পার্স বার করল অঞ্জন। খাপে রাখা মাসিক টিকিটখানা বাড়িয়ে দিয়ে আমতা আমতা স্বরে বলল,—ডেটটা.... মানে...

—এ তো ন'দিন আগে ল্যাপস করে গেছে!

—মাঝে কদিন অফিসে আসিনি তো। মরিয়া হয়ে মিথ্যে বলল অঞ্জন,—আজ তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লাম....এক্ষুনি করিয়ে নিচ্ছি।

—ওই সব কায়দার কথা অন্য জায়গায় মারবেন। আপনাদের ট্যাকটিস আমরা জানি। প্রত্যেক মাসে আট দশ দিন এক্সট্রা খাইয়ে দেওয়া, অ্যাঁ?

—বিশ্বাস করুন, আমি প্রত্যেক মাসেই ঠিক সময়ে কাটি। এবারেই...

—পুরনো মান্থলি আছে?

—ন্‌ন্‌ন্‌না। মানে আমি রাখি না।

—বুঝেছি। টাকা বের করুন। এগারো টাকা ভাড়া, প্লাস হানড্রেড। একশো এগারো।

মহা ফ্যাসাদ হল তো! কোনও মাসে ধরা পড়ে না অঞ্জন, আজই....?

হয়ে যেতে পারত। দল দেখলে কালো কোট ফিরেও তাকাত না।

মুহূর্তে অঞ্জন ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। বুকে ধড়ফড়ানিটাকে চাপা দিয়ে নীচু গলায় বলল,—আবার ফাইন-টাইনের ঝামেলায় যাচ্ছেন কেন? কুড়ি টাকা রাখুন।

কালো কোট বিলবই খুলে ফেলেছে। ভাবলেশহীন গলায় বলল, উহুঁ, একশো এগারো।

অঞ্জন আর একটু গলা নামাল,—তিরিশ হলে চলবে?

—না। একশো এগারো। চটপট করুন। চটপট।

অঞ্জন ফিসফিস করে বলল,—বিল-টিলের দরকার কী, পুরো পঞ্চাশই নিন।

—উঁহু, একশো এগারো। আমি ঘুষ-টুস খাই না। কথা বাড়ালে ফাইনের অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে। দেবেন, না জি-আর-পি ডাকব?

পাংশু মুখে টাকাটা বার করল অঞ্জন। একশো এগারো নয়, একশো কুড়ি। রসিদের সঙ্গে গুনে গুনে তাকে ন টাকা ফেরত দিল কালো কোট। শীতল স্বরে বলল,—আশা করি সামনের মাসে আর এ খেলাটা খেলবেন না। প্রপার ডেটে মান্থলি কাটবেন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল কালো কোট।

অঞ্জন হাঁটছে গোমড়া মুখে। স্টেশনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল রজত, কাছে এসেছে। ব্যগ্র মুখে বলল,—কী রে, কী বলছিল?

—মান্থলির ডেটটা জাস্ট কভার করে গেছে, সেই চান্সটা নিয়ে ব্যাটা...। অসম্মান ঢাকতেই বুঝি আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে অঞ্জন,—সতীপনা মারাচ্ছে! ঘুষ নিই না...শালা খানকির ছেলে...!

—এই এই, মুখ খারাপ করছিস কেন? আরও সাতটা দিন কাটবি না, শোধবোধ হয়ে যাবে। একই লোক কি রোজ রোজ ধরা পড়ে নাকি? রজত চোখ টিপল,—আমি বাবা জোর বেঁচে গেছি। আমারও আজ...।

অঞ্জন একটুও সান্ত্বনা পেল না। তেতো মুখে হাসার চেষ্টা করল সামান্য। পারল না। ধরা পড়া আর না পড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদটা যে থেকেই যায়! ♣

অচিন পাখি

অঞ্জনা জলভরা চোখে দেখছিল পাখিটাকে। ছোট্ট এত্তটুকুন তুলতুলে পাখি। এক হাতের মুঠিতেই বুঝি ধরে ফেলা যায় তাকে। গাঢ় নীল রঙের ডানা। আলতা মাখা ঠোঁট। মাথায় ছোট্ট লাল ঝুটি। বুকের নীচে সাদা হলুদের ছিটছিট। চোখ দুটো মিশমিশে কালো। শোওয়ার ঘরের দক্ষিণে একটাই খোলা জানলা। জানলা জুড়ে লতাপাতার নকশাকরা বাহারি গ্রিল। সেই গ্রিলে বসে পাখি আবার ডাকল,—কই, কই! অঞ্জনার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। মৌ কি ডাকল তাকে!

পাখি আবার ডেকেছে,—কই, কই!

কোত্থেকে এল পাখিটা? এভাবে ডাকছেই বা কেন? আগেতো কখনও পাখিটাকে চোখে পড়েনি অঞ্জনার!

তা চোখে পড়ার কথাও নয়। দেখবেটা কখন! এই এক মাস ধরে বাড়ি ভর্তি শুধু লোক আর লোক। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি। সকাল, বিকেল, সন্ধে বাড়ি পরিপূর্ণ। বাবা আসছে, কাকা আসছে, ভাসুর-জা-দেওর-ননদরা আসছে তো আসছেই। যে খবরটা শোনে, সেই দৌড়ে আসে। মা

দিদিরা তো এসে ছায়ার মতো পাশে পাশে রইল বেশ কটা দিন। দাদা বৌদিরা এবেলা-ওবেলা। বুকের মধ্যে কান্না জমার ফাঁকটুকুও ছিল না অঞ্জনার। প্রথম ক'দিন তো একেবারেই না। দাদা, ভাই, ভাশুর, দেওররা সেই যে পাষাণচাপা বুকে শ্মশানে রেখে এল মেয়েটাকে তারপর থেকে টানা তিনদিন ঘুমের ওষুধে অঞ্জনা আধাঅচেতন। অদ্ভুত সেই ঘোরের মধ্যে অঞ্জনা শুধু আবছাভাবে শুনছে কথা আর কথা। দু'কামরার ছোট্ট ভাড়াবাড়ি অবিরাম কথার প্লাবনে থইথই। বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, সোফা, খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, আয়না, হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি, কড়া সব কিছুতেই ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো একঘেয়ে একটানা বেজে চলেছে কথারা।

ডানপাশ ফিরলে শব্দ বাজে....মেয়েটা এভাবে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যাবে ভাবতেই পারিনি গো!....কী সুন্দর কটকট করে কথা বলত সারাক্ষণ!....তিন বছরের মেয়ে কেমন পাকা বুড়ির মতো গান করত, 'ধীরে ধীরে পেয়ারকো বাড়ানা হ্যায়'....এই তো পয়লা বৈশাখ আমাদের ওখানে গিয়ে আমার গলা জড়িয়ে কী বায়না, কাকি গো আজ একলা বৈশাখ, আজ আইসক্রিম খেলে গলা ব্যথা হবে না!....আইসক্রিম বলত না, বলত আশ করিম!

বাঁ পাশে ঘুরলে ঘর জুড়ে আরেক ধরনের ফিসফাস। ক্ষোভ, ক্রোধ হাহুতাশের তপ্ত বাতাস....ওইটুকু মেয়ের গলায় অত বড় একটা ছিপি আটকেছে, তাকে কিনা ছ'ঘণ্টা এমনি এমনি ফেলে রাখল হাসপাতালে!.... ডাক্তারগুলোকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত। পাষণ্ড। পাষণ্ড সব। অমন একটা ফুলের মতো মেয়ে, শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করছে, দেখেও একটু মায়া হল না!....এখন তো আইন হয়ে গেছে, ডাক্তার নার্সগুলোর নামে এখখুনি কেস করে দেওয়া দরকার!....

চিৎ হলে, উপুড় হলে, ভারী বাতাস কাঁপছে থরথর....নাতনি আমার দুদিনের জন্য মায়া বাড়াতে এসেছিল গো। পাপের পৃথিবীতে আর টিকতে পারল না!....তিনিই দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়ে নিলেন, দুর্ঘটনাটা নিমিত্ত মাত্র!....

এতসব অজস্র কথার দিনে পাখিটা কি এসেছিল কখনও! শুনেছে

কিছু? কে জানে! অঞ্জনা আঁচলে চোখ মুছল। যারা এসেছিল, তারা সবাই চলে গেছে একে একে। এখন শুধু সে আর শান্তনু। আর দু'কামরার এই ছোট্ট ভাড়াবাড়ি। ছোট্ট কোথায়! কথারা সব ফিরে যাওয়ার পর দশ বাই বারোর ঘর দুখানা কখন প্রকাণ্ড মাঠের মতো বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ মাঠে এতটুকু সবুজ নেই, আকাশ নেই, শুধু এক রুক্ষ পোড়ামাটি বিরাজ করছে আদিগন্ত। এ মাটির সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে চলে গেছে মৌ। অঞ্জনার সংসার পুরোপুরি দেউলিয়া।

এমন এক নিঃস্ব বাড়িতে কেন এল এই পাখি!

দুই

এ সপ্তাহ থেকে আবার অফিস বেরোচ্ছে শান্তনু। সে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ তবু নির্জনতারও ভাষা থাকে কিছু। এতাল বেতাল। অর্থহীন। তবু তো ভাষা। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অলীক কিছু বাক্যবন্ধ। সকালবেলা চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসেছে দুজনে—

—চায়ের সঙ্গে একটা বিস্কুট খাও।

—ভাল লাগছে না।

—মাথাব্যথাটা রাত্তিরে বাম্ লাগিয়ে কমেছিল?

—নাহ্, ওষুধ খেয়েছিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে শান্তনু আবার কথা খুঁজল,

—বাড়িতে চিনি নেই?

—কেন?

—চায়ে চিনি কম দিয়েছ।

—কমই ভাল।

মুঠো-মুঠো চিনি খাওয়া ঠিক না। 'মুঠো-মুঠো' শব্দ দুটো কিছু না ভেবেই বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, ব্যাস তাতেই সমস্ত কথা হারিয়ে গেল দুজনের। মেয়েটা যখন তখন বয়াম খুলে মুঠো-মুঠো চিনি খেত। মেয়েকে জব্দ করতে চিনির বয়াম উঁচু তাকে তুলে রেখেছিল অঞ্জনা। একদিন মোড়ায়

উঠে সেটা পাড়তে গিয়ে....। ঠাস্ করে মেয়ের গালে একটা চড় মেরেছিল অঞ্জনা, সারক্ষণ মুঠো-মুঠো চিনি খাওয়া তোমার আমি বার করছি। শান্তনু দৌড়ে এসে মায়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মৌকে।

অঞ্জনা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছে, শান্তনুর চোখ মিছিমিছি খবরের কাগজের পাতায়। দুজনেই প্রাণপণে অন্য কোনো কথা খুঁজে পাওয়ার জন্য হাঁচোড়পাঁচোড় করছে। দুজনেই প্রাণপণে চায় কাঠের টেবিলটা কিছু কথা বলে উঠুক। দেওয়াল থেকে ফুটে বেরোক অন্য কোনো শব্দ। কিন্তু শব্দের পৃথিবী পাথরের মতো চুপ। শান্তনু রোবটের মতো হাত-পা নাড়ল কিছুক্ষণ। রোবটের মতো উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। রোবটের মতো অঞ্জনা চলে গেল রান্নাঘরে। বাথরুমের রোবট একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গোলাপি রঙের বেবি টুথব্রাশটার দিকে। রান্নাঘরের রোবট স্থির চোখে দেখছে উঁচু তাকে তুলে রাখা পোর্সিলিনের বয়াম।

অফিস বেরোনোর আগে অঞ্জনার মাথায় আলতো হাত রাখল শান্তনু,

—ঠিক সময়ে খেয়ে নিও। বেলা কোরো না।

অঞ্জনার গলা কেঁপে গেল,—কখন ফিরছ?

—যত তাড়াতাড়ি পারি। এসে আজ তোমাকে নিয়ে দিদির বাড়ি যাব। দরজার বাইরে পা ফেলতে গিয়েও শান্তনু শোকেসটার দিকে তাকিয়ে ফেলল। অঞ্জনার জামাইবাবু ল্যামিনেট বাঁধাই করে শোকেসের মাথায় মৌকে সাজিয়ে রেখে গেছে। শান্তনুর চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা হেসে উঠেছে খিলখিল। শান্তনু মনে মনে বলল,—টাটা মৌ।

শান্তনু চলে গেলে গোটা বাড়ি ধীর পায়ে ঘুরে বেড়ায় অঞ্জনা। খবরের কাগজে চোখ বোলায়। দুনিয়া জুড়ে এত লক্ষ-লক্ষ খবর ছড়িয়ে, একটা খবরও অঞ্জনার মস্তিষ্কে সেঁধোতে পারে না। কাগজ ভাঁজ করে আবার সে এ-ঘর ও-ঘর করে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মৌ। মৌ। মৌ-এর জামা। মৌ-এর জুতো। মৌ-এর খুদে খুদে হাঁড়ি-কড়া-খুন্তি। চোখ পিটপিট বার্বিডল। লালকালো টেডি বেয়ার। অজস্র রঙিন ছবির বই। ড্রয়িং খাতা। খাতা জুড়ে সূর্যিমামার মুখ এঁকে রেখেছে মৌ। প্যাস্টেল পেনসিলে রঙ করা হলুদ বৃত্তের মাঝখানে একটা দাড়িগোঁফঅলা মানুষের মুখের আদল। চোখ দুটো

তার তেড়াবেঁকা গোল। দাড়ির জায়গায় যেমন খুশি সরু মোটা কালো কালো লাইন। অঞ্জনা নির্নিমেষে চেয়ে থাকে ছবিটার দিকে। ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটতে গিয়েও দুমড়ে ভেঙে পড়ে।

বেলা যায়।

বেলা বাড়লে একসময় ভারী শরীরটাকে টেনে তুলে স্নান সারে অঞ্জনা। যন্ত্রের মতো ভাত তোলে মুখে। তারপর বিছানায় নিথর পড়ে থাকে সারাটা দুপুর।

বেলা যায়। আবার যায়ও না। কখনও কখনও সময় এমন খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলেও এতটুকু নড়ানো যায় না তাকে। সেই নিশ্চল সময়ের প্রতিটি পল, অনুপল, একটা-একটা করে গুনতে থাকে অঞ্জনা। গুনে গুনেই যদি শেষ করা যায় দীর্ঘ দুপুর, এই আশায়। কাজের লোকটা কখন বিকেলের বাসন মাজতে আসবে, সেই আশায়। যমদূতের মতো প্রথম জ্যৈষ্ঠের নির্দয় উত্তাপ কখন গুটিয়ে নেবে নিজেকে, এই আশায়।

এরকমই অসহ্য সময়টাতে পাখিটা আসতে শুরু করেছে আজকাল। অঞ্জনা সেদিন মন দিয়ে লক্ষ করল পাখিটাকে। প্রথমে জানালার কার্নিশে এসে টুকুস করে বসল। কয়েক পলক চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল অঞ্জনার অন্দরমহলটাকে। কাউকে যেন খুঁজছে। লেজ নাচিয়ে ডেকে উঠল,—কই, কই!

অঞ্জনা পায়ে-পায়ে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে ঝিলিক হেসে উড়ে পালিয়েছে পাখি। জানালার গ্রিলে মুখে ঠেকিয়ে অঞ্জনা বহুক্ষণ খুঁজল তাকে। নাগরিক নিয়ম ভেঙে এ বাড়ির গায়ে এক ফালি জমি কী করে যেন ফাঁকা পড়ে আছে এখনও। গাছে আগাছায় ভরাট। তার মধ্যে দু-তিনটে নিষ্ফলা পেঁপেগাছকে টপকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে এক কৃষ্ণচূড়া। ফুলে ফুলে তার ডালপালা অদৃশ্য প্রায়। ওখানেই কি লুকোলো পাখি? নাকি পেঁপে ডালে বাসা বেঁধেছে? নকশাকরা গরাদে মুখ চেপে অঞ্জনা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে পাখিটাকে। কৃষ্ণচূড়ার কাণ্ড বেয়ে দুটো কাঠবেড়ালি ছুটোছুটি করছে ক্রমাগত। এক জোড়া ছাতার পাখি ডালে বসে খুঁটছে পরস্পরকে। গোটা

কয়েক শালিক আগাছার ঝোপে তারস্বরে নির্বিকার ঝগড়া করে চলেছে। ওই পাখিটা কোথ্থাও নেই। বাইরের ঘরে কলিংবেল আর্তনাদ করে উঠল। কাজের লোকটা এসে গেছে। সেদিনকার মতো পাখিটাকে ভুলল অঞ্জনা।

পাখি কিন্তু ভোলেনি। পরদিন আবার এসেছে। ঠিক ওই দুপুরবেলা। একটু যেন বেশি চঞ্চল আজ। মিহি পায়ে কার্নিশ থেকে গ্রিলে এল। গ্রিল বেয়ে কার্নিশে। দুরন্ত পায়ে কার্নিশ ধরে পায়চারি করল। উড়তে উড়তে, ছুটতে ছুটতে আচমকা ঘুরেছে অঞ্জনার দিকে।

নিঝুম ঘরে ঢুকে আলোছায়ার খেলা দেখাচ্ছে রোদ্দুর। অঞ্জনার নিশ্বাস বন্ধ। একটুও নড়তে পারছে না। নড়লেই যদি সে পালিয়ে যায়!

পাখিটারও মিশমিশে কালোচোখ নিষ্পলক। অঞ্জনার চোখে চোখ রেখে অবিকল মানুষের স্বরে ডেকে উঠল,—কই, কই!

তিন

রাত্রে শান্তনুকে গল্পটা না বলে পারল না অঞ্জনা। শান্তনু বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। ইদানীং সিগারেট খাওয়া তার বেড়েছে। শোওয়ার আগে মাথায় ধোঁয়া না গেলে চোখ বুজতে অসুবিধা হয় তার। অঞ্জনার কথা শুনে সে আনতাবড়ি মন্তব্য করে বসল,—মনে হয় ওটা বসন্তবৌরি।

—দূর। বসন্তবৌরি তো টুকটুকে হলুদ হয়। বললাম না পাখিটার রঙ ঘন নীল। অনেকটা নেভি ব্লু টাইপ।

—বুলবুলি টুনটুনি হতে পারে।

—বুলবুলি টুনটুনির পেটে মোটেই ওরকম সাদা-হলুদ স্পট থাকে না।

—তাহলে মুনিয়া।

—যাহ্, মুনিয়ার মাথায় ঝুঁটি থাকে বুঝি!

বুকের উপর রাখা অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলল শান্তনু। এত দিন পর অঞ্জনার সঙ্গে হাল্কা গল্প করতে পেরে ভাল লাগছিল তার,—তবে সিওর ওটা নীলকণ্ঠ।

—মোটেই না। নীলকণ্ঠ অনেক বড় হয়। অত্ত ছোট্ট নাকি!

—তবে আর নাম মনে করতে পারছি না। পাখি সম্পর্কে আমার নলেজ খুব পুওর। অঞ্জনা আলো নিভিয়ে শান্তনুর পাশে এসে শুল,—আমার কীরকম অন্যরকম মনে হচ্ছে।

—কী রকম?

—ওটা পাখি নয়।

—পাখি নয় মানে? শান্তনু শব্দ করে হেসে উঠল। হাসির দমকে বুক থেকে কাচের অ্যাশট্রে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সিগারেটটা তাতে নিবিয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল খাটের নীচে, এই বলছ পাখি! এই বলছ পাখি নয়।

অঞ্জনা যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এবার,—পাখি নয়ই তো।

—তবে কী পতঙ্গ?

—না। ওটা মৌ। আমাদের মৌ।

অঞ্জনার স্বর এমন অলৌকিক যে প্রথমটা শান্তনুও শিউরে উঠেছে। পরক্ষণে হাত রেখেছে অঞ্জনার গায়ে,—কেন এমন করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ? ফেস দা ট্রুথ। মৌ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মৌ আর আসবে না।

অন্ধকারে ছেয়ে গেছে ঘর। গাঢ় নয়, এক ঝাপসা কালো অন্ধকার।

অঞ্জনা জানলায় এসে দাঁড়াল। ওপারের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে তেরছাভাবে আলো এসে পড়েছে চিলতে জমিটায়। সেই আলোতে ছায়া ছায়া গাছ আগাছা দেখছে অঞ্জনা। ফিসফিস করে বলল,

—ওখানে কোথ্থাও পাখিটা নেই। আমি খুঁজে দেখেছি।

শান্তনু বিছানা থেকেই উত্তর দিল,—এখানেই থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। অন্য কোথা থেকেও উড়ে আসতে পারে।

—আমার জানলাতেই আসে কেন?

—বারে, পাশে এক টুকরো ফাঁকা জায়গা, গাছপালাও আছে, যে কোনও পাখি আসতে পারে। ইচ্ছে হলে জানালাতেও বসতে পারে।

—এতদিন তবে কেন আসেনি?

—হয়তো এসেছিল। তুমি খেয়াল করোনি। সারাদিন যা ব্যস্ত থাকতে।

—আমি এত বেখেয়াল! একটা পাখি জানালায় এসে বসছে, নাচছে, উড়ছে...অঞ্জনার স্বর দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যাচ্ছে,—সকালে আসে না, বিকেলে আসে না, শুধু কাঠদুপুরেই বা আসে কেন?

—পাখির মনের কথা আমি কী করে বুঝব বলো।

—বোঝার দরকার নেই। অঞ্জনার গলা আচমকা তীক্ষ্ণ,—তুমি চাও না মৌ আসুক। তুমি মৌকে ভুলে যেতে চাও। আমি জানি।

শান্তনু উঠে এসে অঞ্জনার কাঁধে হাত রাখল,—তুমি কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে?

—স্বার্থপর। স্বার্থপর। মৌকে ভালোবাসতাম বলে কম হিংসে ছিল তোমার!

শান্তনুর হাত খসে পড়ে গেল। নিঃশব্দে বিছানায় ফিরে এসেছে সে।

নিদালি ছড়িয়ে রাত ঘুম পাড়ায় বিশ্বভুবনকে।

শান্তনু আর অঞ্জনার কাছে এসে হার মেনে যায় সেই নিদালি। মানব মানবী নয়, যেন দুটো শরীর বরফের চাঙড় হয়ে শুয়ে থাকে পাশাপাশি। হিমশীতল বাষ্প ছড়ায়। বরফের বাষ্প। সারা রাত।

চার

—তবে রে দুষ্টু মেয়ে, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে!

—কই, কই!

—ছি, যত বাজে জিনিসের জন্য বায়না। খাও না, তোমার জন্য তো টিটবিট এনে রাখা আছে।

—কই, কই!

—ও, আজ বুঝি লজেন্স মুখে রুচছে না! শ্যামাপদর দোকান থেকেই তো কিনে আনলাম। শ্যামাপদ আজও কত দুঃখ করল। তুই যে আর যাস না ওর দোকানে! অঞ্জনা ঝিরঝির হেসে উঠল,—কিপটেটাকে পটিয়েছিসও বটে। ওই হাড়কিপটে লোক, আঁজলাভরা জল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে, তাও এক ফোঁটা জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে না,...

সেও তোকে ডেকে ডেকে রোজ বিনা পয়সায়....! দ্যাখ দ্যাখ, ওর দোকান থেকে আরও কত কী এনেছি দ্যাখ।

—কই, কই!

—কই কই কী করে! নে না। ওই তো জানলায় হজমিগুলি, চানাচুর সব রেখে দিয়েছি। অঞ্জনার গলায় আদর দোলা খাচ্ছে,—লক্ষ্মী সোনা মেয়ে, আজ অন্তত একটা সন্দেশ খা। খা, তাহলে আইসক্রিম দেব। টুটিফ্রুটি। বেশ তো, সন্দেশ না খাস দুধটুকু আজ কিন্তু শেষ করতেই হবে। নইলে কিন্তু সেই খেলনাটা পাবে না। বলতে বলতে অঞ্জনা দৌড়ে যায় রান্নাঘরে। গ্যাসউনুনের পাশ থেকে ঠোঙা নিয়ে ফিরে আসে,—ভুলেই গিয়েছিলাম রে। তোর বাপিকে দিয়ে আজ জিলিপি আনিয়েছিলাম।

জানালায় সাজানো সারসার খাবার কোনও দিন বা খুঁটে-খুঁটে খায় পাখি, কোনও দিন ছুঁয়েও দেখে না। স্টিলের বাটিভর্তি দুধে মুখ ডোবায় কি ডোবায় না, উড়ে যায় ফুড়ুত। সকালে এখন ঘুম থেকে উঠে ঝড়ের গতিতে হাতের কাজ সারতে থাকে অঞ্জনা। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, জমাদারকে জল দেওয়া, টুকটাক দোকানপাট। কোনও কাজেই আর অনীহা নেই। শান্তনু একবারের জায়গায় তিন বার চা পায়। তড়িঘড়ি তাকে খাইয়ে প্রায় ধাক্কা মেরে অফিসে পাঠিয়ে দেয় অঞ্জনা। চোখের সামনে খবরের কাগজ পড়ে থাকে, ছুঁয়েও দেখে না। স্নান-খাওয়া ঝটপট সেরে পরিপাটি সেজে অঞ্জনা জানলার কাছে বসে। এক সেকেন্ডের জন্যও অন্যদিকে মনোযোগ দেয় না! মুহূর্তের অমনোযোগের জন্যই না তাকে একবার কড়া সাজা দিয়েছে মৌ! দুপুরগুলোকে এখন বড়ই ছোট্ট মনে হয় অঞ্জনার। এই আসে, এই যায়। ঘড়ির কাঁটা ছোটে পাগলের মতো। অঞ্জনার বুক ঢিপঢিপ করে। এই বুঝি এসে গেল ঠিকে ঝি! রাত মানে এখন সকালের প্রতীক্ষা। সকাল মানে আসছে দুপুর। দুপুর মানেই এক অস্ফুট কামনা। থেমে থাক। সময়টা থেমে থাক।

পাঁচ

দরজা খুলে অঞ্জনা বিব্রত হল। শান্তনু। শান্তনুর মুখ টকটকে লাল।

চোখ ছলছল করছে। কোনওরকমে জুতো খুলেই হুড়মুড় করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল,—থার্মোমিটার দাও তো।

অঞ্জনা আড়চোখে একবার জানলার দিকে তাকিয়ে নিল। বিরস গলায় প্রশ্ন করল,—জ্বর এসেছে নাকি?

কপালে আড়াআড়ি হাত রেখে শুয়ে আছে শান্তনু, হাত না সরিয়েই বলল,—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। অফিসে সবাই গায়ে হাত দিয়ে বলল এখখুনি বাড়ি চলে যান।

অঞ্জনা নিস্পৃহ মুখে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার টানল। ধুলো জমেছে ড্রয়ারে। ক্লিপ, ফিতে, টিপ, লিপস্টিক, পাউডারের ভিড় থেকে থার্মোমিটার খুঁজে বার করল,—ও ঘরের ডিভানে শুতে পারলে না? দুপুরবেলা তো তোমার ওঘরে শোওয়ার কথা।

নিমেষে আরও পাংশু শান্তনু। অভিমানে গলা ভিজে এল তার,—যাচ্ছি। জ্বরটা দেখেই ওঘরে চলে যাচ্ছি।

শান্তনুর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিয়েই অঞ্জনা সরে যাচ্ছিল, শান্তনু পলকে চেপে ধরেছে তাকে। এত জোরে যে অঞ্জনার হাত ঝনঝন করে উঠল।

—একটু বোসো। এক সেকেন্ড।

শান্তনুর স্বরে এমন কিছু ছিল, এবার অঞ্জনার বুক টলমল। কত সহস্র যুগ পরে শান্তনুর মুখের দিকে ভালভাবে তাকাল সে। ছলছল চোখ, রক্ত ফেটে পড়া মুখ, চোখের কোণে ঘন কালি, সব মিলিয়ে এক উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষ। থার্মোমিটারের পারা দেখতে গিয়ে অঞ্জনার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। একশ'তিন। মাগো! শান্তনুর গলায় কপালে হাত দিয়ে আরও ভাল করে অনুভব করল তাপটাকে। গোটা শরীর ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। দৌড়ে থার্মোমিটার টেবিলে রাখল, পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে সোজা ছুটেছে বাথরুমে, বাটি করে জল নিয়ে এল, ড্রেসিংটেবিল থেকে ওডিকোলন নিয়ে মেশালো বাটির জলে, ন্যাকড়া ডুবিয়ে দ্রুত জলপটি চেপে ধরেছে শান্তনুর কপালে। শান্তনু উঠতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তার দু কাঁধ চেপে ধরেছে অঞ্জনা,

কাঁধ ধরে শান্তনুকে শোওয়াতে গিয়ে অঞ্জনা আবার প্রবল ঝাঁকুনি খেয়েছে। এত প্রবল যে মস্তিষ্কটাও তোলপাড়। শক্ত সবল কাঁধদুটো কবে এমন প্যাকাটির মতো ক্ষীণ! এত রোগা হয়ে গেছে শান্তনু? ভয়ে ভয়ে অঞ্জনা হাত রাখল মানুষটার পাঁজরে। সব ক'টা হাড় আলাদা করে গোনা যাচ্ছে। চোয়ালের হাড় দুটো বড় বেশি প্রকট যেন! কণ্ঠাও!

অঞ্জনা আচমকা আঁকড়ে ধরছে শান্তনুকে। বুকে গাল ঘসছে। গালে গাল ঘসছে। সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে চাইছে শান্তনুর উত্তাপ।

পাখি এসে ফিরে গেছে।

ছয়

বেলা যায়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে। সন্ধে ফুরিয়ে রাত। আবারও বিকেল আসে। আবারও সকাল। দুপুর। সন্ধে। রাত।

আবারও মিলিত হয়েছে নারীপুরুষ।

পাখি এসে ফিরে যায়।

যাক। ফিরেই যাক।

মাঝে মাঝে যখন মিহি সরের মতো জ্যোৎস্না লুটোপুটি খাবে অঞ্জনার বিছানায়, পাশের জমির পেঁপেগাছ আর কৃষ্ণচূড়া যেদিন হাওয়ায় আপনমনে দোল খাবে সারারাত, সেই সব রাতেই না হয় অঞ্জনার কাছে আসুক পাখিটা। কান্না হয়ে। স্বপ্ন হয়ে। ♣